ভারতের ইতিহাসকথা

[ত্রৈবার্ষিক স্নাতক সংস্করণ]

[আধুনিক যুগ]

ডক্টর কিরণচন্দ্র চৌধুরী
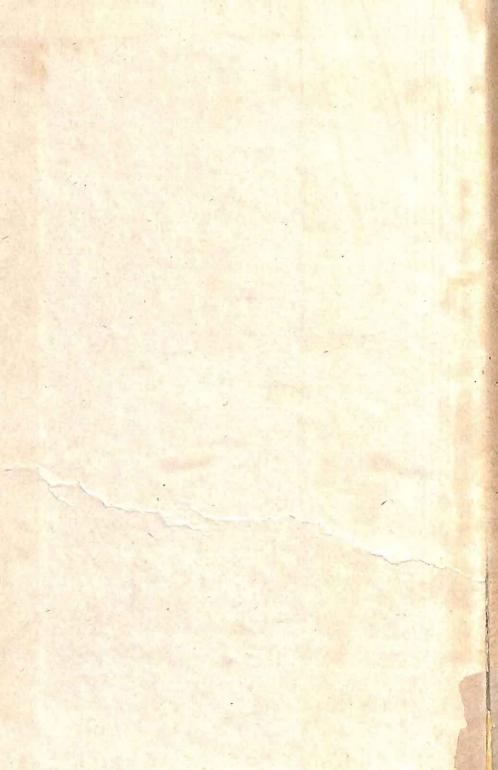
মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড

[ত্রৈবার্ষিক স্নাতক সংস্করণ]

ভারতের ইতিহাসকথা

তৃতীয় খণ্ড : আধুনিক যুগ

ডক্টর কিরণচন্দ্র চৌধুরী,
এম. এ., এল-এল. বি., ডি. ফিল্.
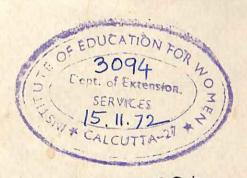
মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড
১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

'ভারতের ইতিহাসকথা' তৃতীয় খণ্ডের—ত্রৈবার্ষিক স্নাতক সংস্করণ প্রকাশিত হইল। নূতন ব্যবস্থানুসারে স্নাতক পরীক্ষার্থীদিগকে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতের ইতিহাস পড়িতে হইবে। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির স্থলে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক শাসনভার গ্রহণের পর হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত ভারত-ইতিহাসের গুরুত্ব আধুনিক শিক্ষার্থীদের নিকট খুবই বেশী, একথা অনস্বীকার্য। কিন্তু ত্রৈবার্ষিক স্নাতক শ্রেণীতে তাহারা প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারত-ইতিহাস এবং আধুনিক যুগের ইতিহাস কতকাংশ শেষ করিয়া এই যুগের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অংশটিই পড়িবার সুযোগ পাইবে না। যাহাদের স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে ইতিহাস পড়িবার সুযোগ ঘটিবে না তাহাদিগকে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে লব্ধ আধুনিক যুগের ভারত-ইতিহাসের জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া চলিতে হইবে। বর্তমান যুগের স্নাতক পরীক্ষা-উত্তীর্ণ ভারতীয় নাগরিকের এইরূপ গুরুত্বপূর্ণ যুগের ইতিহাস ভালভাবে জানা না থাকা যুক্তিযুক্ত মনে হয় না।

এই পুস্তকখানির উৎকর্ষ সাধনে আমার সম-কর্মী অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের সহযোগিতা কামনা করি। ইতি—

১৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৬১
কলিকাতা

গ্রন্থকার

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

'ভারতের ইতিহাসকথা'র (ত্রৈবার্ষিক সংস্করণ) তৃতীয় খণ্ডের তৃতীয় সংস্করণে পুস্তকখানির আগাগোড়া পরিমার্জন করা হইয়াছে। ইহাতে বইখানির উৎকর্ষ আশা করি বৃদ্ধি পাইয়াছে।

আমার প্রাক্তন সহকর্মী অধ্যাপক কবি শ্রীসুধীর গুপ্ত বইখানির পরিমার্জনে সাহায্য করিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। গতানুগতিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া তাঁহার আন্তরিকতার অমর্যাদা করিতে চাহি না।

যে সকল ছাত্র-ছাত্রী ও অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের সহৃদয় আনুকূল্য লাভ করিয়া এই পুস্তকখানির তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশের প্রয়োজন হইয়াছে তাঁহাদিগকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

ইতি—

১৫, আগস্ট, ১৯৬৫
কলিকাতা

গ্রন্থকার

ষষ্ঠ সংস্করণের ভূমিকা

'ভারতের ইতিহাসকথা'র তৃতীয় খণ্ডের ষষ্ঠ সংস্করণে বইখানি পুনরায় পরিমার্জন করা হইল।

যাঁহাদের সহৃদয় আনুকূল্যে বইখানি ষষ্ঠ সংস্করণে পৌঁছিয়াছে, তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। ইতি—

১৫, আগস্ট, ১৯৭০
কলিকাতা

গ্রন্থকার

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠাঙ্ক

মানচিত্রের তালিকা

ছবির তালিকা

সূচনা
(Introduction)

'আনিল বণিক্ লক্ষ্মী সুরঙ্গ পথের অন্ধকারে
রাজসিংহাসন।
*   *   *
বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল পোহালে শর্বরী
রাজদণ্ডরূপে॥'

—রবীন্দ্রনাথ

ভারত-ইতিহাসের আধুনিক যুগের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of the Modern Age of Indian History): স্তিমিত-প্রায় মোগল মহিমা যে-দিন শ্মশানশয্যা রচনা করিয়া যবনিকার অন্তরালে আত্ম-অপসরণে উদ্যত, স্পর্ধিত মোগল সাম্রাজ্যের রাজদণ্ড যে-দিন ধূল্যবলুণ্ঠিত, সেইদিন এক অপ্রত্যাশিত ঘটনাচক্রেই ইংরাজ বণিক-সম্প্রদায় ঐ রাজদণ্ড হস্তগত করিয়া কোটি কোটি ভারত-বাসীকে এক নূতন পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিল। তদানীন্তন ভারতবাসীর রাজনৈতিক ঔদাসীন্য ও অনৈক্যের শাস্তিস্বরূপ দীর্ঘ দেড়শত বৎসরেরও অধিককাল ধরিয়া ইংরাজগণ অপ্রতিহতভাবে ভারতের বুকে শাসন ও শোষণ চালাইতে সক্ষম হইয়াছিল। ভারতের আধুনিক যুগের ইতিহাসের প্রথমাংশ সেই কারণে বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডে পরিণত হইবারই ইতিহাস, বলা বাহুল্য।

ইংরাজ বণিকসম্প্রদায় কর্তৃক মোগল সাম্রাজ্যের পতনের সুযোগ গ্রহণ: বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডে পরিণত

দীর্ঘকালব্যাপী ইংরাজ শাসনে ভারতের জাতীয় জীবনের প্রতি স্তরে স্বভাবতই এক বিরাট পরিবর্তন ঘটিল। পর-সম্পদলোভী ইঙ্গ-বণিকদের অসাধু প্রতিযোগিতায় ভারতীয় শিল্পগুলির অপমৃত্যু ঘটিল। ভারতীয় সভ্যতার

ভিত্তিস্বরূপ স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামগুলি হইয়া পড়িল পরমুখাপেক্ষী। যান্ত্রিক সভ্যতার সংস্পর্শে আসিবার এবং রেলপথ প্রভৃতি স্থাপনের ফলে একদিকে যেমন গ্রাম্য জীবনে স্বাতন্ত্র্য ও স্বয়ংসম্পূর্ণতা বিনাশপ্রাপ্ত হইল, অপরদিকে তেমনি মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়-ভিত্তিক এক নূতন অর্থনৈতিক কাঠামো গড়িয়া উঠিল। কিন্তু যে বিষ প্রাণনাশ করে, উহাতেই আবার বিষ ক্ষয়ের ঔষধ নিহিত থাকে। ইংরাজ শাসনের ক্ষেত্রেও এই উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হইল। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্রমে দেখা দিল এক নবচেতনা বা নবজাগরণ। সমাজ-সংস্কার, কুসংস্কার হইতে মুক্তি, জাতীয় আন্দোলন প্রভৃতিতে নানা দিকে এই নবচেতনা প্রকাশলাভ করিল। বাংলাদেশ ও বাঙালী জাতি হইল এই নবজাগরণের অগ্রদূত।

ইংরাজ শাসনে ভারতের জাতীয় জীবনে পরিবর্তন

জাতীয় আন্দোলন

তারপর বহু বাধা-বিপত্তি, দুঃখ-দুর্দশা ও নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া ভারতের জাতীয় আন্দোলন সাফল্যের পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর অহিংস আন্দোলনের অভিনবত্ব, ভারতবাসীর নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতা পৃথিবীর সকল অংশের নর-নারীকে বিস্ময়াভিভূত করিল। এই আন্দোলনের শক্তিকে প্রতিহত করিবার ক্ষমতা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদেরও ছিল না। প্রধানত ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অহিংস আন্দোলনে ভারতের মুক্তি আন্দোলন জয়যুক্ত হইল। অবশ্য এবিষয়ে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সন্ত্রাসবাদ, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালে আজাদ্ হিন্দ্ ফৌজ বা আই.এন্.এ., দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরে ভারতীয় নৌসেনাদের বিদ্রোহ এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির চাপ প্রভৃতির উল্লেখযোগ্য দান রহিয়াছে, একথা অনস্বীকার্য।

স্বাধীনতা লাভে কংগ্রেস, সন্ত্রাসবাদ, আই. এন্. এ., নৌসেনাদের বিদ্রোহ, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি প্রভৃতির অবদান

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট, প্রায় পৌনে দুই শত বৎসরের পরাধীনতার পর ভারতবর্ষ ইংরাজ কবলমুক্ত হইল। কিন্তু ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ মরিবার কালেও ভারতভূমিকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া শেষ সর্বনাশটুকু সাধন করিয়া যাইতে ত্রুটি করিল না। দীর্ঘকালের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজ-

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শেষ আঘাত

নৈতিক ঐক্যবোধকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া ব্রিটিশ সরকার ভারতকে ব্যবচ্ছিন্ন করিয়া দিল। ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ভস্মাবশেষ হইতে ভারত ও পাকিস্তান—এই দুইটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইল।

আধুনিক যুগের ঐতিহাসিক উপাদান (Sources of Modern Indian History): ভারতবর্ষের আধুনিক যুগের ইতিহাস রচনার উপাদানের অভাব নাই। এই সকল উপাদানকে প্রধানত পাঁচ ভাগে ভাগ করিয়া বিচার করা বাঞ্ছনীয়। যথা, (১) সরকারী কাগজপত্র, (২) সাধারণ ব্যক্তিবর্গের নিকট হইতে প্রাপ্ত সমসাময়িক দলিল, (৩) ইওরোপীয় বাণিজ্য-কুঠিতে প্রাপ্ত কাগজ-পত্রাদি, (৪) সমসাময়িক ভারতীয়দের রচনা ও (৫) ব্রিটিশ ঐতিহাসিকগণের রচনা।

পাঁচ প্রকারের উপাদান

(১) সরকারী কাগজপত্র (State Papers): ভারতবর্ষের আধুনিক যুগের ইতিহাস রচনায় সরকারী কাগজপত্রের গুরুত্ব অত্যধিক, বলা বাহুল্য। আভ্যন্তরীণ এবং পররাষ্ট্রীয় বিষয়াদি সম্পর্কিত যাবতীয় কাগজপত্র এবিষয়ে অত্যন্ত সহায়ক। সরকারী কাগজপত্রের গুরুত্ব সম্পর্কে ফরাসী পর্যটক জ্যাকেমেঁা (Jaquemont)-এর উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষ পর্যটনে আসিয়া তদানীন্তন সরকারী কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে বলিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষের সরকার 'কাগজ-কলমের দ্বারা পরিচালিত'। জ্যাকেমেঁার এই মন্তব্য হইতে ঐ যুগের ইতিহাস রচনায় সরকারী কাগজপত্রাদির গুরুত্ব সহজেই অনুমেয়। ব্রিটিশ শাসনকালের সরকারী কাগজপত্রের প্রাচুর্য এত অধিক যে, সেগুলিকে সম্পূর্ণভাবে পাঠ করিয়া ঐ যুগের ইতিহাসের যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করা কোন কালেই সম্ভব হইবে কিনা সন্দেহ। ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান যখন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় সেই সময় হইতে নানাপ্রকারের নথিপত্র, সরকারী কাগজপত্রাদি সঞ্চিত হইতেছে। এগুলি ভারতবর্ষের আধুনিক যুগের ইতিহাস রচনার অমূল্য উপাদান সন্দেহ নাই। নূতন দিল্লীতে জাতীয় মোহাফেজখানায় (National Archives) রক্ষিত কাগজপত্রাদি, পশ্চিমবঙ্গ, মাদ্রাজ, বোম্বাই, পুণা, লাহোর

সরকারী কাগজ-পত্রাদির গুরুত্ব

দিল্লীর মোহাফেজখানায় রক্ষিত দলিলপত্রাদি

প্রভৃতি স্থানে রক্ষিত সরকারী দলিলপত্রাদি ঐযুগের ইতিহাস রচনার অপরিহার্য মূল্যবান উপাদান।

পোর্তুগীজ, ফরাসী ও ওলন্দাজ মোহাফেজখানায় রক্ষিত দলিলপত্রাদি

পোর্তুগীজ, ফরাসী ও ওলন্দাজ সরকারের মোহাফেজখানায় রক্ষিত অনুরূপ দলিলপত্রাদিতেও ব্রিটিশ শাসনকালে ইওরোপীয় দেশগুলির সহিত ভারতবর্ষের যোগাযোগ ও আদান-প্রদানের নানাবিধ তথ্য পাওয়া যায়।

(২) সাধারণ ব্যক্তিবর্গের নিকট হইতে প্রাপ্ত সমসাময়িক দলিলপত্রাদি (Private Original Documents) : ব্রিটিশ শাসনকালে রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক কারণে ব্রিটিশ সরকারের সহিত বহু সংখ্যক পরিবারের আদান-প্রদান ও পত্র-বিনিময় চলিত। ঐ সকল কাগজপত্রাদি বহু পরিবারে এখনও পাওয়া যায়। এগুলি হইতেও বহু মূল্যবান ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়। কিন্তু এযাবৎ এইরূপ দলিলপত্রের সাহায্য ঐতিহাসিকগণ তেমন গ্রহণ করেন নাই।

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে আদান-প্রদান

(৩) ইওরোপীয় বাণিজ্য-কুঠিতে প্রাপ্ত কাগজপত্রাদি (European Factory Papers) : পোর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসী, দিনেমার প্রভৃতি ইওরোপীয় বণিকদের বাণিজ্য-কুঠির কাগজপত্রাদি হইতেও সমসাময়িক কালের ঐতিহাসিক তথ্যাদি সংগ্রহ করা যায়।

ইওরোপীয় বাণিজ্য-কুঠির কাগজপত্রাদি

(৪) ভারতীয়দের রচনা (Writings of the Indigenous Writers) : ব্রিটিশ যুগ তথা আধুনিক যুগের ইতিহাস গঠনে ফার্সী ভাষায় রচিত গ্রন্থাদি সাধারণতঃ সহায়ক নহে। কিন্তু 'সিয়ার উল্-মুতাখ্রিণ' নামক ফার্সী গ্রন্থখানি অষ্টাদশ শতাব্দীর ব্রিটিশ শাসনের ইতিহাস রচনায় অপরিহার্য বলা যাইতে পারে। ইহা ভিন্ন, মারাঠী ভাষায় রচিত সমসাময়িক গ্রন্থাদি হইতেও এবিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য পাওয়া যায়। এই গ্রন্থগুলির কয়েকখানি ইতিমধ্যে মুদ্রিত হইয়াছে। তামিল ভাষায় লিখিত এ. আর. পিলাই-এর ডায়েরী, ফরাসী গবর্ণর

ফার্সী, মারাঠী, তামিল প্রভৃতি ভাষায় রচিত সমসাময়িক গ্রন্থাদি

দুপ্লে রচিত 'দুবাস'

ডুপ্লে রচিত 'ডুবাস' (*Dubash*) প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে সমসাময়িক ইতিহাস রচনার বহু মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। এই সকল গ্রন্থের কয়েকটি ইংরাজী ভাষায় অনূদিত হইয়াছে।

(৫) ব্রিটিশ ঐতিহাসিকদের রচনা (Writings of the British Historians) : ব্রিটিশ যুগে বহু ইংরাজ কর্মচারী ভারতবর্ষে তাঁহাদের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের অনেকের আবার জীবনস্মৃতিও প্রকাশিত হইয়াছে। এগুলি হইতে সমসাময়িক কালের ঐতিহাসিক তথ্যাদিও সংগ্রহ করা যায়। এইরূপ ব্যক্তিগত রচনা ভিন্ন জেম্‌স মিল (James Mill), উইলক্‌স্ (Wilks), গ্রাণ্ট্ ডাফ্ (Grant Duff), কানিংহাম (Cunningham) প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণের রচিত গ্রন্থাদি ব্রিটিশ শাসনের প্রথম যুগের ইতিহাস রচনার অপরিহার্য উপাদান। অবশ্য একথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এই সকল ঐতিহাসিকের রচনা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ নহে। কিন্তু তাঁহাদের রচনায় স্বেচ্ছাকৃতভাবে সত্যের অপলাপ করা হইয়াছে একথা মনে করা যুক্তিযুক্ত হইবে না।

মিল, উইলক্‌স্, ডাফ, কানিংহাম প্রভৃতি ইংরাজ ঐতিহাসিকগণের রচনা

ইওরোপীয়দের আগমন (Advent of the Europeans) : পাশ্চাত্ত্যের সহিত ভারতবর্ষের যোগাযোগ আধুনিককালের কথা নহে। অতি প্রাচীনকাল হইতেই পাশ্চাত্ত্যের সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্য-সম্পর্ক ছিল। রোম ও গ্রীসের সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ও দূত বিনিময়ের কথা আমাদের অবিদিত নহে। কিন্তু খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে আরব সাগর ও লোহিত সাগরের পথে আরবগণের একচ্ছত্র আধিপত্য স্থাপিত হওয়ায় ভারতের সমুদ্রবাহী বাণিজ্য তাহাদের হাতে চলিয়া যায়। অবশ্য তখনও ফ্লোরেন্স্, জেনোয়া, ভেনিস প্রভৃতি নগরের বণিকগণ আরবদের নিকট হইতে ভারতীয় পণ্য-দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া ইতালি তথা পাশ্চাত্ত্যের সর্বত্র রপ্তানি করিত। কিন্তু মধ্য-যুগের শেষভাগে ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশগুলির মধ্যে পরস্পর অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা যেমন বৃদ্ধি পাইল তেমনি নব-আবিষ্কৃত

পাশ্চাত্ত্যের সহিত ভারতের যোগাযোগ

সমুদ্রপথ ধরিয়া প্রাচ্যের দেশগুলির শোষণের ইতিহাসও শুরু হইল। বস্তুত, ভারতবর্ষে পৌঁছিবার সমুদ্রপথ আবিষ্কৃত হওয়ায় পাশ্চাত্ত্য জগতের ইতিহাসে যে সুদূর-প্রসারী প্রভাব পরিলক্ষিত হইয়াছিল, সমগ্র মধ্যযুগের অপর কোন একটি ঘটনা হইতে সেইরূপ হয় নাই। ১৪৮৭ খ্রীষ্টাব্দে পোর্তুগীজ নাবিক বারথলোমিউ দিয়াজ (Bartholomew Diaz) আফ্রিকা মহাদেশের দক্ষিণ সীমায় উত্তমাশা অন্তরীপ প্রদক্ষিণ করিয়া আসিলেন। ইহার কয়েক বৎসরের মধ্যেই (১৪ই মে, ১৪৯৮) ঐ পথ ধরিয়া ভাস্কো-ডা-গামা (Vasco-da-Gama) কালিকট বন্দরে আসিয়া পৌঁছিলেন। এইভাবে পাশ্চাত্ত্য হইতে জলপথে ভারতবর্ষে পৌঁছিবার এক নূতন পথ আবিষ্কৃত হইল।

পাশ্চাত্ত্য হইতে ভারতবর্ষে পৌঁছিবার জলপথ আবিষ্কৃত হওয়ার ফল

পোর্তুগীজ বণিকদের আগমন (Advent of the Portuguese): ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ভাস্কো-ডা-গামা কালিকট বন্দরে উপস্থিত হইলে স্থানীয় 'জামোরিণ' অর্থাৎ রাজা তাঁহার প্রতি উদার এবং প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার করিতে ত্রুটি করিলেন না। কিন্তু ভাস্কো-ডা-গামা প্রতিদানে জামোরিণের পাঁচজন প্রজাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া পোর্তুগীজ-সুলভ মনোবৃত্তির পরিচয় দিলেন।* যাহা হউক, ভাস্কো-ডা-গামার সাফল্যে উৎসাহিত হইয়া দুই বৎসরের (১৫০০) মধ্যেই পেড্রো আল্‌ভারেজ্ কাব্রাল (Pedro Alvarez Cabral) নামে জনৈক নাবিকের নেতৃত্বে তেরোখানা জাহাজ, বারো শত পোর্তুগীজ এবং প্রচুর পরিমাণ পণ্যদ্রব্য লইয়া কালিকট অভিমুখে যাত্রা করিল। ইহাই পোর্তুগাল হইতে দ্বিতীয় বাণিজ্য অভিযান। আল্‌ভারেজ্ কালিকটে পৌঁছিয়াই নিজ উদ্ধত আচরণহেতু জামোরিণের শত্রুতে পরিণত হইলেন। কালিকট বন্দরে ঐ সময়ে অসংখ্য আরব বণিক বাণিজ্যব্যপদেশে যাতায়াত করিত। বস্তুত, কালিকট বন্দরের সমৃদ্ধি আরবগণের সহিত বাণিজ্যের ফলেই গড়িয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু আল্‌ভারেজ্ কালিকট বন্দর হইতে আরব বণিকগণকে বিতাড়িত করিতে উদ্যত হইলে স্বভাবতই তাঁহার সহিত জামোরিণের সংঘর্ষ অনিবার্য হইয়া উঠিল। ঐ সময় হইতেই পোর্তুগীজ

ভাস্কো-ডা-গামা

পেড্রো আল্‌ভারেজ্ কাব্রাল

* Vide *The Cambridge History of India, Vol. V, p. 4.*

বণিকগণ বাণিজ্য-নীতির সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ-ভারতীয় রাজনীতিতেও অংশ গ্রহণ করিতে লাগিল। তাহারা জামোরিণের শত্রু কোচিনের রাজার সহিত যোগদান করিয়া শক্তি-সঞ্চয়ের চেষ্টা শুরু করিল। তাহারা একদিকে দক্ষিণ-ভারতীয় রাজ্যগুলির মধ্যে রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের সুযোগ যেমন গ্রহণ করিতে লাগিল, অপরদিকে তেমনি আরব বণিকদের জাহাজ লুণ্ঠনেও প্রবৃত্ত হইল। আল্‌ভারেজ্-এর পর ভাস্কো-ডা-গামা দ্বিতীয়বার ভারতবর্ষে আসেন এবং কোচিন ও ক্যানানোর-এ পোর্তুগীজ বাণিজ্য-কুঠি স্থাপন করেন (১৫০২)। ইহার পর হইতে প্রতি বৎসরই পোর্তুগাল হইতে একজন করিয়া নূতন অধিকর্তা ভারতে পোর্তুগীজ বাণিজ্যকেন্দ্রগুলি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রেরিত হইতেন।

পোর্তুগীজদের দক্ষিণ-ভারতীয় রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ

কোচিন ও ক্যানানোর-এ পোর্তুগীজ বাণিজ্য-কুঠি স্থাপন

পোর্তুগীজ বণিকগণ যখন স্থানীয় রাজন্যবর্গ ও আরব বণিকদের সহিত যুঝিয়া কোনক্রমে টিকিয়াছিল সেই সময়ে (১৫০৯) আল্‌ফোন্‌সো আল্‌বুকার্ক (Alfonso Albuquerque) পোর্তুগীজ গবর্ণর নিযুক্ত হইয়া আসিলে ভারতবর্ষে পোর্তুগীজ শক্তি গঠনের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হইল। আল্‌বুকার্কই ছিলেন ভারতে পোর্তুগীজ শক্তির প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে আল্‌বুকার্ক বিজাপুর সুলতানের নিকট হইতে গোয়া বন্দরটি জয় করিলেন এবং বিজাপুর সুলতান যাহাতে গোয়া পুনরুদ্ধার না করিতে পারেন সেজন্য গোয়ার নিরাপত্তা বিধানে ব্যস্ত হইলেন। তিনি গোয়ার দুর্গগুলি দৃঢ়তর করিলেন এবং গোয়াকেই পোর্তুগীজ শক্তির ও বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসাবে গড়িয়া তুলিলেন। পোর্তুগালের ন্যায় ক্ষুদ্র দেশের পক্ষে উপযুক্ত সংখ্যক ঔপনিবেশিক প্রেরণ করা সম্ভব হইবে না বিবেচনা করিয়া আল্‌বুকার্ক তাঁহার অনুচরবর্গকে ভারতীয় স্ত্রীলোক বিবাহ করিতে উৎসাহিত করিলেন। এইভাবে তিনি ভারতবর্ষে এক স্থায়ী পোর্তুগীজ শক্তি এবং পোর্তুগীজ জনসমাজ গড়িয়া তুলিতে চাহিলেন। ভারতে পোর্তুগীজ শক্তির গোড়াপত্তনে আল্‌ফোন্‌সো আল্‌বুকার্কের দান ছিল অপরিসীম। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, প্রাচ্যের বাণিজ্যের উপর

আল্‌বুকার্ক

গোয়া অধিকার

আল্‌বুকার্কের অবদান

একচেটিয়া অধিকার স্থাপন করিতে হইলে এডেন, ওরমুজ ও মালাক্কা অধিকার করা একান্ত প্রয়োজন, সেজন্য তিনি ওরমুজ ও মালাক্কার উপর পোর্তুগীজ প্রাধান্য স্থাপন করিয়া পোর্তুগীজ জাতি এবং পোর্তুগীজ সরকারের স্বার্থ বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতি বর্বরোচিত অত্যাচার করিয়া তিনি নিজ চরিত্রকে মসিলিপ্ত করিয়াছিলেন।

পরবর্তীকালে দমন, দিউ, সল্‌সেট্, ব্যাসিন, চৌল, বোম্বাই, সান টোম্, হুগলী প্রভৃতি অধিকার

আল্‌বুকার্কের পরবর্তী গবর্ণরগণের আমলে পোর্তুগীজগণ দিউ, দমন, সল্‌সেট্, ব্যাসিন, চৌল, বোম্বাই, সান টোম্ ও হুগলী অধিকার করিতে সক্ষম হয়। এই সকল স্থান ভিন্ন সিংহলের অধিকাংশও তাহাদের অধিকারভুক্ত হয়। এইভাবে বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক প্রাধান্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ক্যাথলিক ধর্মপ্রচারেরও চেষ্টা চলিল। ১৫৩৪ খ্রীষ্টাব্দে পোপ তৃতীয় পল (Pope Paul III) গোয়ার ক্যাথলিক ধর্মাধিষ্ঠানকে একজন বিশপের অধীনে স্থাপনের অনুমতি দান করিলেন। ফলে, ১৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দে গোয়ার ধর্মাধিষ্ঠানে প্রথম বিশপ নিযুক্ত করা হইল। ইহার কয়েক বৎসরের মধ্যেই (১৫৪২) জেসুইট্ যাজক ফ্রান্সিস্কো জেভিয়ার (Fransisco Xavier) গোয়ায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গোয়ায় ক্যাথলিক ধর্মপ্রচারে ফ্রান্সিস্কো জেভিয়ারের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। ১৫৫২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি গোয়াতেই দেহরক্ষা করেন এবং সন্ত (Saint) পর্যায়ভুক্ত হন।

খ্রীষ্টধর্ম প্রচার: সেন্ট জেভিয়ার

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ভারতে পোর্তুগীজগণের শক্তি ও প্রাধান্য অপ্রতিহতভাবে বৃদ্ধি পাইতেছিল, কিন্তু ১৫৪৮ খ্রীষ্টাব্দে গবর্ণর ডি. জে. ক্যাস্ট্রো (D. J. Castro)-এর মৃত্যুর পর পোর্তুগীজ শক্তির পতন শুরু হয়। শাহ্‌জাহানের রাজত্বকালে হুগলীর পোর্তুগীজ কুঠি ধ্বংস করা হইয়াছিল, একথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে মারাঠাগণ সল্‌সেট্ ও ব্যাসিন দখল করিয়া লইল। এইভাবে ক্রমেই পোর্তুগীজগণের ভারতীয় উপনিবেশগুলি একে একে হস্তচ্যুত হইয়া কেবলমাত্র গোয়া, দমন, দিউ প্রভৃতি কয়েকটি স্থান তাহাদের অধিকারে রহিল। অল্পকাল পূর্বে স্বাধীন ভারত সরকার এই কয়টি স্থান পোর্তুগালের কবলমুক্ত করিয়াছেন।

পোর্তুগীজ শক্তি ও প্রাধান্যের পতন

পোর্তুগীজগণ-ই সর্বপ্রথম প্রাচ্যদেশে প্রবেশ করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিল। কিন্তু পোর্তুগীজ শাসকমণ্ডলীর অদূরদর্শিতা, তাঁহাদের পরধর্ম-অসহিষ্ণুতা-জনিত অত্যাচার, বাণিজ্যের নামে অন্যায়-অবিচার, এমন কি জলদস্যুতা, অপরাপর ইওরোপীয় বণিকসম্প্রদায়ের প্রতিযোগিতা এবং ব্রাজিল আবিষ্কৃত হওয়ায় সেই অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপনের উৎসাহ—এই কয়টি কারণে ভারতবর্ষ তথা প্রাচ্যে পোর্তুগীজগণের ব্যবসায়-বাণিজ্য, প্রাধান্য ও প্রতিপত্তি সব কিছুই ক্রমে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছিল।

পতনের কারণ

ওলন্দাজ বণিকদের আগমন (Advent of the Dutch Traders) : ইওরোপীয় বণিকসম্প্রদায় মাত্রেই ভারতবর্ষে পৌঁছিবার জলপথ আবিষ্কারের এবং পোর্তুগীজদের সাফল্যের দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হইয়া প্রাচ্যের বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইতে লাগিল। এই উদ্দেশ্যে নেদারল্যাণ্ডে (Netherlands) বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিল। কিন্তু ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে 'ইংলিশ ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানি' গঠিত হইলে ইংরাজ বণিকগণের প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে টিকিয়া থাকিবার উপায় হিসাবে নেদারল্যাণ্ডের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোম্পানিগুলি 'ইউনাইটেড্ ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানি' নামে এক সংযুক্ত প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইল (১৬০২)। এই সংযুক্ত প্রতিষ্ঠানটি নামে বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান হইলেও যুদ্ধ-বিগ্রহে যোগদান, শান্তি-চুক্তি স্থাপন, দুর্গ-নির্মাণ, সৈন্য-পোষণ প্রভৃতি অধিকারও নেদারল্যাণ্ড সরকার হইতে লাভ করিল। ওলন্দাজ নাবিকগণ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াস্থ দ্বীপপুঞ্জের বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ করিতে আসিয়া প্রথমেই পোর্তুগীজগণের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া পড়িল। ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে তাহারা পোর্তুগীজ অধিকৃত এ্যাম্বোয়ানা (Amboyana) দখল করিয়া লইল ; ১৬১৯ খ্রীষ্টাব্দে তাহারা জেন পীটারসুন কোয়েন (Jan Petersoon Coen) নামক নেতার নেতৃত্বে জাকার্তা জয় করিয়া সেইস্থানে বাটাভিয়া নামক ওলন্দাজ বাণিজ্য-কেন্দ্র স্থাপন করিল। পীটারসুন কোয়েন-ই ছিলেন প্রাচ্যে ওলন্দাজ শক্তির প্রকৃত স্থাপয়িতা। সেই সময়ে ইংরাজ বণিকগণও মালয় দ্বীপপুঞ্জে বাণিজ্য বিস্তারে অগ্রসর হইয়াছিল। কিন্তু ওলন্দাজগণের অক্লান্ত চেষ্টায় অপর কোন

ওলন্দাজ-ইউনাইটেড্ ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানি গঠন (১৬০২)

ইওরোপীয় বণিকসম্প্রদায় ঐ অঞ্চলে বাণিজ্য বা সাম্রাজ্য বিস্তারে সমর্থ হয় নাই। ওলন্দাজগণ পোর্তুগীজদের বাণিজ্য-কেন্দ্রগুলি দখল করিবার জন্যও চেষ্টার ত্রুটি করিল না। ১৬৩৬ হইতে ১৬৩৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তাহারা প্রতি বৎসর একবার করিয়া গোয়া আক্রমণ করিতে লাগিল। অবশ্য এ ব্যাপারে তাহারা সাফল্য লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই। কিন্তু ১৬৪১ খ্রীষ্টাব্দে মালাক্কা এবং ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে সিংহলের সর্বশেষ পোর্তুগীজ বাণিজ্য-কেন্দ্রটি জয় করিয়া ওলন্দাজগণ দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়াস্থ দ্বীপগুলিতে এক অপ্রতিহত শক্তিতে পরিণত হইল। যবদ্বীপ, সুমাত্রা, মালাক্কা প্রভৃতি স্থান অধিকার করিয়া ক্রমে ওলন্দাজ বণিকগণ করমণ্ডল, গুজরাট, বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায় বাণিজ্য-কুঠি স্থাপন করিতে সক্ষম হইল। ভারতবর্ষে ওলন্দাজ কুঠিগুলির মধ্যে পুলিকট, সুরাট, নেগাপট্টম, কোচিন, চুঁচুড়া, কাশিমবাজার, বরানগর, পাটনা, বালেশ্বর প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। নীল, রেশম, সোরা, চাউল, সুতীবস্ত্র, আফিং প্রভৃতি ছিল তাহাদের প্রধান রপ্তানি সামগ্রী।

ওলন্দাজ-পোর্তুগীজ সংঘর্ষ

ভারতে ওলন্দাজ কুঠি স্থাপন

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াস্থ দ্বীপপুঞ্জে এবং ভারতবর্ষে ওলন্দাজ বাণিজ্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল পোর্তুগীজ ও ইংরাজ বণিকদের সহিত সংঘর্ষ। সেই সময়ে ওলন্দাজগণ ছিল স্পেনের অধীনে। ১৫৮০ হইতে ১৬৪৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত পোর্তুগালও স্পেনের অধীন ছিল। স্পেনের অধীনতাপাশ ছিন্ন করিবার উদ্দেশ্যে ওলন্দাজগণ সর্বদাই বিদ্রোহ করিত। এই কারণে ওলন্দাজ ও স্পেনীয়দের মধ্যে পরস্পর সম্পর্ক অত্যন্ত তিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। পোর্তুগাল স্পেন কর্তৃক অধিকৃত হইলে ওলন্দাজগণ পোর্তুগীজদের সহিতও শত্রুতা শুরু করিয়াছিল। ধর্মের ব্যাপারেও প্রোটেস্টান্ট ধর্মাবলম্বী ওলন্দাজগণ ক্যাথলিক স্পেনীয়দের অনমনীয় শত্রু ছিল। ইহা ভিন্ন প্রাচ্যের বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকারলাভের ইচ্ছাও এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা বৃদ্ধি করিয়াছিল। এই সকল কারণে ওলন্দাজ-পোর্তুগীজ দ্বন্দ্ব অনিবার্য ছিল এবং এই দ্বন্দ্বে ওলন্দাজগণের হস্তে পোর্তুগীজ বণিকগণ পরাজিত হইলে তাহাদের শক্তি ও বাণিজ্যিক প্রাধান্য হ্রাসপ্রাপ্ত হইল।

পোর্তুগীজ-ওলন্দাজ সংঘর্ষের কারণ

স্টুয়ার্ট যুগে এবং ক্রমওয়েলের আমলে ইংলণ্ড ও হল্যাণ্ডের মধ্যে

বাণিজ্যিক ও সামুদ্রিক প্রাধান্য লইয়া দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। সেই সূত্রে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াস্থ দ্বীপপুঞ্জ এবং ভারতবর্ষে ওলন্দাজ ও ইংরাজ বণিকদের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি হয়। ১৬৭২ হইতে ১৬৭৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দুই বৎসর ওলন্দাজগণের হস্তে ইংরাজ বণিকগণকে নানাভাবে লাঞ্ছনা ভোগ ও বহু ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ইঙ্গ-ওলন্দাজ বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতা-সংক্রান্ত বিবাদ-বিসম্বাদ সমভাবেই বিদ্যমান ছিল। ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে এই দ্বন্দ্বের কতকটা উপশম হয়। সেই সময় হইতে ওলন্দাজগণ মালয় দ্বীপপুঞ্জেই একাধিপত্য স্থাপনে মনোযোগী হইয়া পড়ে এবং ইংরাজগণ ভারতবর্ষে প্রাধান্য বিস্তারের সুযোগ লাভ করে।

ইঙ্গ-ওলন্দাজ সংঘর্ষ

ফরাসী বণিকদের আগমন (Advent of the French Traders): ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ভাগে ফরাসী বণিকগণের একখানা বাণিজ্যপোত পোর্তুগীজ বাণিজ্য-কেন্দ্র দিউ-তে পৌঁছিয়াছিল ; কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগ বা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম কয়েক বৎসরের মধ্যে কোন ফরাসী বাণিজ্য-পোত ভারতবর্ষের কোন বন্দরে না আসিলেও ১৬০১ খ্রীষ্টাব্দে দুইখানা ফরাসী জাহাজ সুমাত্রায় পৌঁছিয়াছিল এইরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়। বুর্বোঁ বংশের প্রতিষ্ঠাতা চতুর্থ হেনরী ইংলণ্ড এবং নেদারল্যাণ্ডের অনুকরণে 'ফরাসী ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানি' নামে একটি বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান স্থাপনে প্রয়াসী হন। কিন্তু এবিষয়ে বিশেষ কোন সাফল্য লাভ করা সম্ভব না হওয়ায় সাময়িকভাবে প্রাচ্যের সহিত ফরাসী বাণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা স্থগিত থাকে। তথাপি কয়েকজন নর্মান্ নাবিক সরকারী সাহায্য না লইয়াই সেই সময়ে পারস্য, আরব, ভারতবর্ষের বাংলাদেশে ও দাক্ষিণাত্যের কয়েকটি বন্দরে আসিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে গাইলস্ ডি রেজিমেণ্ট (Giles de Regiment) ও রিগ্যাল্ট্ (Rigault), এই দুইজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ফরাসী পর্যটক টেভার্নিয়ে মোগল দরবার এবং ভারতবর্ষের ঐশ্বর্য ও পণ্যদ্রব্যাদি সম্পর্কে যে পুস্তক প্রকাশ করেন তাহা পাঠ করিয়া ফরাসী নাবিক ও বণিকদের মনে ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপনের এক ব্যাপক উৎসাহ দেখা যায়। ইহার অল্পকালের মধ্যেই

ফরাসী বণিকগণের প্রাচ্যের সহিত বাণিজ্য সম্পর্কের সূচনা

ফরাসীরাজ চতুর্দশ লুই (Louis XIV)-এর অর্থসচিব কল্‌বেয়ার (Colbert)-এর চেষ্টায় ১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে 'ফরাসী ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানি' (Compagnie des Indes Orientales) নামে একটি বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। চতুর্দশ লুই এই কোম্পানিকে বিনা সুদে ৩০ লক্ষ লিভ্রি (*Livres*) ঋণ দিয়াছিলেন। এইভাবে সরকারী সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতায় ফরাসী ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানি গঠিত হইলে ১৬৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রাঁসোয়া ক্যারোঁ (Francois Caron) সুরাটে সর্বপ্রথম ফরাসী বাণিজ্য-কুঠি স্থাপন করেন। মার্‌কারা নামে অপর একজন বণিক পর বৎসর (১৬৬৯) মসুলিপট্টমে আরও একটি ফরাসী কুঠি স্থাপন করেন। কয়েক বৎসরের মধ্যেই ফরাসী বণিকগণ ওলন্দাজ বণিকদের সহিত দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হইল। ১৬৭২ খ্রীষ্টাব্দে তাহারা ওলন্দাজ বাণিজ্য-কেন্দ্র সান টোম্ (San Thome) বলপূর্বক দখল করিলে গোলকুণ্ডার সুলতান ও ওলন্দাজগণের এক যুগ্মবাহিনী ফরাসী এ্যাড্‌মিরাল ডি লা হে (De La Haye)-কে পরাজিত করিয়া সান টোম্ ওলন্দাজগণকে ফিরাইয়া দিতে বাধ্য করিলেন। পর বৎসর (১৬৭৩) ফ্রাঁসোয়া মার্টিন (Francois Martin) ও লেস্‌পিনে (Bellanger de Lespinay) পণ্ডিচেরী নামক ফরাসী উপনিবেশটি স্থাপন করেন। এই উপনিবেশটি ক্রমেই সমৃদ্ধ হইয়া অল্পকালের মধ্যেই ভারতবর্ষে ফরাসী বাণিজ্য-কেন্দ্রগুলির সর্বপ্রধান হইয়া উঠে। ফ্রাঁসোয়া মার্টিন, ডুমা (Duma) ও ডুপ্লে (Dupleix)-এর চেষ্টায় পণ্ডিচেরী ফরাসী বাণিজ্য-কেন্দ্রগুলির মধ্যে সর্বাধিক সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল।* ১৬৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসীগণ বাংলার তদানীন্তন নবাব শায়েস্তা খাঁর নিকট হইতে চন্দননগর নামক স্থানটির অধিকার লাভ করে। কয়েক বৎসর পর এখানেও একটি কুঠি স্থাপিত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ফরাসী ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির অর্থবল হ্রাস পাইলে সুরাট ও মসুলিপট্টমে তাহাদের কুঠি পরিত্যক্ত হয়, কিন্তু ১৭২০ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানি পুনর্গঠিত হইলে ফরাসীগণ কারিকল ও মাহে অধিকার করিতে সমর্থ হয়। ইহার পরবর্তী ঘটনা হইল ডুপ্লের অধীনে

'ফরাসী ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানি' গঠন

ভারতে ফরাসী বাণিজ্য-কুঠি

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্বের সূত্রপাত

* *Ibid*, p. 67.

ভারতবর্ষে ফরাসী সাম্রাজ্য গঠনের চেষ্টা। এই সূত্রেই ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হইল।

ইংরাজ বণিকদের আগমন (Coming of the English Traders) : পোর্তুগীজদের দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হইয়া ইংরাজ বণিকগণও প্রাচ্যের সহিত বাণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহান্বিত হইল। ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সিস্ ড্রেক (Francis Drake) সমুদ্রপথে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়া উত্তমাশা অন্তরীপের পথে ইংলণ্ডে ফিরিয়া গেলেন। আবার ১৫৯১ খ্রীষ্টাব্দে র‍্যাল্‌ফ ফীচ্ (Ralph Fitch) ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশ পর্যটন করিয়া দেশে ফিরিয়া গেলে প্রাচ্যের সহিত বাণিজ্যিক যোগাযোগ স্থাপনের এক ব্যাপক আগ্রহ ইংলণ্ডে দেখা গেল। ইতিমধ্যে স্পেনীয় আর্মাডার বিরুদ্ধে ইংরাজ নৌবাহিনীর সাফল্যে ইংরাজ নাবিকদের মধ্যে এক বিপুল উৎসাহ ও আত্মপ্রত্যয় জন্মিয়াছিল। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ জলপথে নিকোবর, পেনাং, যবদ্বীপ প্রভৃতি দেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই সকল নাবিকের মধ্যে জেম্‌স্ ল্যাংকাস্টার (James Lancaster)-এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দে জন মিল্‌ডেন্‌হল (John Mildenhall) স্থলপথে ভারতবর্ষে আসিয়া পৌঁছিলেন। ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথের নিকট হইতে ইংরাজ বণিকগণকে পোর্তুগীজ বণিকদের ন্যায় বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিতে দিবার অনুরোধ-পত্র লইয়া তিনি মোগল সম্রাট আকবরের দরবারে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু প্রাচ্যের সহিত বাণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপনের প্রকৃত চেষ্টা শুরু হইল ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে। ঐ বৎসর রাণী এলিজাবেথ *The Governor and Company of Merchants of London Trading into the East Indies* নামক বণিক কোম্পানিকে প্রাচ্যের যাবতীয় দেশের সহিত বাণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপনের অধিকার দান করিলেন। এই কোম্পানিই সাধারণ্যে ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানি নামে পরিচিত। প্রথম কয়েক বৎসর অবশ্য এই কোম্পানি ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্য স্থাপনের চেষ্টা না করিয়া সুমাত্রা, যবদ্বীপ ও মালাক্কা প্রভৃতি অঞ্চলে মসলার ব্যবসায়ে অংশ গ্রহণে সচেষ্ট হইল। ১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে ক্যাপ্টেন হকিন্স ইংলণ্ডের রাজা প্রথম জেম্‌স্-এর সুপারিশপত্রসহ

প্রাচ্যের সহিত বাণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপনে বণিকদের আগ্রহ

ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানি স্থাপন

মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারে উপস্থিত হইলেন।* জাহাঙ্গীর ক্যাপ্টেন হকিন্সকে উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শনে ত্রুটি করিলেন না এবং হকিন্স-এর প্রার্থনা অনুযায়ী ইংরাজ বণিকগণকে সুরাটে ব্যবসা-কুঠি স্থাপন করিতে দিবেন বলিয়াও মনে মনে স্থির করিলেন। কিন্তু পোর্তুগীজ বণিকগণ এবং সুরাটের বণিক সম্প্রদায়ের তীব্র বিরোধিতার ফলে শেষ পর্যন্ত হকিন্সের দৌত্য বিফলতায় পর্যবসিত হইল। ১৬১১ খ্রীষ্টাব্দে হকিন্স আগ্রা ত্যাগ করিয়া সুরাটে আসিলেন। ইতিমধ্যে সার হেন্‌রী মিড্‌লটন (Sir Henry Middleton) বাবেলমাণ্ডেব প্রণালীতে সুরাটের বণিকদের কয়েকখানি বাণিজ্যপোতের যাবতায় পণ্য ইংলণ্ড হইতে আনীত তিনখানি বাণিজ্যপোতের পণ্যের সহিত বিনিময় করিতে বাধ্য করেন। ইহাতে ভীত হইয়া সুরাটের বণিকসম্প্রদায় ক্যাপ্টেন বেস্ট্‌-এর অধীনে দুইখানি ব্রিটিশ বাণিজ্যপোতের সুরাট বন্দর প্রবেশে কোন বাধাদান করিলেন না (১৬১২)। পোর্তুগীজগণ ক্যাপ্টেন বেস্ট্‌কে সুরাট বন্দর হইতে বিতাড়নের জন্য একটি নৌবহর প্রেরণ করিলে ক্যাপ্টেন বেস্ট্‌ তাহা বিধ্বস্ত করিতে সমর্থ হইলেন। ফলে ভারতীয়দের চক্ষে ইংরাজদের মর্যাদা বৃদ্ধি পাইল। ১৬১৩ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট জাহাঙ্গীর একটি 'ফারমান্' দ্বারা ইংরাজ বণিকগণকে সুরাট বন্দরে বাণিজ্য-কুঠি স্থাপনের অনুমতি দান করিলেন। দুই বৎসর পর (১৬১৫) পোর্তুগীজগণের সহিত ইংরাজদের পুনরায় সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। ইহাতেও পোর্তুগীজগণ সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হইল। এইভাবে ইংরাজ নৌবহরের শ্রেষ্ঠত্ব ভারতীয়দের নিকট ক্রমেই প্রমাণিত হইতে থাকিলে ইংলণ্ডরাজ প্রথম জেম্‌স্ সার টমাস রো (Sir Tomas Roe) নামক জনৈক বিদ্বান ও বিচক্ষণ† ব্যক্তিকে সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারে দূত হিসাবে প্রেরণ

হকিন্সের দৌত্য

সার হেন্‌রী মিড্‌লটন (১৬১০-১১)

ক্যাপ্টেন বেস্ট্‌

সার টমাস রো-এর দৌত্য (১৬১৫-১৬১৮)

*". . he (William Hawkins) was provided with a letter from King James to the Emperor Akbar (whose death was as yet unknown in London) desiring permission to establish trade in his dominion." *The Cambridge History of India,* vol. V, p. 77.

†"The Company were extra-ordinary lucky in such a representative ......Roe's *Journal* and correspondance show up not only his integrity but his far-sightedness."—Thomson and Garrat : *Rise and Fulfilment of British Rule in India,* p. 11.

করিলেন। সার টমাস্ রো ১৬১৫ হইতে ১৬১৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিন বৎসর জাহাঙ্গীরের দরবারে অবস্থান করেন এবং তাঁহার সহিত কোন বাণিজ্য-চুক্তি সম্পাদনে কৃতকার্য না হইলেও মোগল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে ইংরাজ বণিকদের বাণিজ্য-কুঠি স্থাপনের অনুমতি প্রাপ্ত হন। ১৬১৯ খ্রীষ্টাব্দে সার টমাস রো যখন ভারতবর্ষ ত্যাগ করেন তখন সুরাট, আগ্রা, আহ্‌মদাবাদ, ভারুচ প্রভৃতি স্থানে ইংরাজ বণিকগণ বাণিজ্য-কুঠি স্থাপন করিয়া পূর্ণোদ্যমে বাণিজ্য পরিচালনা করিতেছিল। ১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডরাজ দ্বিতীয় চার্লস্ পোর্তুগালের রাজকন্যা ক্যাথারিণ বার্‌গাঞ্জাকে বিবাহ করিলে ভারতে পোর্তুগীজ অধিকৃত স্থান—বোম্বাই শহরটি তাঁহাকে যৌতুক হিসাবে দেওয়া হইল। কয়েক বৎসরের মধ্যে দ্বিতীয় চার্লস্ অর্থাভাবহেতু পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ডের বিনিময়ে বোম্বাই ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির নিকট হস্তান্তরিত করিলেন। ইহার পর হইতেই বোম্বাই ইংরাজ কুঠিগুলির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কুঠিতে পরিণত হইল।

রো কর্তৃক ইংরাজ বণিকদের অনুকূলে সুযোগ-সুবিধা লাভ

ইতিমধ্যে গোলকুণ্ডার প্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্র মসুলিপট্টম, পুলিকট-এর অনতিদূরে আর্‌মাগাঁও প্রভৃতি স্থানেও ইংরাজগণ বাণিজ্য-কুঠি স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে গোলকুণ্ডার সুলতানের নিকট হইতে ইংরাজগণ বাৎসরিক নির্দিষ্ট পরিমাণ শুল্ক দিবার প্রতিশ্রুতিতে গোলকুণ্ডার সর্বত্র বাণিজ্যের অধিকার প্রাপ্ত হইল। ১৬৩৯ খ্রীষ্টাব্দে চন্দ্রগিরির রাজার নিকট হইতে ফ্রান্সিস্ ডে নামে জনৈক ইংরাজ বণিক মাদ্রাজে সুরক্ষিত বাণিজ্য-কুঠি স্থাপনের অনুমতি লাভ করিতে সমর্থ হইলেন। এই সুরক্ষিত বাণিজ্য-কুঠি তৎকালে ফোর্ট সেণ্ট জর্জ (Fort St. George) নামে পরিচিত ছিল।

ইংরাজ বণিকদের বাণিজ্য সম্প্রসারণ

উপরি-উক্ত অঞ্চল ভিন্ন হরিহরপুর, হুগলী, পাটনা, কাশিমবাজার প্রভৃতি স্থানেও ইংরাজ বণিকগণ বাণিজ্য-কুঠি স্থাপন করিতে সমর্থ হইল। কিন্তু ১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির ডাইরেক্টরগণের প্রধান সার্ জোশিয়া চাইল্ড (Sir Joshia Child) বলপ্রয়োগে ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য স্থাপন ও উহা হইতে অর্থাগমের স্থায়ী ব্যবস্থা করিবার নীতি গ্রহণ করিলেন। তদনুসারে ইংরাজ

ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির যুদ্ধ-নীতি গ্রহণ

নৌবাহিনী জোশিয়া চাইল্ডের ভ্রাতা জন চাইল্ডের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম বন্দরটি দখল করিবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইল। ইংরাজ বণিকদের এই উদ্ধত আচরণে মোগল সম্রাট স্বভাবতই ক্রোধান্বিত হইলেন এবং তাহাদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে মোগলবাহিনী বোম্বাই আক্রমণ করিল। অবশেষে জন চাইল্ড সম্রাট ঔরংজেবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলে (১৬৯০) উভয়পক্ষে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল। এই চুক্তি অনুসারে জন চাইল্ডকে বোম্বাই-এর গবর্ণর-পদ হইতে অপসারিত করিবার প্রতিশ্রুতি ইংরাজ কোম্পানিকে দিতে হইল। ইহা ভিন্ন যে সকল ভারতীয় বাণিজ্য-পোত ইংরাজগণ বলপূর্বক দখল করিয়াছিল সেগুলি ফিরাইয়া দিতে এবং দেড় লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ হিসাবে দিতে হইল।

ঔরংজেবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা ও চুক্তি স্থাপন

এদিকে বাংলাদেশেও ইংরাজদের সহিত মোগল সম্রাটের সংঘর্ষের সৃষ্টি হইল। ইংরাজ বণিকগণ বাংলাদেশে বাৎসরিক তিন হাজার টাকা শুল্ক প্রদানের বিনিময়ে অবাধ-বাণিজ্যের অধিকার লাভ করিয়াছিল। ১৬৭২ খ্রীষ্টাব্দে শায়েস্তা খাঁ বাংলাদেশে ইংরাজ বণিকগণকে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিবার অনুমতি দান করিয়াছিলেন। ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দে ঔরংজেব একটি ফার্‌মান দ্বারা ইংরাজগণকে পণ্য-দ্রব্যাদির উপর শতকরা দুই টাকা এবং জিজিয়া কর হিসাবে শতকরা দেড় টাকা দিবার শর্তে মোগল সাম্রাজ্যের সর্বত্র অবাধ-বাণিজ্যের অনুমতি দান করেন। তথাপি স্থানীয় রাজকর্মচারিবর্গের হস্তে তাহাদের নিস্তার ছিল না। স্থানীয় কর্মচারিগণ ইংরাজ বণিকদের নিকট হইতে কেবল শুল্কই আদায় করিতেন না, সময় সময় তাহাদের পণ্যাদিও বাজেয়াপ্ত করিয়া লইতেন। তখন ইংরাজ বণিকগণ বলপ্রয়োগে রাজকর্মচারীদের বিরোধিতা করিতে কৃতসংকল্প হইয়া হুগলীর বাণিজ্য-কুঠিকে একটি দুর্গে পরিণত করিতে সচেষ্ট হইল। সেই সূত্রে শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশেও ইঙ্গ-মোগল সংঘর্ষের সৃষ্টি হইল। ১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজগণ মোগলবাহিনী কর্তৃক বাংলাদেশ হইতে বিতাড়িত হইল। কিন্তু জব চার্ণক (Job Charnock) নামে জনৈক দূরদর্শী ও বিচক্ষণ ইংরাজ কর্মচারী পুনরায় মোগল

বাংলাদেশে ইঙ্গ-মোগল সংঘর্ষ

জব চার্ণক

তুর্কী সাম্রাজ্য
পারস্য
বসরা
ওর্মুজ
আরব
মোচা
মোগল সাম্রাজ্য
সুরাট
হুগলী
বোম্বাই
গোয়া
মসালিপত্তম
বঙ্গোপসাগর
মাদ্রাজ
কোচিন
সিংহল
আরব সাগর
ভারত মহাসাগর
মোম্বাসা
জাঞ্জিবার
মোজাম্বিক
মাদাগাস্কার
আসাগুা
চীন
তেসিমা
ফরমোসা
ম্যাকাও
পেগু
ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ
মলক্কা
আচিন
সুমাত্রা
বোর্ণিও
সেলিবিস
মলুক্কাস
নিউগিনি
বাটাভিয়া
বান্টাম
জাভা
টাইমর
প্রাচ্যে ইওরোপীয় উপনিবেশ
ব্রিটিশ
পোর্তুগীজ
স্পেনীয়
ওলন্দাজ
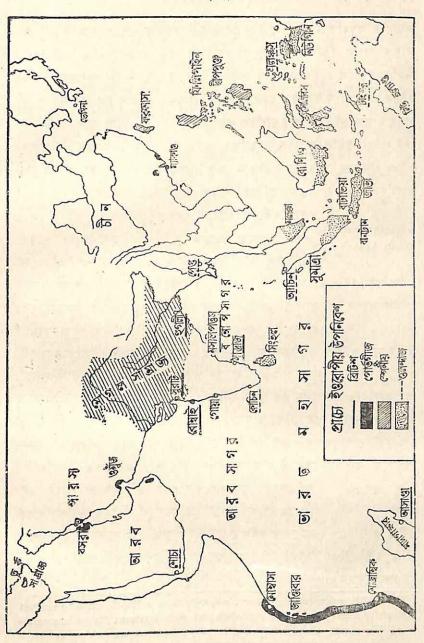
সম্রাটের অনুমতিক্রমে সুতানুটি (বর্তমান কলিকাতার শোভাবাজার এলাকা) নামক স্থানে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু পর বৎসর (১৬৮৭) ক্যাপ্টেন উইলিয়ম্ হিথ্ (Capt. William Heath) এক নৌবহরসহ ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষে উপস্থিত হইয়া চট্টগ্রাম আক্রমণ করিলে ইঙ্গ-মোগল সংঘর্ষ পুনরায় শুরু হইল। জব চার্ণকও সুতানুটি ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। এই সংঘর্ষে উইলিয়ম্ হিথ্ পরাজিত হইয়া মাদ্রাজে অপসরণ করিলেন। ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাইয়ের ইংরাজ কর্তৃপক্ষের সহিত ঔরংজেবের এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল। এই চুক্তির শর্তানুসারে জব চার্ণককে বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি দেওয়া হইল। তিনি ঐবৎসর সুতানুটি গ্রামে বর্তমান কলিকাতা মহানগরীর প্রতিষ্ঠা করিলেন। সেই সময় হইতে ১৬৯৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু পর্যন্ত জব চার্ণক কলিকাতায় রাজক্ষমতা অপেক্ষাও স্বৈরাচারী ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া শাসন পরিচালনা করিয়াছিলেন। এই স্বৈরাচার যে অত্যাচারের নামান্তর ছিল তাহা হ্যামিল্টন-এর বিবরণ হইতে জানিতে পারা যায়।* ইহার পর হইতে বাংলাদেশে ইংরাজ কোম্পানির সমৃদ্ধি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং ১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দে তাহারা নব-প্রতিষ্ঠিত বাণিজ্য-কুঠি সুরক্ষিত করিবার অনুমতিও লাভ করিল। দুই বৎসর পর (১৬৯৮) তাহারা বাৎসরিক বারো শত টাকা খাজনা দিবার শর্তে কলিকাতা (কালীঘাটা), সুতানুটি, গোবিন্দপুর—এই তিনটি গ্রামের জমিদারি লাভ করিল। ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশের ইংরাজ বাণিজ্য-কুঠিগুলি একটি স্বতন্ত্র কাউন্সিলের অধীনে স্থাপন করা হইল এবং কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম নামে একটি সুরক্ষিত দুর্গ নির্মিত হইল। নবগঠিত কাউন্সিলের কর্মকেন্দ্র হইল ফোর্ট উইলিয়াম এবং সার চার্লস্ আয়ার (Sir Charles Eyre) এই কাউন্সিলের সর্বপ্রথম প্রেসিডেণ্ট ও গবর্ণর নিযুক্ত হইলেন।

কলিকাতা মহানগরীর প্রতিষ্ঠা (১৬৯০)

ফোর্ট উইলিয়াম নির্মাণ (১৭০০)

*"Charnock reigned more absolutely than a *Rajah*, only he wanted much of their Humanity, for when any poor ignorant Native transgressed his Laws, they were sure to undergo a severe whipping for a penalty, and the execution was generally done, when he was at dinner, so near his dining room that the groans and cries of the poor delinquents served him for music."—Hamilton, quoted by, Thomson & Garrat, pp. 45-46.

১৭১৪ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা হইতে জন সারম্যান (John Surman) নামে জনৈক ইংরাজ দূতকে বাণিজ্যের সুযোগ-সুবিধা আদায় করিবার উদ্দেশ্যে মোগল দরবারে প্রেরণ করা হইল। ১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট ফারুকৃশিয়ার একটি ফার্মান দ্বারা বাংলা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই-এর ইংরাজ বণিকগণকে বিনা শুল্কে অবাধ-বাণিজ্য পরিচালনার অধিকার দান করিলেন। তদুপরি ইংরাজগণ নিজেদের মুদ্রা প্রচলনের অধিকারও লাভ করিল। ঐতিহাসিক ওরম্ (Orme) এই ফার্মানকে ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির 'ম্যাগ্না কার্টা' (Magna Carta) বা মহাসনন্দ নামে অভিহিত করিয়াছেন। মোগল সাম্রাজ্যের আসন্ন পতনের কালে তথা ভারত-ইতিহাসের এক যুগসন্ধিক্ষণে ইংরাজ বণিকসম্প্রদায় বাংলা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে তাহাদের ভবিষ্যৎ সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ়ভাবে স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

সম্রাট ফারুকৃশিয়ারের 'ফার্মান' (১৭১৭)

অপরাপর ইওরোপীয় বণিকদল (Other European Traders): পোর্তুগীজ বণিকদের সাফল্যে অনুপ্রাণিত হইয়া কেবল ওলন্দাজ, ফরাসী ও ইংরাজ বণিকগণই ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতে আসিয়াছিল এমন নহে। দিনেমার বণিকগণ 'দিনেমার ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানি' গঠন (১৬২০) করিয়া কিছুকাল ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিয়াছিল। কিন্তু ইংরাজ ও ফরাসী বণিকদের প্রতিযোগিতায় আঁটিয়া উঠিতে না পারিয়া উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দিনেমার বণিকগণ ভারতবর্ষ ত্যাগ করে (১৮৪৫)। শ্রীরামপুর ও ট্রাঙ্কুভার এই দুইস্থানে দিনেমার বণিকদের কুঠি স্থাপিত হইয়াছিল। ১৭২২ খ্রীষ্টাব্দে ফ্লাণ্ডার্সের বণিকগণ 'ওস্টেণ্ড্ কোম্পানি,' ১৭৩১ খ্রীষ্টাব্দে সুইডেনের বণিক সম্প্রদায় 'সুইডিশ্ ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানি', অস্ট্রিয়ার বণিকগণ 'অস্ট্রিয়ান ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানি' প্রভৃতি বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু তাহাদের সে চেষ্টা ফলবতী হয় নাই।

দিনেমার, ফ্লামিশ, সুইডিশ্ ও অস্ট্রিয়ান বণিকগণ

প্রথম অধ্যায়
ভারতে ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্ব ঃ ব্রিটিশ শক্তির উত্থান
(Anglo-French Conflict in India : Rise of the British Power)

দাক্ষিণাত্যে ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্ব (Anglo-French Conflict in the Deccan) : অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসের এক পরিবর্তন ঘটে। পতনোন্মুখ মোগল সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগ লইয়া সাম্রাজ্যের বিভিন্নাংশে বিশেষভাবে দাক্ষিণাত্যে কয়েকটি স্বাধীন রাজ্যের সৃষ্টি হয়। এই রাজ্যগুলি যেমন ছিল রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অসংহত, তেমনি ছিল পরস্পর-বিবদমান। দাক্ষিণাত্যের অসংহত, দুর্বল ও পরস্পর-বিবদমান রাজ্যগুলির মধ্যে ইওরোপীয় বণিক-সম্প্রদায়গুলির নিকট হইতে সামরিক সাহায্য গ্রহণের আগ্রহ স্বভাবতই দেখা দিল।* ফলে এইরূপ পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করা ইওরোপীয়দের পক্ষে সহজ হইল। সেই সময়ে দাক্ষিণাত্যে ফরাসী ও ইংরাজ বণিকগণ নিজ নিজ বণিজ্যকেন্দ্র দৃঢ় ও স্থায়িভাবে গড়িয়া তুলিয়াছিল এবং তাহারা বণিক-সম্প্রদায় হইতে রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হইতে চলিয়াছিল। আবার ঠিক সেই সময়েই ইওরোপ মহাদেশ ও আমেরিকায় ইংরাজ ও ফরাসীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলিতেছিল। এই সকল কারণে এবং ভারতবর্ষে ইংরাজ ও ফরাসীদের মধ্যে বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতার ফলে এই দুই জাতির মধ্যে দাক্ষিণাত্যে এক তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং শেষ পর্যন্ত প্রকাশ্য যুদ্ধের সৃষ্টি হইয়াছিল।

দাক্ষিণাত্যে রাজনৈতিক অসংহতি ও অব্যবস্থা ঃ ইংরাজ ও ফরাসী বণিকগণ কর্তৃক সুযোগ গ্রহণ

কর্ণাটের প্রথম যুদ্ধ (The First Carnatic War) : দক্ষিণ-ভারতে ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্ব ইওরোপের ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্বের-ই ভারতীয় সংস্করণ বলা যাইতে পারে। ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে ইওরোপ মহাদেশে অস্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত

*"Meanwhile India's internal strength was being ruined by war of one country power against another. Everywhere
'Hercules killed Hart-a-grease
And Hart-a-grease killed Hercules.'
The carcase was in a condition to invite the eagles." Thomson & Garrat, p. 63.

যুদ্ধ (War of Austrian Succession) শুরু হয়। এই যুদ্ধে ফ্রান্স ও ইংলণ্ড পরস্পর-বিরোধী পক্ষ অবলম্বন করে। উহার পরিপূরক হিসাবেই দাক্ষিণাত্যে ইংরাজ ও ফরাসীদের মধ্যে যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। সেই সময়ে মাদ্রাজ ও সেণ্ট্ ফোর্ট ডেভিড-এ ইংরাজগণের এবং পণ্ডিচেরীতে ফরাসীদের সুরক্ষিত বাণিজ্য-কুঠি গড়িয়া উঠিয়াছিল। ইংরাজ ও ফরাসী কুঠিগুলি দাক্ষিণাত্যের পূর্ব-উপকূলে অবস্থিত ছিল। সুতরাং স্বদেশ হইতে জলপথে সাহায্য পাইবার সুযোগ এবং নৌবাহিনীর সাহায্যে নিজ নিজ কুঠিগুলি রক্ষা করিবার যথেষ্ট সুবিধা তাহাদের ছিল। দাক্ষিণাত্যে স্থানীয় রাজগণের সামরিক দুর্বলতা ও নৌশক্তির অভাবহেতু দাক্ষিণাত্যের রাজনৈতিক ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণের ভার অলক্ষিতে স্বভাবতই ইংরাজ ও ফরাসীদের হস্তে চলিয়া গেল।

অস্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত যুদ্ধ (১৭৪০—৪৮)—ভারতবর্ষেও বিস্তার লাভ

ইওরোপীয়রা করমণ্ডল উপকূলের নামকরণ করিয়াছিল কর্ণাট (The Carnatic)। কর্ণাট ছিল হায়দরাবাদের নিজামের রাজ্যভুক্ত। কিন্তু নিজাম যেমন স্বয়ং দিল্লী সম্রাটের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করিতেন না, কর্ণাটের নবাবও সেইরূপ নিজামের আধিপত্য একপ্রকার অমান্য করিয়াই চলিতেন। ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে কর্ণাটের নবাব দোস্ত আলি মারাঠাদের হস্তে নিহত হইলে তাঁহার রাজ্যে উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত নানাপ্রকার গোলযোগ দেখা দিল। নিজাম স্বয়ং কর্ণাটে আসিয়া এই অব্যবস্থার অবসান ঘটাইতে চাহিলেন। তিনি আনওয়ার-উদ্দিনকে কর্ণাটের শাসনকর্তা বা নবাব নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু ইহাতে কর্ণাটে শান্তি-শৃঙ্খলা পুনঃ-স্থাপন হওয়া দূরের কথা, বিশৃঙ্খলা বহু গুণে বৃদ্ধি পাইল। দোস্ত আলির পরিবারের প্রতি যে সকল জায়গীরদার অনুগত ছিলেন তাঁহারা আনওয়ার-উদ্দিনের নবাব-পদে নিয়োগ অবৈধ বলিয়া বিবেচনা করিলেন। এদিকে দোস্ত আলির জামাতা চাঁদা সাহেবকে মারাঠাগণ ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে বন্দী হিসাবে সাতারা দুর্গে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। চাঁদা সাহেবও আনওয়ার-উদ্দিনের নবাব-পদ লাভে অসন্তুষ্ট হইলেন। কর্ণাটের রাজনৈতিক পরিস্থিতি যখন এইরূপ জটিলতাপূর্ণ তখন দাক্ষিণাত্যে ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্বের সূচনা হয়।

করমণ্ডল উপকূল বা কর্ণাটের রাজনৈতিক পরিস্থিতি

অস্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত যুদ্ধে (১৭৪০-৪৮) ইংলণ্ড ও ফ্রান্স
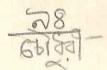
পরস্পর-বিরোধী পক্ষ অবলম্বন করিলেও পণ্ডিচেরীর ফরাসী গবর্ণর ডুপ্লে (Dupleix) প্রথমে ভারতবর্ষে ইংরাজ ও ফরাসীদের মধ্যে শান্তিরক্ষা করিয়া চলিবার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি ইংরাজ কর্তৃপক্ষের সহিত এবিষয়ে পত্রালাপ করিয়াও তাহাদের সম্মতিলাভ করিতে সমর্থ হইলেন না। উপরন্তু ১৬৪৬ খ্রীষ্টাব্দে কমডোর বার্ণেট (Commodore Barnett)-এর অধীনে একটি ব্রিটিশ নৌবহর কয়েকখানি ফরাসী জাহাজ বলপূর্বক অধিকার করিল, এমন কি, পণ্ডিচেরী আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল। ডুপ্লে কর্ণাটের নবাব আনওয়ার-উদ্দিনের নিকট আবেদন জানাইলে তাঁহার আদেশে ইংরাজগণ তাহাদের নৌবহর অপসারণে বাধ্য হইল। কিন্তু ডুপ্লে ইংরাজ নৌবহরের দাক্ষিণাত্যে উপস্থিতিতে আশঙ্কিত হইয়া মরিশাসের গবর্ণর লা বুর্‌দনে (La Bourdonnais)-এর সাহায্য চাহিয়া পাঠাইলেন। বুর্‌দনে আটখানা ফরাসী জাহাজের একটি নৌবহরসহ করমণ্ডল বা কর্ণাট উপকূলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। লা বুর্‌দনের নৌবহরসহ উপস্থিত হওয়ায় ভারতে ইঙ্গ-ফারসী দ্বন্দ্বের এক নূতন অধ্যায়ের স্থচনা হইল। ইংরাজ নৌ-সেনাপতি ফরাসী নৌ-বাহিনীর সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইতে সাহস পাইলেন না। তিনি ইংরাজ বাণিজ্যঘাঁটি মাদ্রাজকে একপ্রকার অরক্ষিত রাখিয়াই ব্রিটিশ নৌবহরসহ হুগলীতে চলিয়া আসিলেন। এই সুবর্ণ-সুযোগ লা বুর্‌দনে হারাইলেন না। তিনি মাদ্রাজ আক্রমণ করিয়া অতি সহজেই তথাকার ইংরাজগণকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করিলেন। ফরাসীগণ কর্তৃক মাদ্রাজ আক্রান্ত হইলে ইংরাজগণ ফরাসীদিগকে নিরস্ত করিবার জন্য নবাব আনওয়ার-উদ্দিনের নিকট আবেদন জানাইয়াছিল। নবাব আনওয়ার-উদ্দিন ডুপ্লেকে মাদ্রাজের অবরোধ উঠাইয়া লইতে আদেশ দিলে কূটকৌশলী ডুপ্লে আনওয়ার-উদ্দিনকে জানাইয়াছিলেন যে, ফরাসীদের মাদ্রাজ আক্রমণের উদ্দেশ্যই হইল উহা জয় করিয়া আনওয়ার-উদ্দিনকে দান করা। আনওয়ার-উদ্দিন ডুপ্লের এই প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করিলেন। মাদ্রাজ জয় সমাপ্ত করিয়া

কমডোর বার্ণেট কর্তৃক ফরাসী জাহাজ দখল

পণ্ডিচেরীর নিরাপত্তা ক্ষুন্ন—আনওয়ার-উদ্দিনের হস্তক্ষেপ

লা বুর্‌দনে কর্তৃক মাদ্রাজ অবরোধ

লা বুর্‌দনে কর্তৃক ইংরাজগণের সহিত চুক্তির শর্তাদি স্থিরীকৃত: ডুপ্লের বিরোধিতা

লা বুর্‌দনে উপযুক্ত পরিমাণ ক্ষতিপূরণ লাভের শর্তে মাদ্রাজ ইংরাজগণকে ফিরাইয়া দিতে স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু ডুপ্লে লা বুর্‌দনের এই চুক্তি অগ্রাহ্য করিয়া মাদ্রাজ ফরাসী অধিকারেই রাখিয়া দিলেন। এই ব্যাপারে লা বুর্‌দনে ও ডুপ্লের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি হইল। ফলে, লা বুর্‌দনে তাঁহার অধীন নৌবহর লইয়া ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

এদিকে আনওয়ার-উদ্দিন দেখিলেন যে, ডুপ্লে তাঁহার পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তাঁহাকে মাদ্রাজ সমর্পণ করিতে মোটেই ইচ্ছুক নহেন। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি এক বিশাল সেনাবাহিনীসহ স্বয়ং মাদ্রাজ দখল করিতে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু মাইলাপুর বা সেন্ট্ টোম্ (Mailapur or St. Thom)-এর যুদ্ধে (১৭৪৬) মুষ্টিমেয় ফরাসী সৈন্যের হস্তে আনওয়ার-উদ্দিন শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইলেন। মুষ্টিমেয় ফরাসী সৈন্যের কাছে আনওয়ার-উদ্দিনের বিশাল বাহিনীর এইরূপ শোচনীয় পরাজয় ইওরোপীয়দের চোখ খুলিয়া দিল। তাহারা বিশেষতঃ, ফরাসী গবর্ণর ডুপ্লে একথা উপলব্ধি করিলেন যে, একদল সু-সংগঠিত এবং ইওরোপীয় সামরিক পদ্ধতিতে শিক্ষিত সৈনিকের সাহায্যে ফরাসীগণ ইচ্ছা করিলে অনায়াসেই ভারতবর্ষে এক সাম্রাজ্য গঠন করিতে সক্ষম হইবে। এই ধারণার বশবর্তী হইয়াই ইওরোপীয়গণ, বিশেষতঃ, ফরাসীরা ভারতীয় রাজনীতিতে অংশ গ্রহণে অধিকতর উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছিল।

আনওয়ার-উদ্দিনের শোচনীয় পরাজয় : ফল

লা বুর্‌দনের সহিত বিরোধের সৃষ্টি করিয়া ডুপ্লে যে অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। লা বুর্‌দনের ভারত-ত্যাগ ফরাসীদের নৌ-শক্তির দুর্বলতার সূচনা করিয়াছিল। ফলে, ডুপ্লে ফোর্ট সেন্ট্ ডেভিড্ জয় করিতে অগ্রসর হইয়া অকৃতকার্য হইলেন। ইতিমধ্যে নৌ-অধ্যক্ষ বোস্‌কাওয়েন (Boscawen)-এর অধীনে এক বিরাট নৌবহর ইংলণ্ড হইতে আসিয়া উপস্থিত হইল। বোস্‌কাওয়েন পণ্ডিচেরী আক্রমণ করিয়া অকৃতকার্য হইলেন। ঐ বৎসরই (১৭৪৮) এই-লা-স্যাপ্‌ল (Aix-la-Chapelle)-এর সন্ধির দ্বারা ইওরোপে ইংরাজ ও ফরাসীদের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হইলে কর্ণাটেও ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিল। ডুপ্লে অনিচ্ছাসত্ত্বেও এই-লা-স্যাপ্‌ল্-এর সন্ধির শর্ত মানিতে বাধ্য হইলেন। তাঁহাকে ইংরাজদের নিকট মাদ্রাজ প্রত্যর্পণ

এই-লা-স্যাপল্-এর সন্ধি (১৭৪৮) : কর্ণাটের প্রথম যুদ্ধের অবসান

করিতে হইল। অবশ্য মাদ্রাজ ফিরাইয়া দিবার বিনিময়ে ফরাসী সরকার উত্তর-আমেরিকাস্থ লুইস্‌বার্গ স্থানটি লাভ করিলেন। এইভাবে দাক্ষিণাত্যে ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্বের প্রথম পর্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটিল।

আপাতদৃষ্টিতে কর্ণাটের প্রথম যুদ্ধের ফলে কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে নাই বলিয়াই মনে হওয়া স্বাভাবিক। ইংরাজ বা ফরাসী কোন পক্ষের-ই এই যুদ্ধের ফলে কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। কিন্তু সামান্য অনুধাবন করিলেই এই যুদ্ধের সুদূরপ্রসারী ফলাফল পরিস্ফুট হইবে। প্রথমত, কর্ণাটের প্রথম যুদ্ধ হইতে এই কথাই প্রমাণিত হইয়াছিল যে, দাক্ষিণাত্য তথা ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য গঠনে সাফল্যের প্রধান শর্তই ছিল শক্তিশালী নৌবহর।* দ্বিতীয়ত, এই যুদ্ধের এক পর্যায়ে মুষ্টিমেয় ফরাসী সৈন্যের হস্তে আনওয়ার-উদ্দিনের শোচনীয় পরাজয় ইওরোপীয় সৈনিকদের সহিত তুলনায় ভারতীয় সৈনিকদের অপকর্ষতা প্রমাণিত করিয়াছিল। ইহা হইতেই ডুপ্লে পরবর্তী কালে যুদ্ধনীতি অনুসরণের প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন। তৃতীয়ত, কর্ণাটের প্রথম যুদ্ধেই সর্বপ্রথম ইওরোপীয় বণিকগণ ভারতীয় রাজগণের সামরিক দুর্বলতার সম্যক পরিচয় লাভ করিয়াছিল। ফলে ডুপ্লে তথা ইওরোপীয় বণিকসম্প্রদায় ভারতীয় রাজনীতিতে প্রকাশ্যভাবে অংশ গ্রহণে অগ্রসর হইতে উৎসাহিত হইয়াছিল এবং তাহার ফলেই ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ভাগ্যে এক বিরাট পরিবর্তনের সূচনা হইয়াছিল। চতুর্থত, এই যুদ্ধে ভারতীয় রাষ্ট্র-ব্যবস্থার পতনোন্মুখতাও পরিস্ফুট হইয়াছিল। আনওয়ার-উদ্দিনের রাজ্যের মধ্যে ইঙ্গ-ফরাসী বণিক সম্প্রদায়ের যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হওয়ার স্বাধীনতা তদানীন্তন ভারতীয় রাষ্ট্র-ব্যবস্থার দুর্বলতার পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

কর্ণাটের প্রথম যুদ্ধের ফলাফল

কর্ণাটের দ্বিতীয় যুদ্ধ (The Second Carnatic War) : এই-লা-

*"The war of Austrian Succession though in appearance it achieved nothing and left the political foundation of India unaltered, yet marks an epoch in Indian history. It demonstrated the overwhelming influence of sea-power when intelligently directed, it displayed the superiority of European methods of war over those followed by Indian armies; it revealed the political decay that had eaten into the heart of the Indian state-system.........In short it set the stage for Dupleix and Clive."—Dodwell, vide, *Text Book of Modern Indian History*, Sarkar & Dutta, p. 75.

স্যাপ্‌ল্‌-এর সন্ধির শর্তানুযায়ী ডুপ্লে ইংরাজদিগকে মাদ্রাজ ফিরাইয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি স্বয়ং ইহাতে মোটেই ইচ্ছুক ছিলেন না। তিনি একথা বুঝিয়াছিলেন যে, তদানীন্তন ভারতের রাজনৈতিক দুর্বলতার সুযোগে ভারতবর্ষে ফরাসী সাম্রাজ্য গঠন করিবার একমাত্র অন্তরায় ছিল ইংরাজদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা। মাদ্রাজ ফরাসী অধিকারে রাখিতে পারিলে ইংরাজগণের শক্তি বহুল পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হইত, বলা বাহুল্য। এই কারণে ডুপ্লে ইংরাজগণকে মাদ্রাজ প্রত্যর্পণের পক্ষপাতী ছিলেন না। অবশ্য অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহাকে ফরাসী সরকারের আদেশ মানিয়া লইতে হইয়াছিল।

ডুপ্লের দূরদর্শিতা

যাহা হউক, অল্পকালের মধ্যেই ডুপ্লের সম্মুখে নূতন সুযোগ উপস্থিত হইল। ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে হায়দরাবাদের নিজাম আসফ্‌ জা (নিজাম উল্‌-মূলক)-এর মৃত্যু হইলে নিজাম-পদের উত্তরাধিকার লইয়া এক জটিল দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হইল। আসফ্‌ জার পুত্র নাসির জঙ্গ ও পৌত্র মুজফ্‌ফর জঙ্গ উভয়েই নিজাম-পদ দাবি করিলেন। এদিকে আনওয়ার-উদ্দিনের পূর্ববর্তী নবাবের জামাতা চাঁদা সাহেব আনওয়ার-উদ্দিনকে অপসারিত করিয়া স্বয়ং কর্ণাটের নবাব-পদ অধিকার করিতে চাহিলেন। মুজফ্‌ফর জঙ্গ ও চাঁদা সাহেব যুগ্মভাবে গোলযোগ শুরু করিলেন। ডুপ্লে দেশীয় রাজগণের এই অন্তর্দ্বন্দ্বে অংশ গ্রহণ করিয়া ফরাসী স্বার্থসিদ্ধি করিতে অগ্রসর হইলেন। তিনি নিজাম নাসির জঙ্গ এবং নবাব আনওয়ার-উদ্দিনের বিরুদ্ধে মুজফ্‌ফর জঙ্গ ও চাঁদা সাহেবকে সাহায্য দানে স্বীকৃত হইলেন। মুজফ্‌ফর জঙ্গ, চাঁদা সাহেব এবং ডুপ্লের সম্মিলিত শক্তির আঘাতে আনওয়ার-উদ্দিন অম্বুর-এর যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হইলেন (১৭৪৯) এবং তাঁহার পুত্র মোহম্মদ আলি ত্রিচিনপলিতে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ফলে, প্রায় সমগ্র কর্ণাট চাঁদা সাহেবের অধিকারে আসিল। চাঁদা সাহেবের মিত্রশক্তি ফরাসীগণ স্বভাবতই কর্ণাটে এক অপ্রতিহত শক্তির অধিকারী হইয়া উঠিল।

হায়দরাবাদ ও কর্ণাটে উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত দ্বন্দ্ব

ফরাসীগণ কর্তৃক মুজফ্‌ফর জঙ্গ ও চাঁদা সাহেবের পক্ষ গ্রহণ

চাঁদা সাহেবের সাফল্য

ফরাসীদের প্রতিপত্তি ও মর্যাদা বৃদ্ধিতে ইংরাজগণের মনে ঈর্ষা ও ভীতি

—দুইয়েরই সঞ্চার হইল। হায়দরাবাদ ও কর্ণাটের উত্তরাধিকার দ্বন্দ্বে ইংরাজগণ মৌখিকভাবে নাসির জঙ্গ ও আনওয়ার-উদ্দিনের পক্ষ সমর্থন করিলেও কার্যতঃ কোন সাহায্যদান করে নাই। কিন্তু ফরাসীদের উত্তরোত্তর শক্তি ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধিতে ভীত হইয়া তাহারা এখন নাসির জঙ্গ ও আনওয়ার-উদ্দিনের পুত্র মোহম্মদ আলির পক্ষ অবলম্বন করিল। ফলে, ইংরাজ ও ফরাসীদের মধ্যে এক প্রকাশ্য যুদ্ধের সূত্রপাত হইল (১৭৫১-৫৪)। ইংরাজ বা ফরাসী সরকারের অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই দাক্ষিণাত্যে এক ইঙ্গ-ফরাসী যুদ্ধ শুরু হইল।

ইংরাজগণ কর্তৃক নাসির জঙ্গ ও মোহম্মদ আলির পক্ষ গ্রহণ

এদিকে চাঁদা সাহেব তাঞ্জোর জয় করিতে গিয়া অযথা কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ত্রিচিনপলিতে মোহম্মদ আলিকে আক্রমণ না করিয়া তিনি তাঁহাকে ইংরাজদের সাহায্যে শক্তি-সঞ্চয়ের সুযোগ দিয়া অদূরদর্শিতার কাজ করিলেন। এদিকে নাসির জঙ্গ এক বিশাল সেনাবাহিনীসহ কর্ণাটে প্রবেশ করিলে মেজর ল্যরেন্স (Major Lawrence)-এর অধীনে ছয় শত ইংরাজ সৈন্য তাঁহার বাহিনীতে যোগদান করিল। নাসির জঙ্গ ও ইংরাজগণের যুগ্ম-বাহিনীর বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করিতে না পারিয়া চাঁদা সাহেব পণ্ডিচেরীতে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। অতঃপর ডুপ্লের উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া তিনি জিঞ্জি নদী-তীরে ভ্যালুদাভুর নামক স্থানে নাসির জঙ্গের সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন (১৭৫০)। কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই তেরজন ফরাসী সামরিক কর্মচারী যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া গেলে একপ্রকার বাধ্য হইয়াই চাঁদা সাহেব ও ফরাসী সেনাধ্যক্ষ অতেউল (Auteuil) পণ্ডিচেরীতে অপসরণ করিলেন ; মুজফ্‌ফর জঙ্গ আত্মরক্ষা করা অসম্ভব বিবেচনা করিয়া পিতৃব্য নাসির জঙ্গের নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন। এইভাবে সাময়িককালের জন্য ফরাসীশক্তি প্রতিহত হইলেও ডুপ্লের সামরিক দূরদর্শিতা, সাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের ফলে ফরাসীগণ জিঞ্জি, তিরুভিতি, মসুলিপট্টম, ভিল্লুপুরম প্রভৃতি স্থান জয় করিতে সমর্থ হইল। নাসির জঙ্গও এই সময়েই আততায়ীর হস্তে প্রাণ হারাইলে মুজফ্‌ফর জঙ্গ মুক্তিলাভ করিলেন। ডুপ্লে তাঁহাকে দাক্ষিণাত্যের সুবাদার-

চাঁদা সাহেব ও মুজফ্‌ফর জঙ্গের পরাজয়

পদে স্থাপন করিয়া তাঁহার সাহায্যের পরিবর্তে কৃতজ্ঞ মুজফ্‌ফর জঙ্গের নিকট হইতে দিভি, মসুলিপট্টম ও প্রভূত পরিমাণ অর্থ ফরাসী কোম্পানির পুরস্কার হিসাবে প্রাপ্ত হইলেন। মুজফ্‌ফর জঙ্গ ডুপ্লেকে কৃষ্ণা নদী হইতে কন্যা-কুমারিকা পর্যন্ত যাবতীয় রাজ্যাংশের গবর্ণর বলিয়া সম্মানিত করেন। ইহা ছাড়া, ডুপ্লে বাৎসরিক দশ হাজার পাউণ্ড আয়ের একটি জায়গীর ও প্রভূত পরিমাণ অর্থ ব্যক্তিগত পুরস্কার হিসাবেও লাভ করিলেন। চাঁদা সাহেব আর্কটের অর্থাৎ কর্ণাটের নবাব-পদে অধিষ্ঠিত হইলেন। কিন্তু তাঁহাকে ডুপ্লের আনুগত্য স্বীকার করিতে হইল। আধুনিক ঐতিহাসিকগণ মনে করেন যে, ডুপ্লের কৃষ্ণা হইতে কুমারিকা রাজ্যাংশের গবর্ণর আখ্যা সম্পূর্ণ মৌখিক সম্মান ভিন্ন অপর কিছুই ছিল না।* কিন্তু মুজফ্‌ফর জঙ্গকে দাক্ষিণাত্যের সুবাদার এবং চাঁদা সাহেবকে কর্ণাটের নবাব-পদে স্থাপন করিবার ফলে ডুপ্লের মর্যাদা ও প্রতিপত্তি যে বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই।

ডুপ্লের সাহায্যে মুজফ্‌ফর জঙ্গ ও চাঁদা সাহেবের জয়লাভ

চাঁদা সাহেব আর্কটের নবাব-পদে অধিষ্ঠিত

মুজফ্‌ফর জঙ্গের দাক্ষিণাত্যের সুবাদার পদ লাভ ঃ ডুপ্লের মর্যাদা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি

এদিকে আনওয়ার-উদ্দিনের পুত্র মোহম্মদ আলি তখনও ত্রিচিনপলিতে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি নিজ পিতার ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং দাক্ষিণাত্যের একাংশের উপর অধিকার লাভের বিনিময়ে চাঁদা সাহেবকে কর্ণাটের নবাব বলিয়া স্বীকার করিতে রাজী আছেন, এই প্রস্তাব প্রেরণ করিলেন। কিন্তু নিজ সাফল্যে গর্বিত ডুপ্লে এই প্রস্তাবে স্বীকৃত না হইয়া অদূরদর্শিতার কাজ করিলেন। তিনি চাহিয়াছিলেন নিজের ইচ্ছামত দাক্ষিণাত্যের রাজনৈতিক ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিতে। সেই সময়ে সণ্ডার্স (Saunders) ফোর্ট সেন্ট্‌ ডেভিডের গবর্ণর হইয়া আসিলেন। তিনি ছিলেন বিচক্ষণ ব্যক্তি। ত্রিচিনপলি ফরাসী হস্তে চলিয়া গেলে ইংরাজদের ব্যবসা-বাণিজ্যের সর্বনাশ সাধিত হইবে বুঝিতে পারিয়া তিনি মোহম্মদ আলিকে যথাসম্ভব সাহায্য দানে প্রস্তুত হইলেন।

ডুপ্লের অদূরদর্শিতা ঃ সণ্ডার্স কর্তৃক মোহম্মদ আলির পক্ষ গ্রহণ

* "The title conferred merely an 'honorary' suzerainty." Vide, *P. E. Roberts : History of British India*, p. 109, Sarkar & Dutta, *Text-Book of Modern Indian History*, p. 79.

মুজফ্‌ফর জঙ্গের অভিষেক-ক্রিয়া পণ্ডিচেরীতে সম্পন্ন হইয়াছিল। ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে ফরাসীদের সর্বশ্রেষ্ঠ সেনাপতি বুসী (Bussy)-কে সঙ্গে লইয়া তিনি হায়দরাবাদে যাত্রা করিলেন, কিন্তু পথিমধ্যে আততায়ীর হস্তে প্রাণ হারাইলেন। বুসী কালক্ষেপ না করিয়া আসফ্‌জা (নিজাম-উল্‌-মূল্‌ক্‌)-এর তৃতীয় পুত্র সলাবৎ জঙ্গকে দাক্ষিণাত্যের সিংহাসনে স্থাপন করিয়া স্বয়ং হায়দরাবাদে নিজ সেনাবাহিনীসহ অবস্থান করিতে লাগিলেন। বুসী ছিলেন দূরদর্শী ও ক্ষমতাবান রাজনীতিক। সামরিক ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তাঁহার হায়দরাবাদে অবস্থানকালে তথায় ফরাসীদের এক অপ্রতিহত প্রতিপত্তি ও প্রাধান্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। বুসী তাঁহার সেনাবাহিনীর ব্যয় সংকুলানের জন্য সলাবৎ জঙ্গের নিকট হইতে ইলোর, রাজমহেন্দ্রী, চিকাকোল ও মুস্তাফা নগর—এই চারিটি জেলা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এইভাবে ডুপ্লের পরিকল্পনা ও বুসীর বিচক্ষণ কার্যক্ষমতায় দাক্ষিণাত্যে ফরাসী অধিকার, মর্যাদা ও প্রতিপত্তি বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

সলাবৎ জঙ্গকে দাক্ষিণাত্যের সিংহাসনে স্থাপন: বুসীর প্রতিপত্তি

ত্রিচিনপলির ভৌগোলিক অবস্থান বাণিজ্যিক ও সামরিক উভয় দিক দিয়াই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সুতরাং ফরাসী সৈন্য ত্রিচিনপলি অবরোধ করিল। ফোর্ট সেণ্ট্‌ ডেভিডের নূতন গবর্ণর সণ্ডার্স অবরুদ্ধ মোহম্মদ আলিকে সামরিক সাহায্য দান করিলেন। ইহা ভিন্ন তাঞ্জোরের রাজা, মহীশূরের রাজা ও মারাঠাগণ ইংরাজপক্ষ অবলম্বন করিলেন। সণ্ডার্স কর্ণাটের রাজধানী আক্রমণের দায়িত্ব রবার্ট ক্লাইভ নামে জনৈক কর্মচারীর উপর ন্যস্ত করিলেন।

ত্রিচিনপলির গুরুত্ব: সণ্ডার্স কর্তৃক ত্রিচিনপলি রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ

ক্লাইভ প্রথম জীবনে সামান্য কেরাণী হিসাবে ইস্ট্‌ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে কার্য গ্রহণ করিয়া পরে মেজর স্ট্রিন্‌জার (Major Stringer)-এর অধীনে সামরিক কার্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। ক্লাইভ অসাধারণ বীরত্ব, সামরিক কৌশল ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের সাহায্যে আর্কট জয় করিয়া (১৭৫১) চাঁদা সাহেব ও ফরাসী সৈন্যের আক্রমণ হইতে উহার নিরাপত্তা বিধান করিতে সমর্থ হইলেন। ইহার পর ক্লাইভ অরূনি ও কাবেরীপাক-এর যুদ্ধে ফরাসী সৈন্যের বিরুদ্ধে

ক্লাইভের কৃতিত্ব: আর্কট জয়

জয়লাভ করিলেন। আর্কট অধিকার ক্লাইভের তথা দাক্ষিণাত্যে ইংরাজগণের
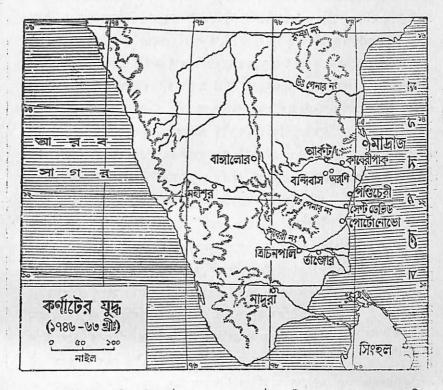
ভাগ্য পরিবর্তন করিয়াছিল, ইহাতে সন্দেহ নাই। চাঁদা সাহেব এবং ফরাসী সৈন্যাধ্যক্ষ জেক্‌স্ ল' (Jaques Law) আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। আত্মসমর্পণের পর চাঁদা সাহেবকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হইয়াছিল। এইভাবে ব্রিটিশের সাহায্যে মোহম্মদ আলি সমগ্র কর্ণাটের নবাব-পদ লাভ করিলেন।

চাঁদা সাহেব ও জেক্‌স্ ল'-এর আত্মসমর্পণ

কিন্তু ডুপ্লে ইহাতেও দমিবার পাত্র ছিলেন না। তিনি কূটকৌশলে মহীশূরের রাজা ও মারাঠানেতা মুরার রাওকে স্বপক্ষে আনিতে সক্ষম হইলেন। তাঞ্জোরের রাজাও ফরাসীদের বিরোধিতা করিবেন না বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন। পরিস্থিতির এইরূপ পরিবর্তনে দাক্ষিণাত্যে ইংরাজগণের অবস্থা পুনরায় সঙ্কটাপন্ন হইয়া পড়িল। এই অবস্থা হইতে ইংরাজদের নিরাপত্তা ও স্বার্থ রক্ষা করিলেন রবার্ট ক্লাইভ। ক্লাইভের সামরিক

ডুপ্লের কূটকৌশল : ক্লাইভের সামরিক কৃতিত্ব

দক্ষতার বিরুদ্ধে ফরাসী, মারাঠা ও মহীশূরের যুগ্মবাহিনীও আঁটিয়া উঠিতে পারিলেন না। এদিকে ফরাসীদের অর্থাভাব চরমে পৌঁছিয়াছিল। কিন্তু ডুপ্লে নিজ অর্থ ব্যয় করিয়াও যুদ্ধ চালাইতে লাগিলেন।

১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে লা বুর্‌দনে ও ডুপ্লের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে লা বুর্‌দনে ফ্রান্সে চলিয়া গিয়াছিলেন একথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। তিনি স্বদেশে পৌঁছিয়াই দাক্ষিণাত্যে ফরাসী কোম্পানির কার্যাদি পরিচালনা ব্যাপারে ডুপ্লের স্বেচ্ছাচারিতার অভিযোগ করিয়া এক দীর্ঘ পত্র ফরাসী কোম্পানির কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করিয়াছিলেন। এই অভিযোগ-পত্র এবং বিশেষভাবে কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া পরাজিত হইবার অপরাধের ফলে গডেহু (Godehu) নামে জনৈক পদস্থ ব্যক্তিকে ডুপ্লের স্থলে নিয়োগ করিয়া প্রেরণ করা হইল। প্রয়োজনবোধে ডুপ্লেকে গ্রেপ্তার করিবার ক্ষমতাও গডেহুকে দেওয়া হইল। ১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে পণ্ডিচেরীতে পৌঁছিয়া গডেহু ডুপ্লের নিকট হইতে সকল দায়িত্ব নিজ হস্তে গ্রহণ করিলেন। পর বৎসর (১৭৫৫) জানুয়ারি মাসে ইংরাজ ও ফরাসীদের মধ্যে এক শান্তিচুক্তি স্থাপিত হইল। কোন পক্ষই ভবিষ্যতে ভারতীয় রাজগণের পরস্পর দ্বন্দ্বে অংশ গ্রহণ করিবেন না, এই নীতিও গৃহীত হইল। অবশ্য এই চুক্তি ইংলণ্ড ও ফ্রান্সে অবস্থিত কোম্পানির কর্তৃপক্ষের অনুমোদন-সাপেক্ষ ছিল।

ডুপ্লের পদচ্যুতি

কর্ণাটের দ্বিতীয় যুদ্ধের অবসান

ডুপ্লের চরিত্র, নীতি ও কৃতিত্ব (Character, Policy & Achievements of Dupleix): যোসেফ্ ডুপ্লে ১৭৩১ খ্রীষ্টাব্দে চন্দননগরের শাসনকর্তা হিসাবে ভারতবর্ষে আসেন। ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পণ্ডিচেরীর গবর্ণর-পদে নিযুক্ত হন। পণ্ডিচেরীর গবর্ণর হিসাবেই ডুপ্লে ভারত-ইতিহাসে পরিচিতি লাভ করিয়াছেন। তিনি ছিলেন সাহসী যোদ্ধা এবং দূরদর্শী রাজনীতিক। বিপদে তিনি ধৈর্য হারাইতেন না। যে-কোন জটিল পরিস্থিতিতে স্থিরভাবে বিচার করিয়া অগ্রসর হইবার অনন্যসাধারণ ক্ষমতা তাঁহার চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। তাঁহার আকাঙ্ক্ষা ছিল অপরিসীম। কর্ণেল ম্যালেসন্ (Colonel Malleson), হিউ মারে (Hugh Murray) প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ তাঁহার কর্মপন্থা ও নীতির যৌক্তিকতা, তাঁহার সামরিক কৌশল এবং দূর-

দর্শিতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। ম্যালেসনের মতে ডুপ্লে ছিলেন যে-কোন জাতির শ্রেষ্ঠ প্রতিভা-সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের অন্যতম। তিনি একাধারে একজন সুদক্ষ শাসক, সুচতুর কূটনীতিক, অনন্যসাধারণ সংগঠক, এবং অত্যধিক প্রভাবশালী ব্যক্তি।

ম্যালেসনের অভিমত

তাঁহার সূক্ষ্ম বুদ্ধিমত্তা, অসম সাহসিকতা, উদারতা ও আভিজাত্য তাঁহাকে সর্বদা সংকীর্ণতা, ঈর্ষাপরায়ণতা প্রভৃতির উর্ধ্বে রাখিয়াছিল। রবার্টস্ (P. E. Roberts) প্রমুখ আধুনিক ঐতিহাসিকদের কেহ কেহ ম্যালেসন্ বা হিউ মারে-এর প্রশংসায় অতিশয়োক্তি লক্ষ্য করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে অর্থগৃধ্নুতা, আত্মম্ভরিতা, অধীন কর্মচারীদের প্রতি ঔদ্ধত্য প্রভৃতি দোষ ডুপ্লের চরিত্রে যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু তাঁহারাও ডুপ্লের স্বদেশপ্রীতি, ফরাসী স্বার্থরক্ষার জন্য নিজ অর্থব্যয় করিবার মতো ত্যাগ এবং সর্বোপরি তাঁহার বিচক্ষণতার প্রশংসা করিয়াছেন। ব্রিটিশ-শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বী ফরাসী গবর্ণরের চরিত্র বিচারে ইংরাজ ঐতিহাসিকগণের একদেশ-দর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়। তথাপি তাঁহাদের রচনায় ডুপ্লের চরিত্রের প্রশংসা, ডুপ্লের চরিত্রকে নিরপেক্ষ বিচারকের দৃষ্টিতে অধিকতর মর্যাদা দান করিবে, বলা বাহুল্য।

চরিত্র

ডুপ্লে যখন পণ্ডিচেরীর গবর্ণর নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তখন দাক্ষিণাত্যে এক ব্যাপক রাজনৈতিক অব্যবস্থা দেখা দিয়াছিল। হায়দরাবাদের নিজাম আসফ্ জার মৃত্যু হইলে হায়দরাবাদ ও কর্ণাট-এর উত্তরাধিকার লইয়া এক জটিল প্রতিদ্বন্দ্বিতার সৃষ্টি হইয়াছিল। বিচক্ষণ ডুপ্লে ভারতীয় সেনাবাহিনী তথা ভারতীয় রাজগণের দুর্বলতার কথা স্পষ্টভাবেই বুঝিতে পারিলেন। তিনি দেখিলেন যে, ব্যক্তিগতভাবে সাহস বা বীরত্বে ভারতীয় সৈনিকগণ ইওরোপীয় সৈনিক অপেক্ষা কোন অংশে কম না হইলেও সংগঠন, শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতার অভাবহেতু তাহারা ইওরোপীয়দের মতো দক্ষতা প্রদর্শন করিতে পারে না। তদুপরি সামরিক কৌশল এবং সামরিক শিক্ষার দিক দিয়াও তাহারা ইওরোপীয় সৈন্যদের অপেক্ষা বহু নিকৃষ্ট। এই সকল দুর্বলতা লক্ষ্য করিয়া ডুপ্লে একদল ভারতীয় সৈন্যকে ইওরোপীয় পদ্ধতিতে সামরিক শিক্ষাদান করিয়া উহার সাহায্যে ভারতীয় রাজগণের পরস্পর বিবাদ-বিসম্বাদে অংশ গ্রহণ করিতে মনস্থ করিলেন।

নীতি ও কর্মপন্থা

এইভাবে তিনি দেশীয় রাজগণের নিকট ফরাসী সামরিক সাহায্য অপরিহার্য করিয়া তুলিয়া ক্রমে ভারতবর্ষে এক বিশাল ফরাসী সাম্রাজ্য স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করিলেন। বস্তুত তিনিই ছিলেন সর্বপ্রথম ইওরোপীয় যিনি ভারতে সাম্রাজ্য গঠনের কল্পনা করিয়াছিলেন। ভারতে সাম্রাজ্য গঠন করিতে সমর্থ হইলে ফ্রান্স হইতে ভারতীয় বাণিজ্যের জন্য রৌপ্য প্রেরণেরও প্রয়োজন থাকিবে না, একথাও ডুপ্লে ভাবিয়াছিলেন। তদানীন্তন ভারতের রাজনৈতিক অব্যবস্থা ডুপ্লের স্বার্থসিদ্ধির অনুকূল ছিল। স্বভাবতই ডুপ্লের নীতি সাফল্যমণ্ডিত হইবার পথে কোন প্রতিবন্ধক ছিল না।

কর্ণাটের প্রথম যুদ্ধ, মাদ্রাজ অধিকার

অস্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত দ্বন্দ্ব শুরু হইলে ডুপ্লে ইংরাজদের ঘাঁটি মাদ্রাজ অবরোধ করিলেন। কর্ণাটের নবাব ইহাতে আপত্তি জানাইলে এবং মাদ্রাজ হইতে ফরাসী সৈন্য অপসারণের আদেশ দিলে ডুপ্লে কূটকৌশলে নবাব আনওয়ার-উদ্দিনকে নিরস্ত করিলেন। তিনি মাদ্রাজ জয় করিয়া আনওয়ার-উদ্দিনকে দান করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন, কিন্তু কার্য-ক্ষেত্রে ইহার অন্যথা হওয়ায় আনওয়ার-উদ্দিন স্বয়ং ফরাসী অধিকার হইতে মাদ্রাজ দখল করিবার উদ্দেশ্যে সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন। মাইলাপুর বা সেন্ট্ টোম-এর যুদ্ধে মুষ্টিমেয় ফরাসী সৈন্যের হস্তে আনওয়ার-উদ্দিন পরাজিত হইলে ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হইল, বলা যাইতে পারে। অতঃপর ডুপ্লে ভারতীয় রাজগণের দুর্বলতার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং ইংরাজগণের নিকট লা বুর্দনের প্রতিশ্রুতি উপেক্ষা করিয়া মাদ্রাজ ফরাসী অধিকারে রাখিয়া দিলেন। ফলে, লা বুর্দনের সহিত তাঁহার এক তীব্র বিরোধের সৃষ্টি হইয়াছিল এবং লা বুর্দনে শেষ পর্যন্ত পণ্ডিচেরী ত্যাগ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

ফোর্ট সেন্ট্ ডেভিড আক্রমণ বিফল, পণ্ডিচেরী আক্রমণ প্রতিহত

ইহার পরে ডুপ্লে ইংরাজ ঘাঁটি ফোর্ট সেন্ট্ ডেভিড্ দখল করিতে গিয়া অকৃতকার্য হইলেন। কিন্তু তিনি ইংরাজ নৌ ও স্থলবাহিনী কর্তৃক পণ্ডিচেরীর পাল্টা আক্রমণ সহজেই প্রতিহত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। যাহা হউক ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহাকে এই-লা-স্যাপ্‌ল্‌-এর সন্ধির শর্তানুযায়ী মাদ্রাজ ইংরাজদিগকে প্রত্যর্পণ করিতে হইয়াছিল। ইহার ফলে কর্ণাটের প্রথম যুদ্ধে ডুপ্লের সাফল্য মূল্যহীন হইয়া পড়িল।

কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই নূতন সুযোগ উপস্থিত হইল। নিজাম আসফ্-জার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে হায়দরাবাদ ও কর্ণাট উভয় স্থানের উত্তরাধিকার লইয়া দ্বন্দ্ব শুরু হইলে ডুপ্লে মুজফ্ফর জঙ্গ ও চাঁদা সাহেবের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। অপর দিকে, ইংরাজগণ নাসির জঙ্গ ও আনওয়ার-উদ্দিনের পক্ষ গ্রহণ করিল। এইভাবে কর্ণাটের দ্বিতীয় যুদ্ধের সূচনা হইল। যুদ্ধের প্রথম দিকে ইংরাজগণ তেমন তৎপরতা দেখাইল না। ফলে, ডুপ্লের সাহায্যপুষ্ট মুজফ্ফর জঙ্গ হায়দরাবাদের এবং চাঁদা সাহেব কর্ণাটের সিংহাসন লাভে সমর্থ হইলেন। দাক্ষিণাত্যে ফরাসী প্রাধান্য ও প্রতিপত্তি অপ্রতিহত হইয়া উঠিল। দেশীয় রাজগণের চক্ষে ফরাসীদের মর্যাদাও বহুগুণে বৃদ্ধি পাইল। ইহার প্রায় অব্যবহিত পরেই মুজফ্ফর জঙ্গের মৃত্যু ঘটিলে ফরাসীরা নিজাম আসফ্জার পৌত্র সলাবৎ জঙ্গকে হায়দরাবাদের সিংহাসনে স্থাপন করিয়া সমগ্র দাক্ষিণাত্যে তাহাদের প্রাধান্য বজায় রাখিল। কিন্তু ফরাসী প্রাধান্য ও প্রতিপত্তি দীর্ঘকাল স্থায়ী হইল না। ইংরাজগণ ফরাসী মর্যাদা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধিতে শঙ্কিত ও ঈর্ষান্বিত হইয়া উঠিল। তাহারা আনওয়ার-উদ্দিনের পুত্র মোহম্মদ আলি এবং নাসির জঙ্গকে সর্বতোভাবে সাহায্য দান করিতে লাগিল। ফলে, পুনরায় এক তীব্র দ্বন্দ্বের সূচনা হইল। এই দ্বন্দ্বে দাক্ষিণাত্যে ইংরাজগণের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিল। এমন সময়ে রবার্ট ক্লাইভের তৎপরতায় যুদ্ধের গতি ইংরাজগণের সপক্ষে পরিবর্তিত হইল। ক্লাইভ আর্কট জয় করিলেন এবং চাঁদা সাহেব ও জেকৃস্ ল' আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। সমগ্র কর্ণাটে ফরাসী প্রাধান্যের স্থলে ইংরাজ প্রাধান্য স্থাপিত হইল। মোহম্মদ আলি কর্ণাটের নবাব-পদে অধিষ্ঠিত হইলেন। কর্ণাটের দ্বিতীয় যুদ্ধে এইভাবে পরাজিত হওয়ায় ডুপ্লের উচ্চাকাঙ্ক্ষাও ধূলিসাৎ হইল। ফরাসী সরকারের বিনা অনুমতিতে কর্ণাটের দ্বিতীয় যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া পরাজিত হওয়ার অপরাধে ডুপ্লে পদচ্যুত হইলেন। তাঁহাকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের আদেশ দেওয়া হইল। ডুপ্লের স্থলে গডেহু পণ্ডিচেরীর গবর্ণর নিযুক্ত হইয়া আসিলেন।

কর্ণাটের দ্বিতীয় যুদ্ধ

ডুপ্লের সাফল্য

ইংরাজদের ভীতি ও ঈর্ষা—রবার্ট ক্লাইভের কৃতিত্ব—ফরাসী পরাজয়

ডুপ্লের পদচ্যুতি

কিছুকালের মধ্যে ফরাসী কর্তৃপক্ষ ডুপ্লের কর্মপন্থার বিশদ বিবরণ ও

যৌক্তিকতা সম্পর্কে অবগত হইয়া তাঁহার পদচ্যুতির আদেশ প্রত্যাহার করিলেন এবং তাঁহাকে পুনরায় পণ্ডিচেরীতে গবর্ণর-পদে নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু এই আদেশ পণ্ডিচেরীতে আসিয়া পৌঁছিবার পূর্বেই ডুপ্লে পণ্ডিচেরী পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন।

ফরাসী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ডুপ্লের নীতি সমর্থন

দক্ষিণ-ভারতের রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করিয়া ভারতবর্ষে ফরাসী সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিবার যে আশা ডুপ্লে পোষণ করিতেন তাহা শেষ পর্যন্ত বিফলতায় পর্যবসিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। ফরাসীদের অসাফল্যের জন্য ডুপ্লের ব্যক্তিগত ত্রুটি এবং সামরিক ভুলও যে কতক পরিমাণে দায়ী ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তথাপি ডুপ্লে-ই যে সর্বপ্রথম ভারতবর্ষে ইওরোপীয় সাম্রাজ্য গঠনের কথা ভাবিয়াছিলেন একথা অনস্বীকার্য। তিনি স্বয়ং এই নীতি কার্যকরী করিতে সমর্থ হন নাই বটে, কিন্তু তাঁহার নীতি অনুসরণ করিয়াই পরবর্তী কালে ইংরাজগণ ভারতবর্ষে এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছিল। ডুপ্লে যে ভারতে ইওরোপীয় সাম্রাজ্য স্থাপনের পথপ্রদর্শক ছিলেন, একথা অনস্বীকার্য। ডুপ্লের পরিকল্পনা, তাঁহার বলিষ্ঠ মানসিক শক্তি, তাঁহার দুঃসাহসিকতা ও দূরদর্শিতার পরিচায়ক ছিল। তিনি যে বিশাল পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা ফরাসী বণিক কোম্পানির ন্যায় অর্থাভাবগ্রস্ত ও জাতীয় সমর্থনহীন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে কার্যকরী করা সম্ভব ছিল না। ইহার জন্য প্রয়োজন ছিল সমগ্র ফরাসী জাতির সাহায্য, সহানুভূতি ও সমর্থন। কিন্তু অর্থাভাব ও নানাবিধ বাধা-বিপত্তি উপেক্ষা করিয়াও ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দে ডুপ্লে ভারতবর্ষে ফরাসীদের এক অপ্রতিহত শক্তিতে পরিণত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ফরাসী প্রতিপত্তি ও মর্যাদা সেই সময়ে চরমে পৌঁছিয়াছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ডুপ্লের বিফলতা তাঁহার প্রতিভা ও গৌরবকে ম্লান করিতে পারে নাই। তাঁহার স্বদেশপ্রীতি, ফরাসী স্বার্থের জন্য ব্যক্তিগত স্বার্থত্যাগ প্রভৃতি তাঁহাকে ভারতবর্ষে ফরাসী অধিকারের ইতিহাসে গৌরবোজ্জ্বল আসন দান করিয়াছে।*

ডুপ্লের কৃতিত্ব

---

*"But in spite of his final failure, Dupleix is a striking and brilliant figure in Indian History." Roberts, *History of British India*, p. 115.

ডুপ্লের বিফলতার কারণ (Causes of Dupleix's failure) : ডুপ্লের বিফলতার কারণ সম্পর্কে আলোচনার প্রারম্ভেই তাঁহার বিফলতা কি পরিমাণে তাঁহার পরিকল্পনার ত্রুটির ফলে ঘটিয়াছিল সেই আলোচনা করা সমীচীন। ডুপ্লের নীতি ছিল ভারতীয় নৃপতিদের দুর্বলতা ও অন্তর্দ্বন্দ্বের সুযোগ গ্রহণ। দেশীয় নৃপতিদের সামরিক দুর্বলতা এবং ভারতীয় সৈনিকদের সামরিক অপকর্ষতা, তাহাদের শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতার অভাব প্রভৃতি সুচতুর ডুপ্লের দৃষ্টি এড়ায় নাই। এইরূপ পরিস্থিতিতে ডুপ্লের নীতি ও কর্মপন্থা যে সর্বাধিক উপযোগী ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাঁহার বিফলতা তাঁহার নীতি বা পরিকল্পনার ত্রুটির জন্য ঘটিয়াছিল বলা যায় না। তাঁহারই প্রদর্শিত নীতি অনুসরণ করিয়া পরবর্তী কালে ইংরাজগণ ভারতবর্ষে এক বিশাল সাম্রাজ্য গঠনে সক্ষম হইয়াছিল। ডুপ্লের ন্যায় বিচক্ষণ ও দূরদর্শী নেতার পরাজয় এবং ঠিক অনুরূপ নীতি অনুসরণ করিয়া রবার্ট ক্লাইভের জয়লাভ বিস্ময়কর সন্দেহ নাই। সুতরাং ডুপ্লের বিফলতার কারণ অন্যত্র খুঁজিতে হইবে।

ডুপ্লের বিফলতা—তাঁহার নীতি বা পরিকল্পনার ত্রুটির ফল (?)

প্রথমত, ডুপ্লে ফরাসী কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ও সমর্থনের অপেক্ষা না রাখিয়া নিজ পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্য সম্পাদনের পক্ষপাতী ছিলেন। ফরাসী সরকারের নিকট নিজ পরিকল্পনা প্রথমে গোপন রাখিয়া যুদ্ধজয়ের মাধ্যমে ভারতে এক ফরাসী সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিয়া তিনি কৃতিত্ব অর্জন করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষে ফরাসী সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিতে পারিলে বাণিজ্যের জন্য প্রয়োজনীয় রৌপ্য আর ফ্রান্স হইতে আনিতে হইবে না। ভারতীয় সাম্রাজ্য হইতেই তাহা সংগ্রহ করা যাইবে। কিন্তু ডুপ্লে নিজ পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষের নিকট গোপন রাখিয়া ভুল করিয়াছিলেন। বিশেষত, লা বুর্দনে যখন স্বদেশে ফিরিয়া গেলেন তাহার পর হইতে কর্তৃপক্ষের নিকট সবকিছু গোপন রাখা অদূরদর্শিতার কাজ হইয়াছিল। কারণ লা বুর্দনের অভিযোগ কর্তৃপক্ষের মনে ডুপ্লের প্রতি কতকটা বিরুদ্ধ মনোভাবের সৃষ্টি করিয়াছিল। এমত অবস্থায় নিজ পরিকল্পনা গোপন রাখিয়া তিনি তাঁহার প্রতি ফরাসী কর্তৃপক্ষের মনে সন্দেহ ও বিরুদ্ধভাব সৃষ্টিতে সাহায্য

বিফলতার প্রকৃত কারণ :

(১) কর্তৃপক্ষ হইতে কর্মপন্থা গোপন রাখিবার ভ্রান্ত নীতি

করিয়াছিলেন। কর্তৃপক্ষকে সকল বিষয়ে অবহিত রাখিলে তাঁহার পদ-চ্যুতির কোন প্রশ্নই উঠিত না। কারণ, ডুপ্লের কর্মপন্থার বিশদ বিবরণ ও যুক্তি সম্পর্কে অবহিত হওয়ামাত্র ফরাসী কর্তৃপক্ষ তাঁহার পদচ্যুতির আদেশ নাকচ করিয়া তাঁহাকে পুনরায় পণ্ডিচেরীর গবর্ণর-পদে বহাল করিয়াছিলেন।

(২) বুসী ও ডুপ্লের যুগ্ম-ভাবে কর্ণাট রক্ষার চেষ্টার ত্রুটি

দ্বিতীয়ত, ফরাসীপক্ষের শ্রেষ্ঠ সেনাপতি বুসীকে হায়দরাবাদে প্রেরণ করিয়া ডুপ্লে ভুল করিয়াছিলেন। কারণ, ইংরাজদের আক্রমণ প্রতিহত করিতে বুসীর সহায়তার একান্ত প্রয়োজন ছিল। বুসী ও ডুপ্লের যুগ্ম চেষ্টায় কর্ণাট রক্ষা করা হয়ত সম্ভব হইত। ডুপ্লের পরবর্তী কালে অবশ্য বুসীকে কর্ণাট রক্ষার জন্য, বিশেষত মাদ্রাজ জয়ের জন্য, ফিরিয়া আসিতে আদেশ দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু তখন ফরাসী শক্তি প্রায় বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছে।

(৩) ইংরাজগণের সহিত শান্তি স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা অনুপলব্ধ

তৃতীয়ত, চাঁদা সাহেব ও জেক্‌স্ ল'-এর আত্মসমর্পণের পর ডুপ্লের পক্ষে ইংরাজদের সহিত যথাসম্ভব সুবিধাজনক শর্তে শান্তি স্থাপন করা উচিত ছিল। কারণ, ঐ সময়ে পণ্ডিচেরীতেও ডুপ্লের বিরোধী পক্ষ ক্রমেই শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছিল। বুসীও ডুপ্লেকে শান্তি স্থাপনের জন্য পরামর্শ দিয়াছিলেন। কিন্তু পরে ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ডুপ্লে যখন ক্রমাগত পরাজয়ে অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহার অর্থাভাব চরমে পৌঁছিল তখন তিনি শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করিয়াও অকৃতকার্য হইলেন। কারণ, ইংরাজপক্ষ সেই সময়ে নিজেদের বিজয় সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ ছিল। সুতরাং শান্তি স্থাপন করা সম্ভব হইল না।

(৪) ফরাসীপক্ষে ব্যক্তিগত অপকর্ষতা

চতুর্থত, ইংরাজপক্ষে রবার্ট ক্লাইভের উদ্দীপনা ও দুঃসাহসিকতা, লরেন্সের দক্ষতা ও সমরকুশলতা এবং সণ্ডার্সের একাগ্রতার সহিত তুলনা করিবার মতো ক্ষমতা বা দক্ষতা ফরাসী-পক্ষে কাহারও ছিল না। এই ব্যক্তিগত অপকর্ষতাও ডুপ্লের পতনের অন্যতম কারণ ছিল, বলা বাহুল্য।

পঞ্চমত, দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ডুপ্লের অর্থের প্রয়োজনও দিন দিনই বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছিল। অথচ ইতিপূর্বেই তিনি ফরাসী কর্তৃপক্ষের মনে ভারতে ফরাসী-অধিকৃত স্থানের আর্থিক প্রাচুর্য সম্পর্কে যে উচ্চ ধারণার সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহাতে কর্তৃপক্ষের নিকটও অর্থ সাহায্য চাহিবার মতো কোন যুক্তি তাঁহার ছিল না। তাঁহার বিফলতার জন্য অর্থাভাব যথেষ্ট পরিমাণে দায়ী ছিল, ইহা অনস্বীকার্য।

(৫) অর্থাভাব

ষষ্ঠত, ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য গঠনে নৌশক্তির প্রয়োজনীয়তা ডুপ্লে সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। ফলে, লা বুর্দনের ভারত ত্যাগেও তিনি তেমন বিচলিত হন নাই বা লা বুর্দনের সাহায্যের মূল্যও তিনি উপলব্ধি করেন নাই। স্বভাবতই, নৌবলে বলীয়ান ইংরাজদের বিরুদ্ধে দ্বন্দ্বে ফরাসীপক্ষ পরাজিত হইয়াছিল। নৌশক্তির অভাব ডুপ্লে তথা ফরাসীদের বিফলতার অন্যতম প্রধান কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল ইহা অনস্বীকার্য।

(৬) উপযুক্ত নৌশক্তির অভাব

সর্বশেষে, ইহা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ডুপ্লে সমসাময়িক ফরাসী কর্তৃপক্ষের সহায়তা লাভ করেন নাই। সাম্রাজ্য গঠনের আর্থিক বা সামরিক প্রয়োজন ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় মিটান সম্ভব নহে। কিন্তু ফরাসী সরকার তথা ফরাসী জাতির সহায়তা থাকিলে ডুপ্লে হয়ত অকৃতকার্য হইতেন না।

(৭) ফরাসী কর্তৃপক্ষের সহায়তার অভাব

কর্ণাটের তৃতীয় যুদ্ধ (The Third Carnatic War) : ডুপ্লের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পরবর্তী কয়েক বৎসর দাক্ষিণাত্যে ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্ব স্থগিত রহিল। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ইওরোপ ও আমেরিকার সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ (Seven Years' War) শুরু হইলে ভারতবর্ষে পুনরায় ইংরাজ ও ফরাসীদের মধ্যে প্রকাশ্য যুদ্ধ আরম্ভ হইল। অবশ্য এইবারের ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্বের প্রধান কেন্দ্র ছিল বাংলাদেশ। দাক্ষিণাত্যেও দুই পক্ষে যুদ্ধের ত্রুটি হইল না। সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে ফরাসী সরকার কাউন্ট লালি (Count Lally) নামক জনৈক সেনাধ্যক্ষের উপর ইংরেজদের ঘাঁটি ফোর্ট

সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের সূচনা (১৭৫৬)—কর্ণাটের তৃতীয় যুদ্ধ

সেণ্ট্ ডেভিড্ জয় করিবার দায়িত্ব অর্পণ করিয়া প্রেরণ করিলেন। লালি প্রথমে ফোর্ট সেণ্ট্ ডেভিড্ জয় করিতে সক্ষম হইলেও তাঞ্জোর আক্রমণ করিতে গিয়া সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হইলেন। এমন সময়ে লালি এক মারাত্মক সামরিক ভুল করিয়া বসিলেন। তিনি বুসীকে হায়দরাবাদ হইতে ফিরিয়া আসিতে আদেশ দিলেন। লালির উদ্দেশ্য ছিল বুসীর সহিত যুগ্মভাবে মাদ্রাজ আক্রমণ করিয়া তথা হইতে ইংরাজগণকে বিতাড়িত করা। কিন্তু বুসীর স্থলে দাক্ষিণাত্যে তিনি যাঁহাকে পাঠাইলেন তিনি ব্রিটিশ সেনাধ্যক্ষ কর্ণেল ফোর্ড (Colonel Forde)-এর হস্তে পরাজিত হইলেন। পরিস্থিতির এইরূপ পরিবর্তনে নিজাম সলাবৎ জঙ্গ চিকাকোল, ইলোর, রাজমহেন্দ্রী প্রভৃতি স্থান ইংরাজগণকে দান করিলেন। এই সকল স্থান ইংরাজগণ কর্তৃক 'উত্তর সরকার' (Northern Sircars) নামে অভিহিত হইল। সলাবৎ জঙ্গ পরিস্থিতি বিবেচনা করিয়া ইংরাজপক্ষে যোগদান করিলেন। এদিকে লালি ও বুসীর যুগ্ম আক্রমণেও মাদ্রাজ অধিকার করা সম্ভব হইল না। ইহার পর লালি ইংরাজ সেনাপতি সার আয়ার কূট (Sir Eyre Coote)-এর হস্তে বন্দিবাসের যুদ্ধে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইলে দাক্ষিণাত্যে তথা ভারতে ফরাসী প্রাধান্য স্থাপনের আশা চিরতরে নির্বাপিত হইল। বন্দিবাসের যুদ্ধের পর লালি পণ্ডিচেরীতে অপসরণ করিলেন। কিন্তু ইংরাজ সৈন্য পণ্ডিচেরীও অবরোধ করিল। দীর্ঘকাল অবরুদ্ধ অবস্থায়ও যুদ্ধ করিয়া অবশেষে খাদ্যাভাবহেতু লালিকে আত্মসমর্পণ করিতে হইল। ইংরাজ সৈন্য পণ্ডিচেরী শহরে প্রবেশ করিয়া সমগ্র শহরটিকে ধূলিসাৎ করিল। পণ্ডি-চেরী দুর্গেরও কোন চিহ্ন তাহারা রাখিল না। পণ্ডিচেরীর পতনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষে ফরাসী সাম্রাজ্য স্থাপনের শেষ আশাও লোপ পাইল। লালিকে স্বদেশে ফিরিয়া যাইবার আদেশ দেওয়া হইল এবং সেখানে যুদ্ধে পরাজিত হইবার অপরাধে অন্যায়ভাবে তাঁহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হইল।

হায়দরাবাদ হইতে বুসীকে চলিয়া আসিবার আদেশ—মারাত্মক ভুল

লালি ও বুসীর মাদ্রাজ আক্রমণে অসাফল্য

পণ্ডিচেরীর পতন

ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্বের দ্বিতীয় এবং শেষ পর্যায় (The Second and Last phase of the Anglo-French Conflict) : ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্বের দ্বিতীয় এবং শেষ পর্যায় বাংলাদেশে সংঘটিত হইয়াছিল। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে

ইওরোপে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ শুরু হইলে উহার সূত্র ধরিয়া ভারতের ইংরাজ ও ফরাসীগণ পরস্পর যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি শুরু করে। বাংলাদেশে ইংরাজ ও ফরাসীগণ নিজ নিজ বাণিজ্য-কুঠি রক্ষার্থ দুর্গ, প্রাচীর, পরিখা প্রভৃতি নির্মাণ করিতে আরম্ভ করিলে নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলা উভয় পক্ষকেই এই সকল সামরিক প্রস্তুতি বন্ধ করিতে আদেশ দিলেন। বস্তুত বিদেশী বণিক-সম্প্রদায়ের নিরাপত্তার দায়িত্ব দেশের শাসনকর্তা নবাবেরই ছিল। তাহাদের পক্ষে নিজ নিজ ইচ্ছামত সামরিক প্রস্তুতি যেমন ছিল বে-আইনী তেমনি ছিল ঔদ্ধত্যের পরিচায়ক।

সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের সূত্রে বাংলাদেশে ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্ব

যাহা হউক, ফরাসীরা সিরাজ-উদ্-দৌলার আদেশ পালন করিল। কিন্তু উদ্ধত ইংরাজ বণিকসম্প্রদায় নবাবের আদেশ অমান্য করিয়া পূর্ণোদ্যমে সামরিক প্রস্তুতি চালাইতে লাগিল। এই সূত্রে সিরাজ-উদ্-দৌলার সহিত ইংরাজদের প্রকাশ্য দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হইল। সিরাজ ইংরাজ দুর্গ ফোর্ট উইলিয়াম দখল করিলেন। কিন্তু সেই বৎসরই মাদ্রাজ হইতে ক্লাইভ ও ওয়াট্‌সন্ এক নৌবাহিনী ও একদল সৈন্যসহ কলিকাতায় উপস্থিত হইয়া ফোর্ট উইলিয়াম পুনরুদ্ধার করিলেন। নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলা আলিনগরের সন্ধি দ্বারা ইংরাজগণকে নানাপ্রকার বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা দানে স্বীকৃত হইলেন। নবাবের সহিত এইভাবে যুদ্ধ মিটিয়া গেলে ইংরাজগণ ফরাসী অধিকৃত চন্দননগর দখল করিল। অপর দিকে দাক্ষিণাত্যে কর্ণাটের তৃতীয় যুদ্ধেও ফরাসীপক্ষ সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হইল। ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের অবসানে প্যারিসের সন্ধির দ্বারা ফরাসীগণ ভারতে পণ্ডিচেরী, কারিকল, মাহে, জিঞ্জি প্রভৃতি তাহাদের পূর্বেকার সকল স্থানই ফিরিয়া পাইল। কিন্তু ভবিষ্যতে এই সকল স্থান একমাত্র বাণিজ্য-কেন্দ্র হিসাবেই ব্যবহৃত হইবে এই প্রতিশ্রুতি তাহাদিগকে দিতে হইল। ফরাসীরা তাহাদের নিরাপত্তার জন্য কি পরিমাণ সৈন্য রাখিতে পারিবে তাহাও নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইল। ইংরাজগণের অজ্ঞাতে কোন ফরাসী অধিকৃত স্থানে কোন ইওরোপবাসীকে অবস্থান করিতে দেওয়া

নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলা ও ইংরাজদের মধ্যে সংঘর্ষ

প্যারিসের সন্ধি (১৭৬৩) ফরাসী সাম্রাজ্য স্থাপনের আশা চিরতরে বিলুপ্ত

নিষিদ্ধ হইল। এইভাবে ভারতে ফরাসী সাম্রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা বিফলতায় পর্যবসিত হইল।

ফরাসীদের বিফলতার কারণ (Causes of the French Failure): ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য স্থাপনে ফরাসীদের বিফলতা তথা ইংরাজগণের সাফল্যের পশ্চাতে নানাবিধ কারণ ছিল। প্রথমত, বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইংরাজগণ ফরাসীদের অপেক্ষা বহুগুণে বেশি সমৃদ্ধ ও দক্ষ ছিল ; বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তাহাদের সমৃদ্ধি ইংরাজদের আর্থিক সমৃদ্ধি ও সামর্থ্য বৃদ্ধি করিয়াছিল, বলা বাহুল্য। অপর পক্ষে ফরাসীদের বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির অভাবহেতু তাহাদের অর্থাভাবও দেখা দিয়াছিল। যুদ্ধ-বিগ্রহে বা শাসনকার্যে দক্ষতা ও সাফল্যের পশ্চাতে অর্থবল থাকা একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু ফরাসীপক্ষের উপযুক্ত অর্থবল ছিল না। ডুপ্লে ফরাসী স্বার্থ রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে নিজের সঞ্চিত অর্থ ব্যয় করিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই, কিন্তু যুদ্ধের প্রয়োজনের তুলনায় সেই অর্থ অকিঞ্চিৎকর ছিল, বলা বাহুল্য। অর্থাভাবই ফরাসী শক্তিকে পঙ্গু করিয়া দিয়াছিল। দ্বিতীয়ত, ইংরাজ বণিকগণ রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করিতে গিয়াও নিজেদের প্রধান উদ্দেশ্য যে বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি উহা কখনও বিস্মৃত হয় নাই।* তাহাদের রাজনৈতিক প্রাধান্য অর্জনের মূল উদ্দেশ্য ছিল বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি ও সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা। সেই কারণে তাহারা যুদ্ধ-বিগ্রহের কালেও বাণিজ্যকে উপেক্ষা করে নাই। অপর পক্ষে ডুপ্লে মনে করিতেন যে, বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে ফরাসীরা সম্পূর্ণ অকৃতকার্য হইয়াছে। তাহাদের একমাত্র পন্থা হইল সামরিক শক্তির সাহায্যে ভারতবর্ষে ফরাসী সাম্রাজ্য গঠন করা। ইওরোপীয় মহাদেশ হইতে ভারতবর্ষের মতো দূরবর্তী দেশে সামরিক শক্তির সাহায্যে সাম্রাজ্য স্থাপন করা যে কতদূর কঠিন কাজ ছিল সেই কথা

(১) ফরাসীদের অর্থাভাব

(২) ফরাসীদের বাণিজ্যিক আদর্শ ত্যাগ ও সামরিক আদর্শ গ্রহণ

*"The English never forgot that they were primarily a trading body. Dupleix, on the other hand, deliberately came to the conclusion that for French, at any rate, the Indian trade was a failure and that a career of military conquest opened up a more attractive prospect." Roberts, *History of British India*, p. 124.

ফরাসীরা তেমন উপলব্ধি করে নাই। তৃতীয়ত, ভারতবর্ষে ইওরোপীয়দের পক্ষে সাম্রাজ্য গঠন করিবার একমাত্র শর্তই ছিল শক্তিশালী নৌবহর। ব্রিটিশ নৌবাহিনী ফরাসী নৌবাহিনী অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী ছিল। ইহাও ফরাসীদের বিফলতার এবং ইংরাজদের সাফল্যের অন্যতম প্রধান কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তদুপরি দুপ্লে ভারতে সাম্রাজ্য গঠনে নৌশক্তির প্রয়োজনীয়তা তেমন উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। ইওরোপীয় সামরিক পদ্ধতিতে শিক্ষিত স্থলবাহিনীর উপর তাঁহার অধিকতর আস্থা স্থাপন ফরাসীদের বিফলতার সর্বপ্রথম পদক্ষেপ হিসাবে মনে করা ভুল হইবে না।

(৩) নৌবহরের অভাব

চতুর্থত, অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে শিল্পবিপ্লব ঘটিয়াছিল। ফলে, কাঁচামালের চাহিদা এবং তৈয়ারী মালের জন্য বাজারের প্রয়োজনীয়তা বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এই কারণে ইংরাজ বণিকদের মধ্যে যে উদ্দীপনা ও উৎসাহের সৃষ্টি হইয়াছিল ফরাসী বণিকদের মধ্যে অনুরূপ উৎসাহ বা উদ্দীপনার কোন কারণ ছিল না। পঞ্চমত, ইংরাজ ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানি ছিল জনসাধারণের প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ উহার পশ্চাতে ছিল ইংরাজ জাতির স্বার্থ ও সমর্থন। জাতীয় স্বার্থের খাতিরেই ব্রিটিশ সরকার ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির কার্যকলাপের উপর দৃষ্টি রাখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অপর পক্ষে ফরাসী ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানি ছিল রাষ্ট্রীয় সাহায্য-সহায়তার উপর সম্পূর্ণ-ভাবে নির্ভরশীল। স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের অধীনে এবং সহায়তায় গঠিত ফরাসী ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানি ফরাসী জাতীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট ছিল না। তথাপি চতুর্দশ লুই ও তাঁহার বাণিজ্যসচিব কল্‌বেয়ারের পৃষ্ঠ-পোষকতায় গঠিত ফরাসী ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানি ফরাসী জনসাধারণের সমর্থন লাভ করিয়াছিল এবং সেই সময়ে ফরাসী জাতির মধ্যে এক দারুণ বাণিজ্যিক উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু পরবর্তী কালে কল্‌বেয়ারের ন্যায় সুদক্ষ মন্ত্রীর নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণের অভাবে ফরাসী ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানি তথা সকল বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানই দুর্বল ও অকর্মণ্য হইয়া পড়িয়াছিল। অত্যধিক সরকারী সাহায্য-পুষ্ট বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানমাত্রেই রাষ্ট্রীয় সাহায্য-সহায়তার অভাবে স্বভাবতই পতনোন্মুখ হইয়া পড়িল।

(৪) উৎসাহ-উদ্দীপনার অভাব

(৫) জাতীয় স্বার্থ ও সমর্থনহীন বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান

ষষ্ঠত, ফরাসীদের পতনের পশ্চাতে ব্যক্তিগত চরিত্রের অপকর্ষতাও যে না ছিল এমন নহে। লালি তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন, সুদক্ষ, সমরকুশলী নেতা ছিলেন, কিন্তু তাঁহার মেজাজ ছিল রুক্ষ। বিপদের সময়ে নির্ভর করিবার মতো ব্যক্তি তিনি ছিলেন না। পণ্ডিচেরী কাউন্সিলের সহিত তাঁহার বিবাদ-বিসম্বাদ ফরাসী-পক্ষের কার্যদক্ষতা বহুল পরিমাণে হ্রাস করিয়াছিল। ইহা ভিন্ন সণ্ডার্স, আয়ার কূট, ক্লাইভ, ফোর্ড প্রভৃতি সেনা-নায়কদের বিরুদ্ধে যুঝিবার মতো সামরিক দক্ষতা ফরাসীপক্ষের কাহারও ছিল না। সপ্তমত, ফরাসী কর্তৃপক্ষের ভুল, ফরাসী সেনা-নায়কদের সামরিক ভুল প্রভৃতিও ফরাসীদের বিফলতার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ডুপ্লেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের আদেশ দিয়া অর্থাৎ তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া ফরাসী কর্তৃপক্ষ চরম ভুল করিয়াছিলেন। ডুপ্লেই সর্বপ্রথম ভারতে ইওরোপীয় সাম্রাজ্য স্থাপনের সম্ভাবনা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। সাময়িকভাবে বিফল হইলেও তাঁহার কার্যপন্থার যৌক্তিকতা অনস্বীকার্য এবং তদানীন্তন ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে উহা খুবই উপযোগী ছিল। সুতরাং সামরিক বিফলতা সত্ত্বেও তাঁহার সাফল্যলাভের সম্ভাবনা ছিল না, একথা বলা চলে না। কিন্তু ফরাসী কর্তৃপক্ষ ডুপ্লেকে শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করিবার সুযোগ দান না করিয়া ভুল করিয়াছিলেন এবং যখন তাঁহারা নিজেদের ভুল উপলব্ধি করিয়াছিলেন তখন আর উহা সংশোধনের অবকাশ ছিল না। অষ্টমত, দাক্ষিণাত্য হইতে বুসীকে অপসারণের ফলে সেখানে ফরাসী প্রাধান্যনাশের পথ প্রশস্ত হইয়াছিল। বুসী ছিলেন ফরাসী সেনা-নায়কদের শ্রেষ্ঠ। তাঁহার স্থলে অপর কেহ দাক্ষিণাত্যে ফরাসী প্রাধান্য রক্ষার মতো ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন না। সর্বশেষে, সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে ফরাসী সরকার ইওরোপ ও আমেরিকা মহাদেশে ইংরাজগণের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিলেন। এমতাবস্থায় ভারতে প্রয়োজনীয় সাহায্য প্রেরণের সামর্থ্য ফরাসী সরকারের ছিল না। এই সকল কারণে ভারতবর্ষে ফরাসী সাম্রাজ্য স্থাপনের আশা চিরতরে বিলুপ্ত হইয়াছিল।

(৬) ব্যক্তিগত অপকর্ষতা; সামরিক দক্ষতার অভাব

(৭) ডুপ্লেকে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের আদেশের অদূরদর্শিতা

৮) লালি কর্তৃক বুসীকে দাক্ষিণাত্য হইতে অপসারণ

(৯) ফরাসী সরকারের সাহায্য প্রেরণের অক্ষমতা

দ্বিতীয় অধ্যায়
ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণতি
(Transformation of the East India Company into a Political Power)

বাংলাদেশে বৃটিশ প্রভুত্বের সূত্রপাত (Rise of the British Power in Bengal) ঃ মোগল সম্রাট আকবরের আমল হইতে আরম্ভ করিয়া ঔরংজেবের মৃত্যু পর্যন্ত বাংলাদেশ মোগল সম্রাটগণের সম্পূর্ণ আনুগত্যাধীনে ছিল। ১৭০৫ খ্রীষ্টাব্দে ঔরংজেব মুর্শিদ কুলী খাঁকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু দুই বৎসর পর (১৭০৭) ঔরংজেবের মৃত্যু হইলে মুর্শিদ কুলী খাঁ একপ্রকার স্বাধীনভাবেই বাংলাদেশে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। তাঁহার আমলে ইংরাজ বণিকগণ পূর্বেকার 'ফারমান' অনুযায়ী বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত হইল। ১৭১৩ খ্রীষ্টাব্দে মুর্শিদ কুলী খাঁ ইংরাজ বণিকদের নিকট হইতে প্রচলিত হারে শুল্ক আদায় করিবার আদেশ দিলেন। নিজেদের স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে বাংলার ইংরাজ বণিকগণ সার্মান্ ও হ্যামিল্টনকে দিল্লীর সম্রাট ফারুকৃশিয়ারের নিকট প্রেরণ করিল। হ্যামিল্টন ছিলেন একজন সুদক্ষ চিকিৎসক। তাঁহার চিকিৎসায় সম্রাট ফারুকৃশিয়ার এক দুরারোগ্য ব্যাধি হইতে আরোগ্যলাভ করিলে কৃতজ্ঞতার প্রতিদানস্বরূপ ইংরাজ বণিকগণকে এক নূতন ফার্মান দ্বারা বাংলাদেশে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিবার অধিকার দিলেন (১৭১৭)। কিন্তু স্বাধীনচেতা নবাব মুর্শিদ কুলী খাঁ সম্রাট ফারুক্শিয়ারের ফার্মান অগ্রাহ্য করিতেও দ্বিধাবোধ করিলেন না। সুতরাং মুর্শিদ কুলী খাঁর আমলে (১৭০৫-২৭) ইংরাজগণকে নিরুপায় হইয়াই অসুবিধা ভোগ করিয়া চলিতে হইল।

মুর্শিদ কুলী খাঁ (১৭০৫-২৭)

ফারুক্শিয়ারের ফার্মান (১৭১৭)

পরবর্তী নবাব সুজা-উদ্দিন খাঁ (১৭২৭-৩৯) ছিলেন মুর্শিদ কুলীর

জামাতা। তাঁহার আমলে বিহার প্রদেশটি বাংলা সুবার অন্তর্ভুক্ত হয়। তিনি আলিবর্দী খাঁকে বিহারের শাসনকর্তা-পদে নিযুক্ত করেন। ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে সুজা-উদ্দিনের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র সরফরাজ খাঁ বাংলার নবাব হইলেন। কিন্তু তাঁহার দুর্বলতার এবং বিশেষতঃ নাদির শাহের আক্রমণে দিল্লীতে রাজনৈতিক অব্যবস্থার সুযোগ লইয়া বিহারের শাসনকর্তা আলিবর্দী খাঁ তাঁহাকে মসনদচ্যুত করিবার উদ্দেশ্যে সসৈন্যে বাংলা অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। ঘেরিয়ার যুদ্ধে (১৭৪০) সরফরাজ খাঁকে পরাজিত ও নিহত করিয়া আলিবর্দী খাঁ বাংলার নবাবপদে অধিষ্ঠিত হইলেন। মুর্শিদ কুলী খাঁর মৃত্যুর (১৭২৭) পর হইতে ইংরাজদের বাণিজ্য উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি লাভ করিতেছিল। আলিবর্দী খাঁর আমলে কোন কোন বিষয়ে সাময়িকভাবে অসুবিধা ভোগ করিলেও মোটা-মুটিভাবে ইংরাজদের বাণিজ্য ক্রমে বাড়িয়াই চলিয়াছিল।

সুজা-উদ্দিন খাঁ (১৭২৭-৩৯)

সরফরাজ খাঁ (১৭৩৯-৪০)

আলিবর্দী খাঁ (১৭৪০-৫৬)

আলিবর্দী মোগল সম্রাট মোহম্মদ শাহ্‌কে উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ উপঢৌকন দিয়া অন্যায়ভাবে লব্ধ বাংলার শাসনকর্তাপদে তাঁহার অধিকার আইনতঃ স্বীকার করাইয়া লইলেন। বলপূর্বক বাংলার মসনদ দখল করিলেও আলিবর্দী খাঁ দায়িত্বজ্ঞানহীন শাসক ছিলেন না। তিনি ছিলেন যেমন সুশাসক তেমন দূরদর্শী। আলিবর্দীর আমলে বাংলাদেশে মারাঠা বর্গীদের আক্রমণ একটা বাৎসরিক ঘটনা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। দেশরক্ষার আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াও আলিবর্দী যখন মারাঠাদিগকে প্রতিহত করিতে পারিলেন না, তখন তিনি বাৎসরিক বারো লক্ষ টাকা চৌথ এবং উড়িষ্যার একাংশের রাজস্ব আদায়ের অধিকার তাহাদিগকে দিতে স্বীকার করিয়া মারাঠা আক্রমণ হইতে বাংলাদেশের নিরাপত্তা বিধান করিলেন।

মারাঠা বর্গীদের আক্রমণ—তাহাদের সহিত আলিবর্দী খাঁর চুক্তি

দূরদর্শী আলিবর্দী খাঁ ইংরাজ বণিকদের প্রতি কোনপ্রকার বিদ্বেষপূর্ণ ব্যবহার না করিলেও ইংরাজদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ ছিলেন না। তিনি তাহাদিগকে বণিক হিসাবেই বাণিজ্য করিবার অধিকার

দানে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু তিনি ইংরাজগণকে দুর্গ নির্মাণ বা অনুরূপ কোন সামরিক বা রাজনৈতিক শক্তি সঞ্চয়ের সুযোগ দানের পক্ষপাতী না থাকিলেও মারাঠা আক্রমণ হইতে যাহাতে তাহারা আত্মরক্ষা করিতে পারে সেজন্য ইংরাজদিগকে 'মারাঠা পরিখা' (Maratha Ditch) খনন করিবার এবং কাশিমবাজারের কুঠির নিরাপত্তার জন্য প্রাচীর নির্মাণের অনুমতি দিয়াছিলেন। আলিবর্দী ইংরাজদের নিকট হইতে ইচ্ছামত অর্থ আদায় করিতেন বলিয়া যে অভিযোগ কোন কোন ইংরাজ ঐতিহাসিক করিয়া থাকেন তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। বস্তুতঃ বাংলাদেশের নিরাপত্তা বিশেষভাবে মারাঠা আক্রমণের বিরুদ্ধে দেশরক্ষার প্রয়োজনীয় ব্যয় সংকুলানের জন্য তিনি জমিদারগণের নিকট হইতে কোন কোন সময়ে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কলিকাতা, সুতানুটি ও গোবিন্দপুরের জমিদার হিসাবে ইংরাজগণকেও অপরাপর দেশীয় জমিদারগণের ন্যায় এই অর্থ দিতে হইত। ইহাতে অত্যাচারী মনোবৃত্তির বা অন্যায়ভাবে অর্থ আদায়ের অভিযোগ সম্পূর্ণ অযৌক্তিক।*

আলিবর্দী খাঁ ও ইংরাজ বণিকগণ

ইংরাজদের ক্রমবর্ধমান শক্তি সম্পর্কে আলিবর্দী খাঁর সন্দেহ ও ভীতি যে ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু দূরদর্শী নবাব আলিবর্দী বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, নৌবলে বলীয়ান ইংরাজগণকে বাংলাদেশ হইতে বিতাড়িত করা সহজসাধ্য নহে। একবার জনৈক সভাসদ্ তাঁহাকে বাংলাদেশ হইতে ইংরাজ বণিকদের বহিষ্কারের পরামর্শ দিলে আলিবর্দী উত্তর করিয়াছিলেন: "স্থলে আগুন লাগিলে তাহা নিভান কঠিন হয়, আর সমগ্র সমুদ্রে আগুন লাগিলে তাহা নিভাইবার সাধ্য কার?"—অর্থাৎ স্থলপথে আক্রমণকারী মারাঠা বর্গীদের প্রতিহত করা-ই যেখানে দুরূহ ব্যাপার সেখানে নৌবলে বলীয়ান ইংরাজগণ বিরোধিতা শুরু করিলে উহা

আলিবর্দী খাঁর দূরদর্শিতা

*"Ali Vari Khan whilst continuing privileges granted by his predecessors had merely called upon the English as he called upon all the zamindars of Bengal, to contribute to the expenses of the defence of the province." Malleson : *Decisive Battles of India*, p. 42.

দমন করা শুধু কঠিন নহে অসম্ভব হইয়া উঠিবে।* এই কারণেই আলিবর্দী খাঁ ইংরাজগণের প্রতি সতর্কতামূলক বন্ধুত্ব-নীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন।

সিরাজ-উদ্-দৌলাকে নবাব মনোনীত

নবাব আলিবর্দী খাঁর কোন পুত্র-সন্তান ছিল না। সুতরাং মৃত্যুর পূর্বেই তিনি তাঁহার কনিষ্ঠ কন্যার পুত্র সিরাজ-উদ্-দৌলাকে বাংলার পরবর্তী নবাব মনোনীত করিয়া যান। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ৯ই এপ্রিল নবাব আলিবর্দী খাঁর মৃত্যু হইলে তাঁহার দৌহিত্র সিরাজ-উদ্-দৌলা বাংলার মস্‌নদে আরোহণ করিলেন।

সিরাজ-উদ্-দৌলা, ১৭৫৬ Siraj-ud-daulah): ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে সিরাজ-উদ্-দৌলা যখন মস্‌নদে আরোহণ করেন তখন তাঁহার বয়স তেইশ বৎসর মাত্র। মাতামহ আলিবর্দীর অত্যধিক স্নেহে লালিত-পালিত হওয়ায় সিরাজ রাজনৈতিক জটিলতার অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারেন নাই। সুতরাং মাতামহের মৃত্যুর পর যখন শাসনকার্যের সমগ্র দায়িত্ব তাঁহার উপর ন্যস্ত হইল তখন স্বভাবতই প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বনে তিনি সমর্থ হইলেন না।

উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত জটিলতা

আলিবর্দী খাঁর অপর দুইজন জামাতার মধ্যে একজন ছিলেন ঢাকার ও অপরজন ছিলেন পূর্ণিয়ার শাসনকর্তা। তিনি তাঁহার তিন কন্যাকেই তাঁহার তিন ভ্রাতুষ্পুত্রের সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। এই নিকট-আত্মীয়দের অনেকেই পুত্র-সন্তানহীন আলিবর্দী খাঁর মৃত্যুর পর মস্‌নদ লাভের আশা পোষণ করিতেন। সুতরাং আলিবর্দী সিরাজকে পরবর্তী নবাব মনোনীত করিলে তাঁহাদের মধ্যে অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়াছিল। অবশ্য আলিবর্দী খাঁর জীবদ্দশায়-ই ঢাকা ও পূর্ণিয়ার শাসনকর্তা অর্থাৎ আলিবর্দী খাঁর দুই জামাতারই মৃত্যু হইয়াছিল।

আলিবর্দী খাঁর মৃত্যুর পর ঢাকার ভূতপূর্ব শাসনকর্তার বিধবা পত্নী—

---

*"It is now difficult to extinguish fire on land, but should the sea be in flames, who can put them out?" Vide, Smith, *Oxford History of India*, p. 488.

আলিবর্দী খাঁর অন্যতমা কন্যা ঘসেটি বেগম এবং পূর্ণিয়ার ভূতপূর্ব শাসনকর্তার পুত্র—আলিবর্দীর অন্যতম দৌহিত্র—সৌকৎ জঙ্গ সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করিলেন। ঘসেটি বেগমের দেওয়ান রাজবল্লভ এই ষড়যন্ত্রে সাহায্য করিতে লাগিলেন। ঘসেটি বেগম ও সৌকৎ জঙ্গের ষড়যন্ত্রে সিরাজ-উদ্-দৌলা যখন ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন এমন সময়ে ইংরাজ কোম্পানির সহিত সিরাজ-উদ্-দৌলার সংঘর্ষ উপস্থিত হইল।

ঘসেটি বেগম, সৌকৎ জঙ্গ ও রাজবল্লভের ষড়যন্ত্র

আলিবর্দী খাঁর মৃত্যু আসন্নপ্রায় এই সংবাদ পাওয়ামাত্র বাংলার ইংরাজ ও ফরাসী বণিকগণ ইওরোপে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের প্রস্তুতির সূত্র ধরিয়া বাংলাদেশে অবস্থিত তাহাদের ঘাঁটিগুলিতে দুর্গ নির্মাণ শুরু করিল। আলিবর্দী খাঁর মৃত্যুতে নূতন নবাবের মস্‌নদে আরোহণের আনুষঙ্গিক ব্যস্ততার সুযোগ গ্রহণ করা-ই ছিল তাহাদের উদ্দেশ্য। সিরাজ-উদ্-দৌলার প্রতি ইংরাজগণ প্রথম হইতেই উদ্ধত ব্যবহার ও অবহেলা প্রদর্শন করিতে শুরু করিল। আলিবর্দী খাঁর মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বেই সিরাজ-উদ্-দৌলা সংবাদ পাইয়াছিলেন যে, ইংরাজগণ আলিবর্দীর মৃত্যুর পর ঘসেটি বেগমকে সিরাজের বিরুদ্ধে সাহায্যদানে প্রতিশ্রুত হইয়াছে। কাশিমবাজারের ইংরাজ কুঠির ডাক্তার ফোর্থ (Dr. Forth) আলিবর্দী খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে তাঁহাকে এবিষয়ে প্রশ্ন করা হইয়াছিল। ফোর্থ অবশ্য ইংরাজ জাতির নামে শপথ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, ভারতীয় রাজনীতিতে ইংরাজগণ কখনও অংশ গ্রহণ করিবে না। সিরাজ যখন মস্‌নদে আরোহণ করেন তখনও ইংরাজগণ নূতন নবাব হিসাবে তাঁহাকে উপঢৌকন প্রেরণের চিরাচরিত রীতি অমান্য করিয়াছিল। ইহা ভিন্ন ঘসেটি বেগমের পক্ষ অবলম্বন করিয়া রাজা রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাস তাঁহার পরিবার-পরিজন ও প্রভূত ধনরত্নসহ পলাইয়া কলিকাতায় আসিলে ইংরাজগণ তাঁহাকে আশ্রয় দিয়াছিল। সিরাজ-উদ্-দৌলা কৃষ্ণদাসকে গ্রেপ্তারের আদেশ দিলে কৃষ্ণদাস ইংরাজগণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। সিরাজের বিরুদ্ধে ঘসেটি বেগম, রাজা রাজবল্লভ প্রভৃতির ষড়যন্ত্রে ইংরাজগণও যে জড়িত ছিল সেবিষয়ে সন্দেহের অবকাশ ছিল না।

ইংরাজ ও ফরাসী বণিকদের দুর্গ নির্মাণ

সিরাজের প্রতি ইংরাজদের উদ্ধত আচরণ

এমতাবস্থায় ইওরোপে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের অজুহাতে ইংরাজ ও ফরাসী বণিকগণ বাংলাদেশে দুর্গনির্মাণ শুরু করিলে সিরাজ-উদ্-দৌলা তাহাদিগকে নিরস্ত হইতে আদেশ দিলেন। ফরাসী বণিকগণ সিরাজের আদেশ অনুযায়ী দুর্গনির্মাণ বন্ধ করিল, কিন্তু উদ্ধত ইংরাজ বণিকসম্প্রদায় তাঁহার আদেশ উপেক্ষা করিয়া চলিল। তদুপরি তাহারা নবাবের দূতকে অপমান করিতেও দ্বিধা-বোধ করিল না। নবাব কৃষ্ণদাসের সমর্পণ দাবি করিলে তাহাও ইংরাজগণ অমান্য করিল।

সিরাজ-বিরোধী ষড়যন্ত্রে ইংরাজদের অংশ গ্রহণ

এমন সময়ে সিরাজ-উদ্-দৌলা কৌশলে কোনপ্রকার রক্তপাত ছাড়া-ই ঘসেটি বেগমকে নিজ প্রাসাদে লইয়া আসিতে সমর্থ হইলেন। সিরাজ-বিরোধী ষড়যন্ত্রের প্রধান উদ্যোক্তা এইভাবে সিরাজের কবলে পড়িয়াছেন সংবাদ পাওয়ামাত্র ইংরাজগণ ঘসেটি বেগমের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার বিপদ বুঝিতে পারিল এবং পূর্ব আচরণের জন্য সিরাজের নিকট অনুতাপ প্রকাশ করিল। সিরাজ-উদ্-দৌলা ইংরাজগণকে অবিলম্বে দুর্গনির্মাণ বন্ধ করিবার এবং নির্মিত অংশ ভাঙ্গিয়া ফেলিবার আদেশ দিলেন। ইহার অব্যবহিত পরেই সৌকৎ জঙ্গকে দমন করিবার উদ্দেশ্যে তিনি পূর্ণিয়ার দিকে সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন। তিনি যখন রাজমহলে পৌঁছিলেন তখন গবর্ণর ড্রেক (Governor Drake)-প্রদত্ত পত্র তাঁহার হস্তগত হইল। এই পত্রে ড্রেক ইংরাজদের সদিচ্ছার কথা অতি নম্র ভাষায় সিরাজ-উদ্-দৌলাকে জানাইলেও দুর্গনির্মাণ বন্ধ করা হইবে কিনা সেই বিষয়ে কোন উল্লেখ করেন নাই। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলা পূর্ণিয়ার দিকে আর অগ্রসর না হইয়া মুর্শিদাবাদে ফিরিয়া আসিলেন এবং কয়েক দিনের মধ্যেই কলিকাতার ইংরাজগণকে উপযুক্ত শাস্তিদানের উদ্দেশ্যে সসৈন্যে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে তিনি কাশিমবাজারের ইংরাজ বাণিজ্য-কুঠি দখল করিয়া লইয়া কলিকাতার দিকে অগ্রসর হইলেন। কলিকাতাস্থ ইংরাজ ঘাঁটি ফোর্ট উইলিয়াম দখল করিতে তাঁহাকে বেগ পাইতে হইল

ঘসেটি বেগমকে সিরাজের প্রাসাদে অপসারণ—ইংরাজদের ভীতি

গবর্ণর ড্রেক-এর ঔদ্ধত্য

সিরাজ-উদ্-দৌলা কর্তৃক কাশিমবাজার কুঠি ও ফোর্ট উইলিয়াম অধিকার

না। গবর্ণর ড্রেক ও অপরাপর ইংরাজগণ ফোর্ট উইলিয়াম ত্যাগ করিয়া জলপথে ফল্‌তা নামক স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ফোর্ট উইলিয়াম দখল প্রসঙ্গেই 'অন্ধকূপ হত্যা' নামক বীভৎস কাল্পনিক কাহিনীর সৃষ্টি হইয়াছিল। হল্‌ওয়েল (Holwell) নামে জনৈক ইংরাজ কর্মচারীই এই কাহিনীর স্রষ্টা। এক সময়ে অন্ধকূপ হত্যার কাহিনী সিরাজ-উদ্-দৌলার অমানুষিক নৃশংসতার দৃষ্টান্ত হিসাবে ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করিতেন। কিন্তু আধুনিক ঐতিহাসিক গবেষণায় অন্ধকূপ হত্যার নৃশংসতার কাহিনী যে নিছক কাল্পনিক এবং হল্‌ওয়েলের উর্বর মস্তিষ্ক-প্রসূত সেবিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। হল্‌ওয়েলের কাহিনীতে বলা হইয়াছে যে, ১৮′ × ১৪′ ফুট একখানা অতি ক্ষুদ্র কক্ষে সিরাজ-উদ্-দৌলার আদেশে ১৪৬ জন ইংরাজ বন্দীকে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল এবং ইহাদের মধ্যে ১২৩ জন শ্বাসরুদ্ধ হইয়া মারা গিয়াছিল। কিন্তু ঐরূপ ক্ষুদ্র কক্ষে ১৪৬ জন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিকে রাখা সম্ভব ছিল না। কারণ, তাহাদিগকে বইয়ের মতো সাজাইয়া রাখিলেও ঐরূপ ক্ষুদ্র কক্ষে ১৪৬ জনের স্থান সংকুলান সম্ভব নহে। এই কারণে অ্যানি বেসাণ্ট বলিয়াছেন: "Geometry disproving arithmetic gave lie to the story." ইহা ভিন্ন সিরাজ-উদ্-দৌলা কর্তৃক ফোর্ট উইলিয়াম আক্রমণের পূর্বদিনই ড্রেক ও অপরাপর ইংরাজগণ উহা ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল। সুতরাং ১৪৬ জন ইংরাজ কোথা হইতে আসিল? ঐ সময়ে কলিকাতায় হাজার হাজার ইংরাজ ছিল না। সুতরাং ১৪৬ জন পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবে এইরূপ মনে করিবার কোন যুক্তি নাই। কতজন বন্দীকে ঐ কক্ষে রাখা হইয়াছিল সেবিষয়ে এযাবৎ সঠিক কিছু জানা সম্ভব হয় নাই। তবে মোট সংখ্যা ৬০-এর অধিক ছিল না ইহাই মনে করা হইয়া থাকে। সিরাজ-উদ্-দৌলা ফোর্ট উইলিয়াম দখল করিয়া যে-সকল ইংরাজ তখনও সেখানে ছিল তাহাদিগকে রাত্রিতে কোথায় রাখা যাইতে পারে সেই প্রশ্ন করিলে সেখানে উপস্থিত ইংরাজগণই ফোর্ট উইলিয়ামের অভ্যন্তরস্থ অন্ধকূপ (Black Hole) নামক কক্ষটির উল্লেখ করিয়াছিল। কারণ ইংরাজ অপরাধিগণকে ফোর্ট উইলিয়ামের কর্তৃপক্ষ ঐ কক্ষে আবদ্ধ রাখিতেন। নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলা স্বভাবতই ঐ কক্ষে ইংরাজ বন্দীদিগকে

হল্‌ওয়েল-উদ্ভাবিত অন্ধকূপ হত্যার কাল্পনিক কাহিনী

কাহিনীর অযৌক্তিকতা

রাত্রির জন্য আবদ্ধ করিয়া রাখিতে আদেশ দিয়াছিলেন। ফোর্ট উইলিয়াম আক্রমণকালে আঘাতপ্রাপ্ত দুই-একজনও বন্দীদের মধ্যে হয়ত ছিল এবং নবাবের অধস্তন কর্মচারীদের অনবধানতা-বশত তাহাদের কেহ কেহ রাত্রিতে ঐ কক্ষে হয়ত মারা গিয়াছিল। কিন্তু অন্ধকূপ হত্যা সম্পর্কে অধিকাংশ ইংরাজ লেখকগণের রচনায় যে বর্ণনা রহিয়াছে উহাতে সত্য অপেক্ষা কল্পনারই অধিক প্রাধান্য দেখা যায়। স্বয়ং হল্‌ওয়েলও সিরাজ-উদ্-দৌলাকে অন্ধকূপ হত্যার জন্য দায়ী করেন নাই।*

সিরাজ-উদ্-দৌলা সম্পূর্ণ দোষমুক্ত

সিরাজ-উদ্-দৌলা কর্তৃক কলিকাতা দখলের সংবাদ মাদ্রাজে পৌঁছিলে তথাকার ইংরাজ কর্তৃপক্ষ (Madras Council) অ্যাড্‌মিরাল ওয়াট্‌সন্ ও রবার্ট্ ক্লাইভকে একটি নৌবহর ও একদল সৈন্য সহ কলিকাতা পুনরুদ্ধারের জন্য প্রেরণ করিলেন। ওয়াট্‌সন্ ও ক্লাইভ অনায়াসেই কলিকাতা পুনর্দখল করিতে সক্ষম হইলেন (জানুয়ারি, ১৭৫৭) এই সংবাদ পাইয়া সিরাজ ক্লাইভের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। ক্লাইভ কলিকাতার নিকটবর্তী কাশীপুরে নবাবের সেনাবাহিনীকে বাধাদানের জন্য অগ্রসর হইলেন। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা ফেব্রুয়ারির কুয়াশাচ্ছন্ন প্রাতঃকালে সসৈন্যে অগ্রসর হইতে গিয়া রবার্ট্ ক্লাইভ সিরাজের শিবিরের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ক্লাইভের এই পথভ্রান্তি সিরাজ-উদ্-দৌলা তাঁহার দুঃসাহসিকতা বলিয়া ধরিয়া লইলেন এবং তাঁহার সহিত আলিনগরের সন্ধি স্বাক্ষর করিতে স্বীকৃত হইলেন। এই সন্ধির শর্তানুসারে ইংরাজগণ বাংলাদেশে বাণিজ্য করিবার নানা সুযোগ-

ক্লাইভ ও ওয়াট্‌সন্ কর্তৃক কলিকাতা পুনর্দখল (জানুয়ারি ২, ১৭৫৭)

সিরাজ-উদ্-দৌলার ক্লাইভের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-যাত্রা—আলিনগরের সন্ধি (ফেব্রুয়ারি ৯,১৭৫৭)

* "I had in all three interviews with him (the Nawab), the last in Darbar before seven, when he repeated his assurance to me, *on the word of a soldier* that no harm should come to us; and indeed, I believe his orders were only general that for that night we should be secured; and what followed was the result of the revenge and resentment in the breasts of the lower jemadars to whose custody we were delivered for the number of their order killed during the siege." *Mr. Holwell's Narrative*, vide Malleson: *Decisive Battles of India*, pp. 44-45.

সুবিধা লাভ করিল। বিনা শুল্কে আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্য পরিচালনা এবং দুর্গ-নির্মাণের অধিকার তাহাদিগকে দেওয়া হইল।

পরবর্তী ঘটনাবলী অতি দ্রুতগতিতে ঘটিতে লাগিল। সিরাজের সহিত সন্ধিবদ্ধ হইলেও রবার্ট্ ক্লাইভ তাঁহার প্রতি মিত্রতাপূর্ণ আচরণের পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি সিরাজ-উদ্-দৌলাকে শত্রু বলিয়া ধরিয়া লইলেন এবং সুযোগ পাইলে তাঁহার বিরুদ্ধে প্রকাশ্য দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হইবেন ইহাও স্থির করিলেন। কিন্তু বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষে সেই সময়ে ইংরাজদের অপর শত্রু ছিল ফরাসীগণ। ফরাসীদের সহিত সিরাজ-উদ্-দৌলার ঐক্য যাহাতে স্থাপিত হইতে না পারে ক্লাইভ প্রথমে সেই ব্যবস্থাই করিতে চাহিলেন। ইতিমধ্যে ইওরোপে সপ্তবর্ষ-ব্যাপী যুদ্ধ শুরু হইয়া গিয়াছিল। সেই সূত্র ধরিয়া নবাবের বাধাদান সত্ত্বেও ক্লাইভ ফরাসী ঘাঁটি ও বাণিজ্যকেন্দ্র চন্দননগর অধিকার করিয়া লইলেন। এইভাবে ফরাসীদের সাহায্য লইয়া নবাবের ইংরাজ বিতাড়নের আশা বিনষ্ট হইল। ক্লাইভ ইংরাজগণের শত্রুপক্ষ সিরাজ ও ফরাসীদের ঐক্যের পথ বন্ধ করিয়া দিয়া নবাবের বিরোধিতা শুরু করিলেন।

ক্লাইভ কর্তৃক ফরাসী ঘাঁটি চন্দননগর অধিকার

এদিকে মুর্শিদাবাদে নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলার শত্রুপক্ষ তাঁহাকে মসনদচ্যুত করিবার উদ্দেশ্যে এক গোপন ষড়যন্ত্র শুরু করিয়াছে সেই সংবাদ ইংরাজদের নিকট পৌঁছিলে রবার্ট্ ক্লাইভ সেই ষড়যন্ত্রে যোগদান করিলেন। মিরজাফর ছিলেন সেই ষড়যন্ত্রের প্রধান উদ্যোক্তা। তিনি ছিলেন ভূতপূর্ব নবাব আলিবর্দী খাঁর ভগ্নীপতি। আলিবর্দীর মৃত্যুর পর বাংলার মসনদ দখল করিবার আকাঙ্ক্ষা তাঁহারও ছিল। সিরাজ-উদ্-দৌলা নবাব-পদ লাভ করিলে স্বভাবতই তিনি অসন্তুষ্ট ও ঈর্ষান্বিত হইলেন। গোপন ষড়যন্ত্রের দ্বারা সিরাজকে মসনদচ্যুত করিয়া স্বয়ং নবাব হইবার উদ্দেশ্যে তিনি সিরাজের কর্মচারিবর্গের মধ্যে অনেককেই স্বপক্ষে টানিলেন। এমন কি, বিদেশী বণিক-সম্প্রদায় ইংরাজদের সাহায্য গ্রহণেও তিনি কুণ্ঠাবোধ করিলেন না। মুর্শিদাবাদে ইংরাজ প্রতিনিধি (Agent) ওয়াটস্-এর মারফৎ মিরজাফর ক্লাইভের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিলেন। মুর্শিদাবাদের অর্থগৃধ্নু শেঠসম্প্রদায়, রায় দুর্লভ, জগৎ

সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র

মিরজাফর, রায়দুর্লভ, উমিচাঁদ, জগৎ শেঠ, ইয়ার লতিফ ও ক্লাইভের ষড়যন্ত্র

শেঠ, ইয়ার লতিফ খাঁ প্রভৃতি পদস্থ রাজকর্মচারিগণও মিরজাফরের সহিত যোগ দিলেন। ক্লাইভ, মিরজাফর ও শেঠ উমিচাঁদ-এর মধ্যে এক গোপন চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল। বিশ্বাসঘাতকতা, জালিয়াতি, স্বার্থপরতা ও দেশ-দ্রোহিতার এক অতি নীচ ও জঘন্য ষড়যন্ত্রের সাহায্যে বাংলার নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলাকে মসনদচ্যুত করিবার চেষ্টা চলিল।

পলাশীর যুদ্ধ, ১৭৫৭ (Battle of Plassey, 1757) : ষড়যন্ত্রকারিগণ যখন সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত তখন রবার্ট ক্লাইভ অতি সামান্য অজুহাতে সিরাজের বিরুদ্ধে সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন। সিরাজ-উদ্-দৌলাও পশ্চাদ্‌পদ ছিলেন না। ইংরাজগণের প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতার সংবাদ পাইয়া তিনি পূর্বেই পলাশীর প্রান্তরে সৈন্য সমাবেশ করিয়াছিলেন। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জুন ভাগীরথী নদীর তীরে পলাশীর প্রান্তরে ভারত-ইতিহাসের এক যুগান্তকারী যুদ্ধ ঘটিল। এই যুদ্ধে বিশ্বাসঘাতক মিরজাফর এবং রায় দুর্লভের চক্রান্তে নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলার সেনাবাহিনীর এক বিশাল অংশ যুদ্ধ হইতে নিরস্ত রহিল। মোহনলাল ও মিরমদন নামে দুইজন সামরিক নেতার অধীনে অল্পসংখ্যক সৈন্য নবাবের পক্ষে যুদ্ধ করিতে লাগিল। মিরমদন ও মোহনলালের সমরকুশলতার সম্মুখে ইংরাজবাহিনী দীর্ঘকাল টিকিয়া থাকিতে পারিল না। পার্শ্ববর্তী আম্রকাননে ক্লাইভ তাঁহার সেনাবাহিনী অপসারণে বাধ্য হইলেন। কিন্তু আকস্মিক আঘাতে মিরমদনের মৃত্যু ঘটিলে একমাত্র মোহনলাল যুদ্ধ চালাইতে লাগিলেন।

পলাশীর যুদ্ধ (জুন ২৩, ১৭৫৭)

মিরমদনের মৃত্যু সিরাজ-উদ্-দৌলার জয়ের আশা নির্বাপিত করিল। বিশ্বাসঘাতক ষড়যন্ত্রকারিগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত অবস্থায়ও মিরমদনের সাহায্যে সিরাজের জয়লাভের আশা ছিল।* কিন্তু তাঁহার মৃত্যুতে সিরাজ হতাশ হইয়া পড়িলেন। তিনি মিরজাফরকে ডাকাইয়া আনিলেন এবং আলিবর্দী খাঁর আমলে মিরজাফরের আনুগত্যপূর্ণ ব্যবহারের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া

মিরমদনের মৃত্যু : সিরাজের হতাশা

* "As long as Mir Madan lived, the chances of Siraj-ud-daulah, surrounded though he was by traitors was not desparate." Malleson. *Decisive Battles of India,* p. 62.

উপস্থিত বিপদে সাহায্য করিবার জন্য অনুনয় করিলেন। এমন কি তিনি নিজ উষ্ণীষ মিরজাফরের সম্মুখে নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "জাফর খাঁ, এই উষ্ণীষের সম্মান রক্ষা করুন।" এইভাবে তিনি বিশ্বাসঘাতক মিরজাফরের অন্তরে দেশাত্মবোধ ও স্বাধীনতাস্পৃহা জাগাইতে চাহিলেন। মিরজাফর মুখে সিরাজের প্রতি আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি দান করিতে ত্রুটি করিলেন না বটে, কিন্তু সিরাজের হতাশা লক্ষ্য করিয়া অন্তরে অন্তরে তাঁহার সর্বনাশ সাধনের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন।* তিনি সিরাজ-উদ্-দৌলাকে যুদ্ধ-ত্যাগের পরামর্শ দান করিলেন। গোলাম হুসেন-রচিত 'সিয়ার-উল্-মুতাখ্রিণ' গ্রন্থ হইতে জানিতে পারা যায় যে, মিরমদনের মৃত্যুর পরও মোহনলালের একক চেষ্টায় যুদ্ধের গতি সিরাজের অনুকূলেই ছিল। কিন্তু নিজ অদূরদর্শিতা ও মানসিক দুর্বলতা হেতু সিরাজ মিরজাফরের সর্বনাশাত্মক পরামর্শ গ্রহণে স্বীকৃত হইলেন। তিনি মোহনলালকে যুদ্ধত্যাগের আদেশ দিলেন। মোহনলাল প্রথমে এই আদেশ মানিয়া লইতে রাজী হইলেন না।† কিন্তু সিরাজের পুনঃপুনঃ আদেশে শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে যুদ্ধ ত্যাগ করিতে হইল। পলাশীর যুদ্ধে ইংরাজগণ একপ্রকার পরাজিত হইয়াও জয়ী হইল। হতভাগ্য সিরাজ দ্রুত

মিরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতা—সর্বনাশাত্মক পরামর্শ দান

মোহনলালের উপর যুদ্ধত্যাগের আদেশ

ইংরাজপক্ষের জয়

* "He (*Siraj*) reminded him (*Mir Jafar*) of the loyalty he had always displayed towards his grandfather Alivardi Khan, of his relationship to himself; then taking off his turban and casting it on the ground before him, he exclaimed, 'Jafar, that turban thou must defend.' Mir Jafar responded with apparent sincerity............(yet) never was he more firmly resolved than at that moment to betray his master." *Ibid*, pp. 62-63.

†".........It was at this moment that he received order of falling back and of retreating. He (*Mohanlal*) answered that this was not a time to retreat ; that the action was so far advanced, that whatever might happen, would happen now and that should he turn his head to march back to camp, his people would disperse and perhaps abandon them to open flight." *Siyar-ul-Mutakherin*, vide, *An Advanced History of India*, pp. 62-64.

মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইয়া পুনরায় সৈন্য সংগঠনের বৃথা চেষ্টা করিয়া অবশেষে আত্মরক্ষার্থ পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। ভাগলপুরে ফরাসী সেনাধ্যক্ষ মসিয়ঁ ল'র সহিত যোগদান করিয়া পুনরায় ইংরাজগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য। কিন্তু পথিমধ্যে রাজমহলে রাত্রি কাটাইতে গিয়া তিনি ধরা পড়িলেন। সাধারণ বন্দীর ন্যায় তাঁহাকে শৃঙ্খলিত অবস্থায় মুর্শিদাবাদে মিরজাফরের সম্মুখে উপস্থিত করা হইল। সিরাজকে মুর্শিদাবাদে বন্দী অবস্থায় লইয়া আসিলে মুর্শিদাবাদে এক দারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল। সিরাজের সমর্থকেরও অভাব নাই দেখিয়া মিরজাফর তাঁহাকে হত্যা করাই শ্রেয়ঃ মনে করিলেন। তাঁহার আদেশে তাঁহারই পুত্র মীরণ ঐ রাত্রেই কারাগারে আবদ্ধ অবস্থায় মহম্মদী বেগকে দিয়া সিরাজকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করাইল। হতভাগ্য নবাব সিরাজের জন্য প্রকাশ্যে সমবেদনা প্রকাশের দুঃসাহস সেদিন কাহারও ছিল না।

সিরাজের প্রাণনাশ

পলাশীর যুদ্ধের ফলাফল (Results of the Battle of Plassey) : ভারতের রাজনৈতিক ভাগ্য-বিবর্তনের ইতিহাসে পলাশীর যুদ্ধ অন্যতম প্রধান ঘটনা একথা বলা বাহুল্য।

পলাশীর যুদ্ধের ফলাফল সম্পর্কে সাধারণ্যে এই ধারণা স্থিতিলাভ করিয়াছে যে, এই যুদ্ধে জয়লাভ করিবার ফলেই ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শক্তির প্রভুত্ব বাংলাদেশে সুদৃঢ়ভাবে স্থাপিত হইয়াছিল। পক্ষান্তরে কেহ কেহ একথাও মনে করেন যে, পলাশীর যুদ্ধ মুসলমান যুগের চিরাচরিত শক্তি-প্রয়োগ দ্বারা সিংহাসন দখলের রীতির একটি নূতন দৃষ্টান্ত ভিন্ন অপর কিছুই ছিল না। ইংরাজগণ এই যুদ্ধে মিরজাফরকে সাহায্য দানের পুরস্কারস্বরূপ প্রচুর অর্থ লাভ করিয়াছিল এবং তাহাদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন নবাব মিরজাফরকে মসনদে স্থাপনে সমর্থ হইয়াছিল। বস্তুত, মিরজাফরের সহিত ইংরাজপক্ষের যে চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছিল তাহাতে মিরজাফরের সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ হইতে পারে এইরূপ কোন শর্ত ছিল না।

পরস্পর-বিরোধী দুইটি মত

উপরি-উক্ত দুইটি পরস্পর-বিরোধী মতের আলোচনা করিতে গেলে সর্বপ্রথমেই একথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এই দুইয়ের কোনটি সম্পূর্ণভাবে গ্রহণযোগ্য নহে। (১) পলাশীর যুদ্ধের ফলে ইংরাজগণ বাংলাদেশে

সার্বভৌমত্ব লাভ করিয়াছিল বা এই যুদ্ধের ফলে বাংলাদেশ তাহারা জয় করিয়াছিল একথা মনে করিবার কারণ নাই। প্রকৃতপক্ষে ইংরাজগণ কোন কালেই বাংলাদেশ জয় করেন নাই। বাংলায় নবাবী শাসনের স্থলে ব্রিটিশ শাসন ক্রমবিবর্তনের ফলেই স্থাপিত হইয়াছিল। (২) মিরজাফর মস্নদে আরোহণ করিয়া ইংরাজ কোম্পানিকে চব্বিশ পরগণার জমিদারি দিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতেও ইংরাজ কোম্পানি অপরাপর জমিদারদের মতো বাৎসরিক খাজনা দিতে বাধ্য ছিল। (৩) সেই সময় ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির 'কোর্ট-অব-ডিরেক্টরস্' বা ডাইরেক্টর সভা (Court of Directors) ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য গঠনের পক্ষপাতী ছিলেন না। তাহাদের চিঠি-পত্রাদিতে দেশীয় রাজগণের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত না হওয়ার এবং দুর্গ নির্মাণ না করিবার নির্দেশ প্রায়ই থাকিত। পলাশীর যুদ্ধের পরও বহরমপুরে দুর্গ নির্মাণের প্রস্তাব ডাইরেক্টর সভা কর্তৃক অগ্রাহ্য হইয়াছিল। (৪) পরবর্তী কালে মিরকাশিম কর্তৃক তাঁহার রাজধানী মুর্শিদাবাদ হইতে মুঙ্গেরে স্থানান্তরিত করা, জার্মান সামরিক নেতা সাম্রুর অধীনে নিজ সেনাবাহিনীকে ইওরোপীয় সামরিক পদ্ধতিতে শিক্ষাদান প্রভৃতিতে বাংলার নবাবের সার্বভৌমত্বের সুস্পষ্ট পরিচয় ছিল সন্দেহ নাই। (৫) ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দে রবার্ট্ ক্লাইভ উইলিয়ম পিট্ (William Pitt, Earl of Chatham)-এর নিকট বাংলাদেশ জয় করিবার উদ্দেশ্যে সৈন্য সাহায্য চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করা হইয়াছিল। (৬) ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজ কোম্পানি বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করিয়াছিল, কিন্তু প্রকাশ্যভাবে দেওয়ানী গ্রহণ করিতে তখনও তাহারা সাহস পায় নাই। দেওয়ানী লাভের ফলে ইংরাজ কোম্পানি আইনতঃ নবাবের সম-পর্যায়ে স্থাপিত হইয়াছিল। বস্তুত, দেওয়ানী-সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত নবাবের অধীন কর্মচারিবর্গের হস্তেই ছিল।

পলাশীর যুদ্ধে ইংরাজগণ বাংলাদেশে প্রভুত্ব স্থাপনে সমর্থ হয় নাই—এই মতের সপক্ষে যুক্তি

তথাপি পলাশীর যুদ্ধের ফলে ইংরাজদের মর্যাদা ও প্রতিপত্তি যে বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল ইহা অনস্বীকার্য। প্রথমত, ইংরাজগণের সমরকুশলতার পরিচয় হিসাবে পলাশীর যুদ্ধ উল্লেখযোগ্য না হইলেও এই যুদ্ধের ফলে সিরাজ

মসনদচ্যুত হওয়ায় দেশীয় রাজগণ ও জনসাধারণের মনে ইংরাজদের সামরিক শক্তি ও প্রতিপত্তি সম্পর্কে এক উচ্চ ও ভীতিপূর্ণ ধারণার স্মৃষ্টি হইয়াছিল। অপরাপর ইওরোপীয় বণিক সম্প্রদায়ের চক্ষেও ইংরাজগণের মর্যাদা বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। দ্বিতীয়ত, মিরজাফরের সহিত ইংরাজ কোম্পানির যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছিল তাহাতে মিরজাফরের প্রয়োজনমত ইংরাজগণ সামরিক সাহায্য-দানে বাধ্য থাকিবে বলিয়া প্রতিশ্রুত ছিল। মিরজাফর মস্নদে আরোহণ করিবার অব্যবহিত পরেই ঢাকা ও পূর্ণিয়ায় বিদ্রোহ দেখা দিয়াছিল, মারাঠাগণও বাংলাদেশে হানা দিতে শুরু করিয়াছিল। শাহজাদা (পরবর্তী সম্রাট শাহ্ আলম) বাংলাদেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন। এই সকল বিপদে মিরজাফর ইংরাজ কোম্পানির নিকট হইতে সৈন্য সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং ইচ্ছা বা অনিচ্ছাসত্ত্বেই হউক নবাব ইংরাজদের সামরিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়িয়াছিলেন। তৃতীয়ত, ইংরাজগণ কর্তৃক মিরজাফরের স্থলে মিরকাশিমকে স্থাপন, বক্সারের যুদ্ধে মিরকাশিমকে পরাজিত করা, অযোধ্যার নবাব ও শাহ্ আলমকে তাহাদের প্রভাবাধীনে স্থাপন প্রভৃতি দ্বারা তাহাদের মর্যাদা, শক্তি ও প্রতিপত্তি-বৃদ্ধির সূত্রপাত পলাশীর যুদ্ধের পর হইতেই হইয়াছিল। পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরাজগণ বাংলার শাসনব্যবস্থায় প্রত্যক্ষভাবে না হইলেও পরোক্ষভাবে এক অতি শক্তিশালী প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হইয়াছিল। এই দিক হইতে বিচার করিলে পলাশীর যুদ্ধে ইংরাজগণ যে রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হইয়াছিল একথা অস্বীকার করা চলে না।

অপর মতের পক্ষে যুক্তি

যাহা হউক, উপসংহারে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভের পর আপাতদৃষ্টিতে ইংরাজগণের রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব স্থাপিত না হইলেও ইংরাজ কোম্পানি যে বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান হইতে রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হইয়াছিল সেই বিষয়ে সন্দেহ নাই। পূর্বেকার অধীনতা হইতে তাহারা এখন বহুল পরিমাণে মুক্ত, অধিকতর শক্তিশালী এবং নবাবের অপরিহার্য সহায়ক শক্তিতে পরিণত হইয়াছিল।

উপসংহার

সিরাজ-উ র চরিত্র ও কৃতিত্ব-বিচার (Critical Estimate the Character & Career of Siraj-ud-daulah) : মাতামহ আলিবর্দী খাঁর ভাগ্যোন্নতির কালে সিরাজের জন্ম হইয়াছিল বলিয়া আলিবর্দী তাঁহাকে প্রাণাধিক ভালবাসিতেন। স্নেহান্ধ আলিবর্দী দৌহিত্রের বিলাস-ব্যসন এবং যৌবনের উচ্ছৃঙ্খলতায় বাধা দান করেন নাই। নিজের উত্তরাধিকারী হিসাবে মনোনীত করিয়াও দৌহিত্রকে শাসন ও সংসার সম্পর্কে উপযুক্ত শিক্ষাদানের ব্যবস্থাও তিনি করিলেন না। স্বভাবতই সিরাজ বিলাস-ব্যসনপ্রিয়, উচ্ছৃঙ্খল অনভিজ্ঞ যুবক হিসাবে বাংলার মসনদে আরোহণ করিয়াছিলেন।

সিরাজের চরিত্রের উপর আলিবর্দীর স্নেহান্ধতার প্রভাব

সিরাজের চরিত্র-বিচারে ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ পক্ষপাতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন একথা অনস্বীকার্য। সিরাজের অভিজ্ঞতার অভাব, সমসাময়িক সুলতান বাদশাহ্দের উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপনের রীতি, মুসলমান শাসনে পুনঃপুনঃ সিংহাসন লইয়া বিবাদ-বিসম্বাদের ইতিহাস স্মরণে রাখিলেই সিরাজের চরিত্র ও পরিস্থিতি সম্পর্কে নিরপেক্ষ বিচার করা সম্ভব হইবে। ব্যক্তিগত চরিত্রের অপকর্ষতা ভিন্ন অনভিজ্ঞতাবশত সিরাজ কতকগুলি ত্রুটির জন্য দায়ী ছিলেন। তিনি মিরজাফরের দুরভিসন্ধির কথা জানিতে পারিয়াও মিরজাফরকে কারারুদ্ধ না করিয়া ভুল করিয়াছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রেও তিনি বিশ্বাসঘাতক মিরজাফরের পরামর্শ গ্রহণে সম্মত হইয়াছিলেন। মোহনলালকে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করিবার সুযোগ দান না করিয়া তিনি জয়ের মুহূর্তে পরাজয় ডাকিয়া আনিয়াছিলেন। এই সকল ঘটনা হইতে তাঁহার দৃঢ়তা ও দূরদর্শিতার অভাব ছিল একথা প্রমাণিত হয়, বলা বাহুল্য। অবশ্য তিনি যে কোন কোন ক্ষেত্রে রাজনৈতিক জ্ঞানের পরিচয় না দিয়াছিলেন এমন নহে। ঘসেটি বেগমকে আকস্মিকভাবে নিজ প্রাসাদে আবদ্ধ করিয়া তিনি রাজনৈতিক কূটকৌশলের পরিচয় দান করিয়াছিলেন একথা স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু দেশাত্মবোধ ও সততার দিক হইতে বিচার করিলে তিনি যে তাঁহার প্রতিপক্ষ মিরজাফর ও ক্লাইভ অপেক্ষা বহু উর্ধ্বে ছিলেন সে

তাঁহার চরিত্র

ক্লাইভ ও মিরজাফর-এর সহিত তুলনা

বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। ব্যক্তিগত স্বার্থ অপেক্ষা বাংলার মস্‌নদের মর্যাদা ও স্বাধীনতা রক্ষা করাই ছিল তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য। তিনি মিরজাফরকে বাংলার নবাবের উষ্ণীষের মর্যাদা রক্ষার জন্যই কাতর অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। অন্ততঃ তিনি ক্লাইভ বা মিরজাফরের ন্যায় বিশ্বাস-ঘাতকদের সহিত তুলনায় ছিলেন না একথা বলিতে হইবে। ব্যক্তিগত স্বার্থের খাতিরে নিজেদের দেশ বিদেশীয়দের নিকট বিক্রয়ের নীচতা তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন।*

মিরজাফর, ১৭৫৭-৬০ (Mirjafar) : বিশ্বাসঘাতকতা, জালিয়াতি, শঠতা—সর্বপ্রকার নীচ স্বার্থপরতার মিলিত আঘাতে পলাশীর যুদ্ধে সিরাজের পতন ঘটিলে (১৭৫৭) বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কারস্বরূপ মিরজাফর বাংলার মস্‌নদে আরোহণ করিলেন। ইংরাজদের সাহায্য লাভের আগ্রহে মিরজাফর ক্ষমতার অতিরিক্ত পুরস্কার ইংরাজ কোম্পানিকে দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন।

মিরজাফরের আর্থিক অনটন

কিন্তু মস্‌নদে আরোহণ করিয়া তিনি মুর্শিদাবাদের রাজ-কোষে সেই পরিমাণ অর্থ পাইলেন না। কিন্তু ইংরাজদের দাবি উপেক্ষা করা চলিল না। আসবাবপত্র, মূল্যবান ধাতু-নির্মিত বাসনপত্র বিক্রয় করিয়া দেড় কোটি টাকারও অধিক অর্থ ইংরাজ কোম্পানিকে দিতে হইল। ক্লাইভ স্বয়ং প্রভূত পরিমাণ অর্থ পুরস্কার হিসাবে গ্রহণ করিলেন। তিনি বাৎসরিক ত্রিশ হাজার পাউণ্ডের একটি জায়গীরও গ্রহণ করিলেন। মিরজাফরের আর্থিক অনটনের কথা জানিয়াও ক্লাইভ তাঁহার নিকট হইতে এইভাবে অর্থ অদায় করিয়া মিরজাফরের শাসনব্যবস্থাকে পঙ্গু করিয়া দিয়াছিলেন। শাসনকার্যে মিরজাফরের অসাফল্যের পশ্চাতে ক্লাইভের অর্থগৃধ্নুতা যে বহুলাংশে দায়ী ছিল সেবিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহা ভিন্ন উমিচাঁদ নামক জনৈক শিখ বণিকের মাধ্যমে মিরজাফরের সহিত ষড়যন্ত্র সম্পন্ন হইয়াছিল।

ক্লাইভের অর্থগৃধ্নুতা ও জালিয়াতি

* "Whatever may have been his faults, Siraj-ud-daulah had neither betrayed his master nor sold his country. Nay more, no unbiassed Englishman sitting in judgment on the events which passed in the interval between the 9th February and the 23rd June, can deny that the name of Siraj-ud-daulah stands higher in the scale of honour than does the name of Clive. He was the only one of the principal actors in that tragic drama who did not attempt to deceive!" Malleson, *Decisive Battles of India* p. 71.

এই কারণে উমিচাঁদ পারিশ্রমিক হিসাবে প্রভূত পরিমাণ কমিশন (Commission) বা বাট্টা দাবি করিয়াছিলেন। ক্লাইভ উমিচাঁদের দাবি স্বীকার করিয়া একটি জাল দলিল প্রস্তুত করিয়াছিলেন, কিন্তু মিরজাফরের সহিত যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছিল তাহাতে উমিচাঁদের প্রাপ্য অর্থের কোন উল্লেখ তিনি করেন নাই। শুধু তাহাই নহে, এই জাল দলিলে ওয়াট্সন্ স্বাক্ষর করিতে অস্বীকৃত হইলে ক্লাইভ উহাতে ওয়াট্সনের স্বাক্ষর জাল করাইয়াছিলেন। কার্যসিদ্ধি হইলে পর ক্লাইভ উমিচাঁদের দলিল খাঁটি নহে একথা বলিয়া তাহার প্রাপ্য এড়াইতে দ্বিধাবোধ করিলেন না। ষড়যন্ত্রকারী উমিচাঁদের তাহাতে উচিত শাস্তি হইলেও ক্লাইভ যে ইহা দ্বারা নিজ চরিত্র মসীলিপ্ত করিয়াছিলেন তাহাতে দ্বিমতের অবকাশ নাই।

মস্‌নদে আরোহণ করিয়াই আর্থিক অনটনের মধ্যেও ইংরাজদের দাবি মিটাইবার ফলে মিরজাফরের শাসনব্যবস্থায় যে দুর্বলতা দেখা দিল উহার পরিপ্রেক্ষিতেই তাঁহার পরবর্তী কার্যকলাপ বিচার্য। তিনি উচ্চপদস্থ হিন্দু কর্মচারী ও জমিদারগণের নিকট হইতে অন্যায় অত্যাচারের দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিতে চাহিলেন। মেদিনীপুরের শাসনকর্তা রামরাম সিং, বিহারের শাসনকর্তা রামনারায়ণ এবং দেওয়ান রায় দুর্লভের সঞ্চিত অর্থ তিনি আত্মসাৎ করিতে চাহিলেন। রামরাম সিংকে তিনি পূর্বেকার কয়েক বৎসরের অনাদায়িকৃত খাজনার কৈফিয়ৎ দিবার জন্য মুর্শিদাবাদে ডাকিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু এমন সময়ে ঢাকা ও পূর্ণিয়ায় বিদ্রোহ দেখা দিলে এবিষয়ে তিনি আর অগ্রসর হইবার অবকাশ পাইলেন না। ক্লাইভের সাহায্যে ঢাকার বিদ্রোহ দমন করা হইল বটে, কিন্তু পূর্ণিয়ার বিদ্রোহ দমনে অগ্রসর হইবার কালে মিরজাফরের সেনাবাহিনী তাহাদের বহুদিন যাবৎ প্রাপ্য বেতন না পাইলে পূর্ণিয়ার দিকে অগ্রসর হইতে রাজী হইল না। মিরজাফর বাধ্য হইয়াই ইংরাজদের সাহায্য গ্রহণ করিলেন। ফলে, সেই সাহায্যের জন্য ইংরাজ কোম্পানির নিকট তাঁহাকে আরও ঋণগ্রস্ত হইতে হইল। পূর্ণিয়ার বিদ্রোহ দমন করিয়া ক্লাইভ সৈন্য সাহায্যদানের জন্য কোম্পানির প্রাপ্য মিরজাফরের নিকট হইতে আদায় করিয়া লইলেন। মিরজাফরের আর্থিক দুরবস্থা চরমে পৌঁছিল।

মিরজাফরের অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা

ঢাকা ও পূর্ণিয়ায় বিদ্রোহ

ইতিমধ্যে মিরজাফরের ন্যায় হীনচেতা ব্যক্তির পক্ষেও ইংরাজদের ঔদ্ধত্য সহ্য করা সম্ভব হইল না। সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে, ঢাকা ও পূর্ণিয়ার বিদ্রোহ দমনে এবং সম্রাট শাহ্ আলমের আক্রমণ প্রতিহত করিবার উদ্দেশ্যে পুনঃপুনঃ ইংরাজ সাহায্য গ্রহণের ফলে তাহাদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি এতদূর বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, মিরজাফর নবাব হইয়াও নবাবের প্রকৃত ক্ষমতা ভোগ করিতে পারিলেন না। অতিষ্ঠ হইয়া তিনি ওলন্দাজগণের সাহায্যে বাংলা দেশ হইতে ইংরাজগণকে দূর করিবার জন্য গোপনে পত্রালাপ শুরু করিলেন। চুঁচুড়ার ওলন্দাজ কর্তৃপক্ষ বাটাভিয়া হইতে এই উদ্দেশ্যে সাতখানি যুদ্ধ-জাহাজ আনাইলেন। ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে হুগলী নদীর মোহনায় ওলন্দাজ নৌবহর উপস্থিত হইল। ক্লাইভ পূর্ব হইতেই মিজাফরের সহিত ওলন্দাজগণের গোপন যোগাযোগের সংবাদ পাইয়াছিলেন। তিনি ওলন্দাজ নৌবহর আক্রমণ করিয়া বিদারা (Bidderah)-এর যুদ্ধে উহা সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করিলেন। এই যুদ্ধে ওলন্দাজগণের পরাজয়ে ওলন্দাজ বণিক ও মিরজাফর উভয়েরই ভবিষ্যৎ আশা বিনাশপ্রাপ্ত হইল।

ওলন্দাজগণের সহিত মিজাফরের গোপন যোগাযোগ: বিদারার যুদ্ধ (১৭৫৯)

এমন সময় মোগল সম্রাট দ্বিতীয় আলমগীরের পুত্র শাহ্জাদা আলি গৌহর, ওয়াজীর গাজী উদ্দিনের হস্তে পিতা একপ্রকার বন্দিদশা প্রাপ্ত হইয়াছেন দেখিয়া দিল্লী হইতে পলায়ন করেন। তিনি এলাহাবাদের শাসনকর্তা মোহম্মদ কুলী খাঁ ও অযোধ্যার শাসনকর্তা সুজা-উদ্-দৌলার সাহায্য লইয়া বাংলাদেশ জয় করিতে চাহিলেন। এইভাবে তিনি এক স্বাধীন রাজ্যস্থাপনের চেষ্টা করিতেছিলেন। তিনি কুলী খাঁর সাহায্য লইয়া ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে বিহার আক্রমণ করিলেন। কিন্তু কুলী খাঁর অনুপস্থিতির সুযোগ লইয়া সুজা-উদ্-দৌলা এলাহাবাদ আক্রমণ করিলে কুলী খাঁ বাধ্য হইয়া নিজ রাজ্যে ফিরিয়া গেলেন। আলি গৌহর এককভাবে বিহার জয় করা অসম্ভব দেখিয়া এ যাত্রা ফিরিয়া গেলেন। কয়েক মাসের মধ্যেই ওয়াজীর গাজী উদ্দিন সম্রাট আলমগীরকে হত্যা করিলে আলি গৌহর শাহ্ আলম (২য়) উপাধি ধারণ করিয়া সুজা-উদ্-দৌলাকে নিজ ওয়াজীর নিযুক্ত করিলেন। ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ও সুজ-উদ্-দৌলা পুনরায় পাটনা আক্রমণ

শাহজাদা আলি গৌহর কর্তৃক বিহার ও বাংলা আক্রমণ

করিতে গিয়া পরাজিত হইলেন। ইহার পর তিনি মুর্শিদাবাদ আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইয়া ইংরাজদের হস্তে পরাজিত হইলেন।

মিরজাফরের অকর্মণ্যতা ইংরাজদের নিকট সুস্পষ্ট হইয়া উঠিলে হল্ওয়েলের প্রস্তাবক্রমে তাঁহাকে মস্নদচ্যুত করা স্থির হইল।* ওলন্দাজদের সহিত ষড়যন্ত্র এবং আলি গৌহরের সহিত যোগাযোগ স্থাপনের অভিযোগে মিরজাফর মস্নদচ্যুত হইলেন। ইতিমধ্যে (১৭৬০) রবার্ট্ ক্লাইভ ইংলণ্ডে ফিরিয়া গিয়াছিলেন। কলিকাতায় ইংরাজ গবর্ণর ছিলেন ভ্যান্সিটার্ট (Vansittart)। ইংরাজদের সাহায্যে মিরজাফরের জামাতা মিরকাশিম বাংলার নবাবপদে অধিষ্ঠিত হইলেন। সম্রাট শাহ্ আলম বাৎসরিক ২৬ লক্ষ টাকা রাজস্বের পরিবর্তে মিরকাশিমকে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব বলিয়া আইনত স্বীকার করিয়া লইলেন ; ইংরাজ কোম্পানিও মিরকাশিমের নিকট হইতে উপযুক্ত পুরস্কার গ্রহণে ত্রুটি করিল না। নবাব-পরিবর্তন তাহাদের নিকট একটি লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত হইয়াছিল। ঐ যুগের বাংলাদেশের ইতিহাসে ইংরাজদের এরূপ স্বার্থলোলুপতা ইংরাজ জাতির চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করিয়াছে সন্দেহ নাই। 'মানবতা ও ভগবানের' নামে শপথ করিয়া তাহারা মিরজাফরকে বাংলার মস্নদে স্থাপন করিয়াছিল এবং তাঁহাকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিল। কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি বিস্মৃত হইয়া স্বার্থসিদ্ধি করিতে তাহারা কুণ্ঠাবোধ করে নাই। এই সময়কার ইংরাজদের নীচ স্বার্থপরতার কথা উল্লেখ করিতে গিয়া সার আল্ফ্রেড্ লায়েল (Sir Alfred Lyall) বলিয়াছেন যে, উহা ইংরাজ নামে কলঙ্ক লেপন করিয়াছিল।†

মিরজাফরের মস্নদচ্যুতি

ইংরাজ জাতীয় চরিত্রে কলঙ্ক লেপন

* "It cannot be doubted that Holwell and it turn Vansittart honestly believed that the Nawab, whom the English had enthroned after Plassey, was a person in whom no confidence could be placed. They held that he was not only incompetent but also treacherous........" Ferminger.

†"The only period of Anglo-Indian history which throws grave and unpardonable discredit on the English name." *Sir Alfred Lyall*, vide Roberts, p. 149.

মিরকাশিম, ১৭৬০-৬৪ (Mir Kasim): মিরজাফরের পদচ্যুতির ফলে মিরকাশিম বাংলার মস্‌নদে আরোহণ করিলেন। তিনি ছিলেন দূরদর্শী রাজনীতিক। তিনি ছিলেন দেশাত্মবোধসম্পন্ন সুদক্ষ শাসক। মুর্শিদাবাদে কোম্পানির প্রতিনিধি (Resident) থাকাকালে ওয়ারেন হেস্টিংস্ মিরকাশিমকে অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন, ধৈর্যশীল, মিতব্যয়ী, সুদক্ষ ব্যক্তি হিসাবে বর্ণনা করিয়াছিলেন।* মিরজাফরের পতনের প্রধান কারণই যে ছিল তাঁহার আর্থিক দুর্বলতা, একথা মিরকাশিম উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। সুতরাং নবাবপদে অধিষ্ঠিত হইয়াই তিনি আর্থিক স্বচ্ছলতা আনিবার চেষ্টা শুরু করিলেন। প্রথমেই তিনি ইংরাজ কোম্পানির প্রাপ্য চুকাইয়া দিলেন। তিনি বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম—এই তিনটি জেলা কোম্পানিকে তাহাদের যাবতীয় প্রাপ্যের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হিসাবে দিয়া দিলেন। এইভাবে ইংরাজ কোম্পানির সহিত দেনা-পাওনা চুকাইয়া দিয়া তিনি শাসনকার্যে মনোযোগ দিলেন। শাসন-ব্যাপারে যথাসম্ভব ব্যয়সংকোচ করিয়া এবং কয়েকটি নূতন 'আব্ ওয়াব' বা অতিরিক্ত কর স্থাপন করিয়া তিনি অর্থাভাব দূর করিতে সমর্থ হইলেন। ইহার পর উদ্ধত এবং বিদ্রোহী জমিদারগণকে তিনি তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিতে বাধ্য করিলেন এবং ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই তিনি পূর্বেকার যাবতীয় আর্থিক ও শাসন-সংক্রান্ত অব্যবস্থা হইতে শাসনব্যবস্থাকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করিলেন।

মিরকাশিমের দূরদর্শিতা

মিরকাশিম ছিলেন মিরজাফর হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধাতুতে গড়া। তিনি ছিলেন সুদক্ষ শাসক, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাজনীতিক ও একনিষ্ঠ দেশপ্রেমিক। ইংরাজদের সহিত বিবাদ-বিসম্বাদে লিপ্ত হইবার ইচ্ছা তাঁহার না থাকিলেও তাহাদের হস্তে ক্রীড়নক হইয়া থাকিবার মত হীন মনোবৃত্তিও তাঁহার ছিল না। মিরকাশিম প্রকৃত

মিরকাশিমের উদ্দেশ্য ও কার্যাদি

* "Mir Qasim was a genuine patriot, an able ruler, who quickly retrenched expenditure and suppressed disorders." Thompson & Garrat : *Rise and Fulfilment of British Rule in India,* p. 100.

".........a man of understanding of an uncommon talent for business, and great application and perseverance joined to a thriftiness." Hastings about Mir Qasim. *Idem.*

নবাব হিসাবেই শাসনকার্য চালাইতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। (১) তিনি বিহারের শাসনকর্তা রামনারায়ণের ইংরাজপ্রীতি এবং অসাধুতা লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করিলেন। (২) ইংরাজ কোম্পানির প্রভাব হইতে দূরে থাকিবার উদ্দেশ্যে তিনি মুর্শিদাবাদ হইতে মুঙ্গেরে রাজধানী স্থানান্তরিত করিলেন এবং নব প্রতিষ্ঠিত রাজধানীকে দুর্গের দ্বারা পরিবেষ্টিত করিলেন। (৩) মিরকাশিম বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, নিজ অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহাকে হয়ত শেষ পর্যন্ত ইংরাজ কোম্পানির সহিত প্রকাশ্য দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। সুতরাং তিনি সামরু (Walter Reinhard, nicknamed Sumroo) ও মার্কার নামে দুইজন ইওরোপীয় সৈনিকের সাহায্যে নিজ সেনাবাহিনাকে ইওরোপীয় সামরিক পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিলেন। (৪) তিনি কামান ও বন্দুক নির্মাণের ব্যবস্থাও করিলেন।

এই সকল ব্যবস্থা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, মিরকাশিম মিরজাফরের ন্যায় বিনা যুদ্ধে মসনদচ্যুত হইতে প্রস্তুত ছিলেন না। তথাপি একথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মিরকাশিম অযথা ইংরাজ কোম্পানির সহিত বিবাদ-বিসম্বাদের পক্ষপাতীও ছিলেন না। কলিকাতার ইংরাজ গবর্ণর ভ্যান্সিটার্টের সহিত আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য-শুল্ক সম্পর্কে মতানৈক্যের কালে মিরকাশিমের ব্যবহার হইতেও একথা প্রমাণিত হইবে। ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানি বিনা শুল্কে কেবলমাত্র আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্য করিবার অধিকার লাভ করিয়াছিল। উচ্চপদস্থ ইংরাজ কর্মচারিগণ 'দস্তক' নামক ছাড়পত্রে মাল আমদানি বা রপ্তানি বাণিজ্য-সংক্রান্ত একথা লিখিয়া দিলেই বিনাশুল্কে কোম্পানির পণ্যদ্রব্যাদি একস্থান হইতে অপর স্থানে লইয়া যাওয়া চলিত। এই সকল 'দস্তক' স্বাক্ষরের ভার নবাব ইংরাজ কোম্পানির পদস্থ কর্মচারীদের উপরই বিশ্বাস করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু ইংরাজ কর্মচারিগণ এই দস্তকের অপব্যবহার করিয়া বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ করিতে লাগিল। দস্তক দেখাইয়া তাহারা একস্থান হইতে অপর স্থানে বিনা-শুল্কে মাল চালান দিত, কিন্তু এই মাল তাহারা দেশীয় বাজারেই বিক্রয় করিত। পক্ষান্তরে দেশীয় বণিকগণ

ইংরাজ বণিকগণ কর্তৃক বাণিজ্য-অধিকারের অপব্যবহার

সরকারী শুল্ক-ঘাঁটিগুলিতে শুল্ক দিতে বাধ্য হইত। শুল্ক ফাঁকি দিয়া ইংরাজ বণিকগণ স্বভাবতই অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্যে দ্রব্যাদি বিক্রয় করিতে পারিত, অথচ শুল্ক দিবার ফলে দেশীয় বণিকগণ ঐ দামে মাল বিক্রয় করিলে লোকসানগ্রস্ত হইত। ফলে, দেশীয় বণিকদের অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হইয়া পড়িল। কোন স্বাধীন রাজা বা নবাবের পক্ষে বিদেশী বণিকগণকে এই ধরণের বিনা-শুল্কে একচেটিয়া ব্যবসায় করিবার অবৈধ অধিকার স্বীকার করিয়া লওয়া সম্ভব ছিল না। মিরকাশিম এবিষয়ে ইংরাজ গবর্ণরের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন, প্রতিবাদ জানাইলেন।* কিন্তু তাহাতেও এই অন্যায় আচরণের কোন প্রতিকার করা সম্ভব হইল না দেখিয়া মিরকাশিম দেশীয় প্রজাদের উপর হইতেও শুল্ক উঠাইয়া দিলেন। ইহাতে রাজকোষের যথেষ্ট ক্ষতি হইল বটে, কিন্তু দেশীয় প্রজার স্বার্থরক্ষার জন্য মিরকাশিম এই ক্ষতি স্বীকার করিতেও কুণ্ঠিত হইলেন না। এই ব্যবস্থাও ইংরাজদের মনঃপূত হইল না। পাটনার ইংরাজ বাণিজ্য-কুঠির এজেন্ট এলিস্ (Ellis) ইহাতে বিরক্ত হইয়া নবাবের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণই একমাত্র পন্থা বলিয়া স্থির করিলেন। ঐতিহাসিক র‍্যামসে মূর স্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন যে, এলিস নিজের এবং নিজের বন্ধুবান্ধবদের অবৈধ অর্থোপার্জনের পথে বাধা দূর করিবার উদ্দেশ্যে মিরকাশিমের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণে বদ্ধপরিকর ছিলেন। এমিয়ট্, হে, স্মিথ ও ভেরেলষ্ট্ (Amyatt, Hay, Smith, Verelst) প্রভৃতি ইংরাজ কর্মকর্তাগণও এলিসের প্রস্তাব যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করিলেন। এলিস্ সাহেব পাটনা শহর আক্রমণ করিলে মিরকাশিম ইংরাজদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে বাধ্য হইলেন। তিনি পাটনা শহর হইতে ইংরাজগণকে বিতাড়িত করিয়া উহা পুনর্দখল করিলেন। কিন্তু ইহার পর তিনি ক্রমান্বয়ে কাটোয়া, ঘেরিয়া ও উদয়নালার যুদ্ধে ইংরাজদের হস্তে পরাজিত হইয়া অযোধ্যার নবাব সুজা-উদ্-দৌলার আশ্রয়-

দেশীয় বণিকগণের সর্বনাশসাধন

মিরকাশিমের উদারতা

মিরকাশিমের সহিত ইংরাজগণের সংঘর্ষ

কাটোয়া, ঘেরিয়া ও উদয়নালার যুদ্ধে মিরকাশিমের পরাজয়

* "No Indian ruler would or could, have granted foreigners leave to wreck his whole system by a monopoly of duty-free trade along every road and river of his kingdom". *Ibid,* p. 101.

প্রার্থী হইলেন। অযোধ্যায় অবস্থানকালে তিনি সুজা-উদ্-দৌলা ও সম্রাট শাহ্ আলমের সাহায্য লইয়া পুনরায় ইংরাজদের সহিত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে বক্সার নামক স্থানে মিরকাশিম, সুজা-উদ্-দৌলা ও সম্রাট শাহ্ আলমের সম্মিলিত বাহিনী ইংরাজসৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইল। এই যুদ্ধেও ইংরাজগণ জয়ী হইলে বাংলার শেষ স্বাধীন ও দেশাত্ম-বোধসম্পন্ন নবাবের পতন ঘটিল। এই যুদ্ধে জয়লাভ করিবার ফলে ইংরাজদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বহুগুণে বৃদ্ধি পাইল। এই যুদ্ধে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হওয়ার ফলে অযোধ্যার নবাব সুজা-উদ্-দৌলা ও সম্রাট শাহ্ আলম ইংরাজ কোম্পানির উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল হইয়া পড়িলেন। মিরকাশিম আত্ম-রক্ষার্থ পলায়ন করিলেন। পলাতক অবস্থাতেই তাঁহার মৃত্যু ঘটিয়াছিল। ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের গোড়া-পত্তনের দিক দিয়া বিচার করিলে বক্সারের যুদ্ধ পলাশীর যুদ্ধ অপেক্ষাও যে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ছিল তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। এই যুদ্ধের পর ব্রিটিশ শক্তিকে আর নিজ অস্তিত্ব বজায় রাখিবার জন্য যুদ্ধ করিতে হয় নাই। পরবর্তী যুদ্ধবিগ্রহাদি ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-বিস্তারের যুদ্ধ।

বক্সারের যুদ্ধে (১৭৬৪) মিরকাশিমের পরাজয়

বক্সারের যুদ্ধের ফলাফল

মিরকাশিমের পরাজয়ের পর ইংরাজগণ পুনরায় মিরজাফরকে বাংলার মস্নদে বসাইল। কিন্তু এক বৎসরের মধ্যে (১৭৬৫) তাঁহার মৃত্যু ঘটিলে তাঁহার পুত্র নাজিম-উদ্-দৌলা ইংরাজ কোম্পানিকে প্রভূত পরিমাণ অর্থ পুরস্কার হিসাবে দান করিয়া কোম্পানির অনুমোদনক্রমে বাংলার মস্নদে আরোহণ করিলেন। বস্তুত, মির-কাশিমের পর হইতে বাংলার নবাব কেবলমাত্র নামে-মাত্রই নবাব রহিলেন। প্রকৃত ক্ষমতা ক্রমেই ইংরাজদের হস্তে চলিয়া গেল। সুতরাং মিরকাশিমের পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে মুর্শিদাবাদের নবাবীর পতন ঘটিয়াছিল বলা যাইতে পারে।

মিরজাফর ও তাঁহার মৃত্যুর পর নাজিম-উদ্-দৌলার মস্নদে আরোহণ

মুর্শিদাবাদের নবাবীর পতনের কারণ (Causes of the downfall of the Nawabs of Murshidabad): মুর্শিদাবাদের নবাবীর পতনের

পশ্চাতে নিম্নলিখিত কারণগুলি পরিলক্ষিত হয়। প্রথমত, আলিবর্দীর মৃত্যুর পর একমাত্র মিরকাশিম ভিন্ন অপর কোন ক্ষমতাবান নবাব বাংলার মস্‌নদে আরোহণ করেন নাই। অনভিজ্ঞ এবং অল্পবয়স্ক নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলা ছিলেন উচ্ছৃঙ্খল ও স্বেচ্ছাচারী। তাঁহার দেশাত্মবোধ ও স্বাধীনতাস্পৃহা ছিল বটে, কিন্তু অনভিজ্ঞতাহেতু অদূরদর্শিতার ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞার অভাব তাঁহার সর্বনাশ ডাকিয়া আনিয়াছিল। তাঁহার মস্‌নদলাভের সময় হইতেই মুর্শিদাবাদের নবাবীর পতনের সূচনা হইয়াছিল। দ্বিতীয়ত, আলিবর্দীর কন্যা ঘসেটি বেগম ও অন্যতম দৌহিত্র সৌকৎজঙ্গের ঈর্ষা ও স্বার্থপরতা, এবং মুর্শিদাবাদের আমীর-ওমরাহ্‌দের স্বার্থপরতা ইংরাজ কোম্পানির অর্থ ও ক্ষমতালিপ্সা সিরাজের তথা মুর্শিদাবাদের নবাবীর পতনের পথ প্রশস্ত করিয়াছিল। তৃতীয়ত, মিরজাফরের বিশ্বাস-ঘাতকতা এবং নবাব-পদলাভের জন্য ইংরাজগণের নিকট আত্মবিক্রয় মুর্শিদাবাদের নবাবীর মর্যাদা নাশ করিয়া উহাকে পতনের পথে আগাইয়া দিয়াছিল। সর্বশেষে বক্‌সারের যুদ্ধে শেষ স্বাধীনচেতা নবাব মিরকাশিমের পরাজয় মুর্শিদাবাদ তথা বাংলার নবাবীর পতন ঘটাইয়া-ছিল। পরবর্তী নবাবগণ নামেমাত্রই নবাব ছিলেন।

আলিবর্দী খাঁর পর ক্ষমতাবান নবাবের অভাব

সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র

মিরজাফরের বিশ্বাস-ঘাতকতা ও ইংরাজদের নিকট আত্মবিক্রয়;

বক্‌সারের যুদ্ধে মিরকাশিমের পরাজয়

রবার্ট ক্লাইভ (Robert Clive): রবার্ট ক্লাইভ ১৭২৫ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম-গ্রহণ করেন এবং মাত্র উনিশ বৎসর বয়সে ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির সামান্য কেরাণী (writer) হিসাবে মাদ্রাজে আসেন। অল্পকালের মধ্যেই তিনি মসি ছাড়িয়া অসি ধরিলেন এবং ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই ক্যাপ্টেন পদে উন্নীত হইলেন। কর্ণাটের দ্বিতীয় যুদ্ধে ইংরাজপক্ষ যখন ফরাসীদের হস্তে প্রায় পরাভূত তখন রবার্ট ক্লাইভ এক নূতন যুদ্ধ-পরিকল্পনা প্রস্তুত করিলেন। তিনি দেখিলেন যে, ত্রিচিনপলি রক্ষা করিতে না পারিলে দাক্ষিণাত্যে ইংরাজদের অস্তিত্ব রক্ষা করা অসম্ভব। এজন্য তিনি শত্রুপক্ষকে ত্রিচিনপলিতে আক্রমণ না করিয়া আর্কটে আক্রমণ করিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করিলেন। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ তাঁহার পরিকল্পনার যৌক্তিকতা লক্ষ্য করিয়া উহা গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। ক্লাইভের পরিকল্পনা মত

ক্লাইভের প্রথম জীবন

অগ্রসর হইয়া-ই কর্ণাটের রাজধানী আর্কট দখল করা সম্ভব হইল। ক্লাইভ স্বয়ং এই যুদ্ধে সৈন্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। আর্কট অধিকার করিবার পর দীর্ঘ ৫৩ দিন ধরিয়া তিনি শত্রু-পক্ষের আক্রমণ হইতে উহা রক্ষা করিয়া চলিলেন। ইহার পর অর্‌ণি ও কাবেরী-পাক এর যুদ্ধে তিনি ফরাসীদের পরাজিত করিয়া দাক্ষিণাত্যে ইংরাজ স্বার্থ রক্ষা করিলেন। ফলে, কর্ণাটের সিংহাসনে ইংরাজদের সমর্থিত প্রার্থী মোহম্মদ আলিকে স্থাপন করিয়া ইংরাজগণ কর্ণাটে তাহাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইল। কাবেরী-পাক-এর যুদ্ধে পরাজয়ের পর দক্ষিণ-ভারতে ফরাসী প্রাধান্য স্থাপনের আশা প্রায় বিলুপ্ত হইল। এইভাবে ক্লাইভের সামরিক দূরদৃষ্টি, সাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের ফলে ইংরাজ স্বার্থ যেমন রক্ষা পাইল তেমনি তাঁহার খ্যাতি এবং মর্যাদাও বহুগুণে বৃদ্ধি হইল।

আর্কট অধিকার

দাক্ষিণাত্যে ইংরাজ স্বার্থ রক্ষা

১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে সিরাজ-উদ্-দৌলা কর্তৃক কলিকাতা অধিকারের সংবাদ মাদ্রাজে পৌঁছিলে ক্লাইভ ও ওয়াট্সনকে কলিকাতা পুনরুদ্ধারের জন্য প্রেরণ করা হইল। ক্লাইভ ও ওয়াট্সন সহজেই কলিকাতা পুনর্দখল করিতে সমর্থ হইলেন। ইহা ভিন্ন হুগলীও তাঁহারা অধিকার করিয়া লইলেন। ইহাতে সিরাজ-উদ্-দৌলা সসৈন্যে কলিকাতা অভিমুখে অগ্রসর হইলে ক্লাইভ তাঁহাকে একপ্রকার বিনা-যুদ্ধেই পরাজিত করিয়া আলিনগরের সন্ধি স্বাক্ষর করিতে বাধ্য করিলেন। এই সন্ধিদ্বারা ইংরাজগণ বিনা-শুল্কে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য পরিচালনার এবং অপরাপর নানাপ্রকার বাণিজ্য-সুযোগ লাভ করিল। ইহা ভিন্ন তাহাদের দুর্গ নির্মাণের অধিকারও স্বীকৃত হইল।

কলিকাতা পুনরধিকার

অতঃপর রবার্ট ক্লাইভ ইংরাজ কোম্পানির শক্তি ও স্বার্থবৃদ্ধির জন্য চক্রান্ত, জালিয়াতি, দুর্নীতি, অন্যায়, অবিচার প্রভৃতি সর্বপ্রকারের নীচ ও জঘন্য পন্থা অবলম্বন করিলেন। নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলার প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন কর্মচারীদের সহিত তিনি এক গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইলেন। এইসকল নবাব-বিরোধী বিশ্বাসঘাতক কর্মচারিবর্গের নেতা ছিলেন মিরজাফর। ক্লাইভ প্রভূত পরিমাণ অর্থ ও নানাপ্রকার বাণিজ্যের সুযোগ-সুবিধা লাভের প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে নবাব সিরাজ-উদ্-

ক্লাইভের ষড়যন্ত্র

দৌলাকে মসনদচ্যুত করিয়া সেই স্থলে মিরজাফরকে স্থাপনের জন্য গোপনে চুক্তিবদ্ধ হইলেন। এই সময়ে ক্লাইভের চরিত্রের নীচ স্বার্থপরতার এক জঘন্যতম প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়।

মিরজাফরের সহিত গোপন ষড়যন্ত্রের অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে ক্লাইভ সিরাজ-উদ্-দৌলার সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। পলাশীর প্রান্তরে মিরজাফর, রায়দুর্লভ প্রভৃতির বিশ্বাসঘাতকতায় সিরাজের পরাজয় ঘটিলে মিরজাফর বাংলার মসনদে অধিষ্ঠিত হইলেন। ক্লাইভ তথা ইংরাজ কোম্পানি বাংলার নবাবীর পশ্চাতে থাকিয়া প্রচ্ছন্নভাবে প্রকৃত শক্তি হস্তগত করিলেন। মিরজাফর কোম্পানিকে চব্বিশ পরগণার জমিদারি দান করিলে কোম্পানি-কর্তৃক ক্লাইভ এই জমিদারির গবর্ণর নিযুক্ত হইলেন। ক্লাইভ স্বয়ং প্রভূত পরিমাণ অর্থ এবং একটি জায়গীর ব্যক্তিগত পারিতোষিক হিসাবে গ্রহণ করিলেন। মিরজাফরের চরম অর্থাভাবের কথা জানিয়াও রবার্ট ক্লাইভ মিরজাফর কর্তৃক প্রতিশ্রুত কোম্পানির প্রাপ্য আদায় করিতে বিলম্ব করিলেন না। ঢাকা ও পূর্ণিয়ার বিদ্রোহ দমন এবং শাহ্‌জাদা আলি গৌহর কর্তৃক বিহার আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য মিরজাফরকে সৈন্য সাহায্য দানের জন্য প্রাপ্য অর্থও তিনি অবিলম্বে আদায় করিলেন। ইতিমধ্যে ইংরাজ প্রাধান্যে বিরক্ত হইয়া মিরজাফর ওলন্দাজগণের সাহায্যে ইংরাজদের বিতাড়িত করিতে চাহিলে ক্লাইভ ওলন্দাজগণকে বিদারা (Bidderah)-এর যুদ্ধে পরাজিত করিয়া মিরজাফরের ইংরাজ প্রাধান্য হইতে মুক্তির আশা যেমন বিনষ্ট করিলেন তেমনি ওলন্দাজগণের শক্তিও হ্রাস করিলেন। এইভাবে যুদ্ধ, ষড়যন্ত্র, জালিয়াতি প্রভৃতির সাহায্যে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন করিয়া ও প্রভূত পরিমাণ অর্থ লইয়া ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ক্লাইভ ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

পলাশীর যুদ্ধ : মিরজাফরকে মসনদে স্থাপন

বিদারার যুদ্ধ : ক্লাইভের স্বদেশে প্রত্যাবর্তন (১৭৫৯-৬০)

ক্লাইভ চলিয়া যাইবার পর বাংলার রাজনীতিক্ষেত্রে এক ঘোর অরাজকতা দেখা দিল। অবশ্য মিরজাফরকে কপর্দকহীন করিয়া ক্লাইভ নিজেই এই অরাজকতার সূত্রপাত করিয়া গিয়াছিলেন। মিরজাফরের দুর্বলতার অজুহাতে ইংরাজ কোম্পানি তাঁহার স্থলে মিরকাশিমকে মসনদে স্থাপন করিল। নূতন নবাব মসনদে স্থাপন করা ইংরাজ কোম্পানির অর্থাগমের এক

অভিনব পন্থা হইয়া দাঁড়াইল। কোম্পানির আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থায়ও দুর্নীতি প্রবলভাবে দেখা দিল। কোম্পানির স্বার্থে জলাঞ্জলি দিয়া ইংরাজ কর্মচারিগণ ব্যক্তিগত স্বার্থবৃদ্ধিতে ব্যস্ত হইয়া উঠিল। ইতিমধ্যে তাহারা নবাব মিরকাশিমকে পরাজিত করিয়া বাংলার সর্বশেষ প্রকৃত স্বাধীন নবাবের পতন ঘটাইয়াছিল।

১৭৬০-৬৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলায় অব্যবস্থা ও দুর্নীতি

কোম্পানির আভ্যন্তরীণ দুর্নীতি দিন দিনই বৃদ্ধি পাইয়া চলিতেছে দেখিয়া ইংলণ্ডে ডাইরেক্টর বোর্ডের সভ্যদের মধ্যে দারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল। এই অব্যবস্থা ও দুর্নীতির অবসানকল্পে তাঁহারা রবার্ট ক্লাইভকে দ্বিতীয়বার বাংলার গবর্ণর হিসাবে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। ভারতবর্ষে কোম্পানির স্বার্থবৃদ্ধি বা কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্য ইতিমধ্যে রবার্ট ক্লাইভ 'লর্ড' উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। ভারতীয় শাসনে দুর্নীতির প্রবর্তক এবং জালিয়াতিতে সিদ্ধ-হস্ত রবার্ট ক্লাইভ এখন হইতে হইলেন লর্ড ক্লাইভ। ক্লাইভের প্রথমবার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ও পুনর্নিয়োগের অন্তর্বর্তী কালে কলিকাতার গবর্ণর ছিলেন ভ্যান্সিটার্ট (Vansittart)।

ক্লাইভের দ্বিতীয় শাসনকাল, ১৭৬৪-৬৭ (Clive's Second Governorship) : ক্লাইভের প্রথমবারের শাসন-অভিজ্ঞতা তাঁহাকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে সাহায্য করিয়াছিল। প্রথমত, তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, কোম্পানির অধিকৃত রাজ্যের সীমা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে এবং সেইহেতু কেবলমাত্র একটি বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানের হস্তে উহার শাসনভার ন্যস্ত থাকা সমীচীন হইবে না। এ বিষয়ে তিনি পিট্ (Pitt the Elder)-এর নিকট একটি পত্রও লিখিয়াছিলেন। দ্বিতীয়ত, তিনি একথা মনে করিতেন যে, দেশীয় নৃপতিদের উপর নির্ভর করিয়া ইংরাজগণের পক্ষে ভারতবর্ষে বাণিজ্য পরিচালনা সম্ভব হইবে না। এজন্য দেশীয় নৃপতিগণকেই ইংরাজ কোম্পানির উপর নির্ভরশীল করিয়া তুলিতে হইবে। তৃতীয়ত, কোম্পানির পক্ষে প্রকাশ্যভাবে কোন রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগ করা বাঞ্ছনীয় হইবে না, কারণ ইহাতে অপরাপর ইওরোপীয় বণিক সম্প্রদায় এবং দেশীয় নৃপতিগণের মনে সন্দেহ ও ঈর্ষার উদ্রেক অবশ্যই হইবে। চতুর্থত, ইংরাজ কোম্পানির

ক্লাইভের অভিজ্ঞতা-প্রসূত নীতি

অধিকার বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা এই তিনটি প্রদেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা সমীচীন হইবে এবং এই তিনটি প্রদেশের নিরাপত্তা বিধানের যথাসম্ভব চেষ্টা কোম্পানিকে করিতে হইবে। ক্লাইভ যখন দ্বিতীয়বার গবর্ণর নিযুক্ত হইয়া আসিলেন তখন উপরি-উক্ত নীতিগুলি কার্যকরী করিবার পক্ষে বাংলাদেশের পরিস্থিতিও অত্যন্ত উপযোগী ছিল।

প্রথমেই তিনি বক্‌সারের যুদ্ধে পরাজিত সুজা-উদ্-দৌলা এবং শাহ্ আলমের সহিত বোঝাপড়া করিতে অগ্রসর হইলেন। তিনি তখন ইচ্ছা করিলে অযোধ্যার নবাবকে পদচ্যুত করিতে পারিতেন, কিন্তু দেশীয় নৃপতিগণকে ইংরাজ কোম্পানির উপর নির্ভরশীল রাখা এবং প্রকাশ্যে ক্ষমতা গ্রহণ না করা এবং সর্বোপরি বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার সীমার বাহিরে রাজ্য বিস্তার না করিবার নীতি অনুসরণ করিয়া তিনি সুজা-উদ্-দৌলার নিকট হইতে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ এবং কারা ও এলাহাবাদ—এই দুইটি স্থান আদায় করিলেন।

সুজা-উদ্-দৌলার সহিত সন্ধি

দিল্লীর সম্রাট শাহ্ আলম তখন নামেমাত্রই সম্রাট। তাঁহার পিতার নৃশংস হত্যার পর তিনি দিল্লীতে প্রবেশ করিয়া সিংহাসন অধিকার করিতে তখনও সমর্থ হন নাই। লর্ড ক্লাইভ শাহ্ আলমকে কারা ও এলাহাবাদ প্রদেশ দুইটি দান করিলেন এবং উহার বিনিময়ে এবং বাৎসরিক ২৬ লক্ষ টাকা কর দানের শর্তে সম্রাটের নিকট হইতে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করিলেন (১২, আগস্ট, ১৭৬৫)। দেওয়ানী লাভের সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানী আইনত বাংলা সুবার রাজস্ব আদায়ের অধিকার প্রাপ্ত হইল। বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষে ইংরাজ প্রভুত্ব স্থাপনের ইতিহাসে ইংরাজগণের দেওয়ানী লাভ এক যুগান্তকারী ঘটনা। ইহার ফলে একদিকে যেমন কোম্পানির অধিকার আইনত স্বীকৃত হইল, অপরদিকে বাংলার নবাব কোম্পানির উপর অর্থের জন্য সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হইয়া পড়িলেন। দেওয়ানের কর্তব্য ছিল আদায়িকৃত অর্থ হইতে শাসনকার্য পরিচালনার ব্যয় সংকুলান করিয়া উদ্বৃত্ত অর্থ দিল্লীতে প্রেরণ করা। সম্রাটের সহিত বাৎসরিক ২৬ লক্ষ টাকার বিনিময়ে শাসনকার্যের ব্যয় সংকুলানের পর উদ্বৃত্ত রাজস্ব ইংরাজ কোম্পানি নিজ হস্তে রাখিবার অধিকার লাভ করিল। ফলে, কোম্পানি বাংলার নবাবের সম-মর্যাদাভুক্ত হইল।

শাহ্ আলমের সহিত চুক্তি—দেওয়ানী লাভ (১৭৬৫)

নবাব নাজিম-উদ্-দৌলাকে ক্লাইভ বাৎসরিক ৫৩ লক্ষ টাকা ভাতাদানের বিনিময়ে বাংলা সুবার রাজস্বের উপর তাঁহার দাবি ত্যাগে বাধ্য করিলেন। নাজিম-উদ্-দৌলার মসনদ লাভের কালে মোহম্মদ রেজা খাঁকে নায়েব-সুবা (Deputy Governor) নিযুক্ত করা হইয়াছিল। ক্লাইভ দুর্লভ রায় ও জগৎ শেঠকে রেজা খাঁর সহকারী হিসাবে নিযুক্ত করিয়া একই হস্তে ক্ষমতা ন্যস্ত করিবার সম্ভাব্য বিপদ এড়াইবার ব্যবস্থা করিলেন। ইহা ভিন্ন রাজা সীতাব রায়কে পাটনার বাণিজ্য-কুঠির প্রধান (Chief)-এর সহিত যুগ্মভাবে রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব দেওয়া হইল। শাসনকার্যে নাজিম-উদ্-দৌলা বহাল থাকিলেও উপরি-উক্ত ব্যবস্থার দ্বারা মিরকাশিমের ন্যায় নবাবের উত্থানের পথ তিনি চিরতরে রুদ্ধ করিলেন।

নবাব নাজিম-উদ্-দৌলার সহিত বন্দোবস্ত

কোম্পানির কর্মচারিবর্গের দেশীয় রাজস্ব-ব্যবস্থা সম্পর্কে অনভিজ্ঞতা, তাহাদের মধ্যে ব্যাপক দুর্নীতি এবং সর্বোপরি বিদেশী বণিক সম্প্রদায়ের ঈর্ষা প্রভৃতির কথা বিবেচনা করিয়া ক্লাইভ প্রকাশ্যভাবে দেওয়ানীর কাজ ইংরাজ হস্তে ন্যস্ত করিলেন না। দেওয়ানী-সংক্রান্ত কাজের প্রধান দুইটি দায়িত্ব ছিল রাজস্ব আদায় ও দেওয়ানী মামলার বিচার। নবাবের উপর এই সকল দায়িত্ব পূর্ববৎই রহিয়া গেল। অথচ রাজস্বের মালিক এখন হইতে হইল ইংরাজ কোম্পানি। ফলে, নবাব পাইলেন ক্ষমতাহীন দায়িত্ব আর কোম্পানি লাভ করিল দায়িত্ব-হীন ক্ষমতা। এই অদ্ভুত ব্যবস্থাই ইতিহাসে 'দ্বৈত শাসন' (Double Govt.) নামে পরিচিত। এইরূপ অকার্যকর ব্যবস্থার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে বাংলাদেশের প্রজাবর্গের দুর্দশার সীমা ছিল না।

'দ্বৈত শাসন' (Double Govt.)

ক্লাইভের সীমান্ত-নীতি অর্থাৎ অযোধ্যার নবাব ও সম্রাট শাহ্ আলমের সহিত ব্যবস্থার ত্রুটি প্রদর্শন করিতে গিয়া ম্যালেসন (Malleson) বলিয়াছেন যে, ক্লাইভের নীতি অবাস্তব যুক্তিবাদী রাজনীতিকের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হইলেও মোগল সাম্রাজ্যের পতনের ফলে ভারতবর্ষে যে অব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল সেই পরিস্থিতির পক্ষে মোটেই উপযোগী ছিল না। ঐরূপ পরিস্থিতিতে আত্মরক্ষার একমাত্র উপায়ই ছিল অগ্রসর-নীতি (Forward Policy) অনুসরণ করা। কিন্তু

সীমান্ত-নীতির সমালোচনা

ক্লাইভের আমলে
ব্রিটিশ অধিকার
মারাঠা
ব্রিটিশ
০ ২০০ ৪০০
মাইল
শিখ
রাজপুতানা
সিন্ধু
দিল্লী
অযোধ্যা
বঙ্গদেশ
মুর্শিদাবাদ
পলাশী
কলিকাতা
মারাঠা
বোম্বাই
(ব্রিটিশ)
নিজাম-রাজ্য
আর্কট
পণ্ডিচেরী (ফরাসী)
ত্রিচিনপলি
ত্রিবাঙ্কুর
সিংহল (ওলন্দাজ)
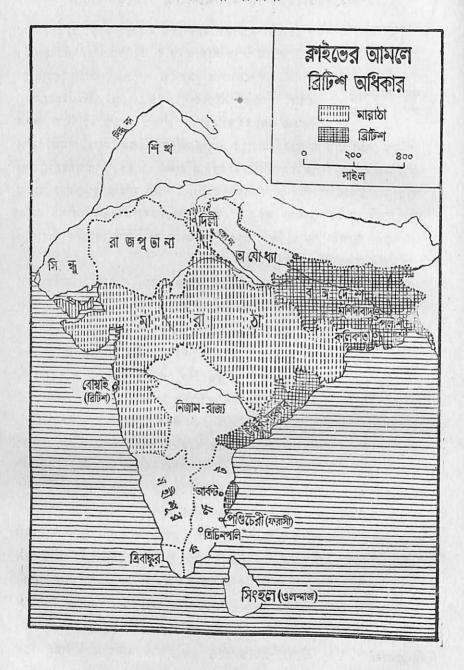
কোম্পানির কর্মচারিবর্গের মধ্যে ব্যাপক দুর্নীতি, স্বার্থপরতা, কোম্পানির মোট সামরিক শক্তি প্রভৃতির কথা স্মরণ করিলে অগ্রসর-নীতির অযৌক্তিকতা সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ থাকিবে না।

দেওয়ানী গ্রহণ করিয়াও প্রকাশ্যভাবে দেওয়ানী-সংক্রান্ত দায়িত্ব গ্রহণ না করিবার যুক্তি হিসাবে ক্লাইভ স্বয়ং বলিয়াছেন যে, সেই সময়ে ইংরাজ কোম্পানি দেওয়ানীর কার্যাদি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিল। ইহা ভিন্ন তাহাদের দুর্নীতি এইরূপ দায়িত্ব গ্রহণের পরিপন্থী ছিল। সর্বোপরি, প্রকাশ্যভাবে দেওয়ানী-সংক্রান্ত দায়িত্ব গ্রহণ করিলে অপরাপর ইওরোপীয় বণিকসম্প্রদায়ের মনে ঈর্ষার উদ্রেক হইত এবং ফলে হয়ত ইংরাজদিগকে সব কিছুই হারাইতে হইত।

দেওয়ানী-সংক্রান্ত চুক্তি

ক্লাইভের সংস্কার (Clive's Reforms): ক্লাইভ দ্বিতীয়বার যখন ভারতবর্ষে আসেন তখন তাঁহার উপর ডাইরেক্টর সভার বিশেষ নির্দেশ ছিল কোম্পানির আভ্যন্তরীণ দুর্নীতির অবসান ঘটান। ক্লাইভ কলিকাতায় পৌঁছিয়া কোম্পানির কর্মচারিবর্গের দুর্নীতি ও স্বার্থপরতার যে পরিচয় পাইলেন তাহা সাধারণ ক্ষমতা প্রয়োগের দ্বারা দূর করা সম্পূর্ণ অসম্ভব ছিল। ডাইরেক্টর সভার নির্দেশ অনুযায়ী তিনি নিজ সাহায্যের জন্য 'সিলেক্ট্ কমিটি' (Select Committee) নামে একটি সমিতি গঠন করিলেন এবং সামরিক ও বেসামরিক যাবতীয় ক্ষমতা নিজ হস্তে গ্রহণ করিলেন। (১) প্রথমেই তিনি কোম্পানির কর্মচারিবর্গের পক্ষে কোনপ্রকারের পারিতোষিক গ্রহণ করা নিষিদ্ধ করিলেন। (২) অতঃপর তিনি ইংরাজ কর্মচারীদের পক্ষে আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ করা নিষিদ্ধ করিয়া দিলেন। কিন্তু কোম্পানির কর্মচারীদের বেতন অতি অল্প ছিল বলিয়া তিনি লবণ, সুপারি ও তামাকের একচেটিয়া কারবারের জন্য একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করিলেন এবং কোম্পানির কর্মচারিবর্গকে তাহাদের পর্যায় অনুযায়ী এই প্রতিষ্ঠানের লভ্যাংশের অংশ দিবার ব্যবস্থাও করিলেন। (৩) কোম্পানির কলিকাতাস্থ কাউন্সিলের সভ্যগণ প্রায়ই বিভিন্ন স্থানের বাণিজ্য-কুঠির প্রধান (Chief)-এর কাজ গ্রহণ করিয়া কলিকাতার বাহিরে চলিয়া যাইতেন, কারণ তাহাতে

সিলেক্ট্ কমিটি গঠন

বেসামরিক সংস্কার: (১), (২), (৩)

নানা অবৈধ উপায়ে অর্থ সঞ্চয়ের সুযোগ পাওয়া যাইত। ফলে কলিকাতা কাউন্সিলের কাজের ব্যাঘাত ঘটিত। ক্লাইভ এই ব্যবস্থার পরিবর্তন করিয়া কোম্পানির সিভিল সার্ভিসের (Civil Service) সংস্কারসাধন করেন। তিনি দুর্নীতিপরায়ণ কাউন্সিলারদের পাঁচজনকে অবসর গ্রহণে বাধ্য করেন এবং অপর তিনজনকে কাউন্সিলের সদস্যপদ হইতে অপসারিত করেন। এইভাবে তিনি উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের দুর্নীতিপরায়ণতার অবসান ঘটান। (৪) ক্লাইভ কোম্পানির সেনাবাহিনীকে নূতনভাবে গঠন করিয়া জেনারেল কার্নাক্ (Carnac)-কে কোম্পানির সেনাবাহিনীর সেনাধ্যক্ষ-পদে নিযুক্ত করেন। (৫) সেনাবাহিনীর ব্যয়-সংকোচের উদ্দেশ্যে তিনি সৈনিকদের 'ডবল ভাতা' (double allowance) বন্ধ করিয়া দিলেন। মিরজাফর ইংরাজ সৈন্যের সহায়তার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে গিয়া তাহাদের ভাতা বা বাট্টা দ্বিগুণ করিয়া দিয়াছিলেন। এই ভাতা যুদ্ধের সময়ে দিবার কথা ছিল, কিন্তু পলাশীর যুদ্ধের সময় হইতে শান্তির কালেও দ্বিগুণ ভাতা দেওয়া হইতেছিল। ক্লাইভ নিয়ম করিলেন যে, কেবলমাত্র যুদ্ধে নিযুক্ত থাকাকালীন সৈনিকগণ ভাতা পাইবে। ভাতা বন্ধ করিবার ফলে সেনাবাহিনীর মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দিলে ক্লাইভ দৃঢ়হস্তে তাহা দমন করিতে ত্রুটি করিলেন না।

সামরিক সংস্কার : (৪), (৫)

ক্লাইভের চরিত্র ও কৃতিত্ব (Clive's Character and Estimate) : অতি সাধারণ কেরাণী হিসাবে ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির চাকরি গ্রহণ করিয়া একমাত্র নিজ ক্ষমতা, উৎসাহ, উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং সর্বোপরি উদ্ভাবনী-শক্তির সাহায্যে ক্লাইভ বাংলার গবর্ণরপদে অধিষ্ঠিত হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। একনিষ্ঠভাবে কর্তব্য পালন করিয়া তিনি ডাইরেক্টর সভার বিশ্বাস অর্জন করিয়াছিলেন। এই কারণেই তাঁহাকে দ্বিতীয়বার গবর্ণরপদে নিযুক্ত করিয়া পাঠান হইয়াছিল। কিন্তু এই সকল গুণের অধিকারী হইলেও ক্লাইভের অর্থলোলুপতার অন্ত ছিল না। নিজ তথা ইংরাজ জাতির স্বার্থসিদ্ধির জন্য তিনি জালিয়াতি ও প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করিতে কুণ্ঠাবোধ করিতেন না। পলাশীর যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ববর্তী ঘটনাই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তথাপি ইংরাজ স্বার্থের দিক হইতে দেখিতে

চরিত্র

গেলে তিনিই ভারতবর্ষে ইংরাজ স্বার্থ শুধু রক্ষা নহে, বৃটিশ সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন করিয়া গিয়াছিলেন একথা স্বীকার করিতেই হইবে।

কর্ণাটের দ্বিতীয় যুদ্ধে তাঁহার পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করিয়াই ইংরাজগণ দাক্ষিণাত্যে আত্মরক্ষা এবং শেষ পর্যন্ত কর্ণাটে প্রাধান্য বিস্তারে সমর্থ হইয়াছিল। আর্কটের যুদ্ধ, অরণি ও কাবেরী-পাক-এর যুদ্ধ জয় তাঁহার সামরিক প্রতিভার প্রমাণস্বরূপ বলা যাইতে পারে। কাবেরী-পাক-এর যুদ্ধে ফরাসীদের পরাজিত করিয়া তিনি দাক্ষিণাত্যে ফরাসী শক্তির মূলে চরম আঘাত হানিয়াছিলেন। বাংলাদেশে কলিকাতা পুনর্দখল করিয়া সিরাজ-উদ্-দৌলার কলিকাতা পুনরুদ্ধারের চেষ্টা ব্যাহত করিয়া এবং সর্বোপরি পলাশীর যুদ্ধে বাংলার নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলাকে পরাজিত করিয়া তিনি ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান হইতে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিয়াছিলেন। বিদারার যুদ্ধে ওলন্দাজগণকে পরাজিত করিয়া তিনি ওলন্দাজ শক্তির মূলেও চরম আঘাত হানিয়াছিলেন। এইভাবে ক্লাইভ ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন করিয়া গিয়াছিলেন।

কৃতিত্ব

দ্বিতীয়বার গবর্ণর হিসাবে আসিয়া সামরিক ও বেসামরিক সংস্কার সাধন করিয়া তিনি কোম্পানির আভ্যন্তরীণ অব্যবস্থা, দুর্নীতি ও সেনাবাহিনীর বিশৃঙ্খলা দূর করিয়াছিলেন। বক্সারের যুদ্ধের পর সুজা-উদ্-দৌলা ও শাহ্ আলমের সহিত তিনি চুক্তিবদ্ধ হইয়াছিলেন। সুজা-উদ্-দৌলাকে ইংরাজদের উপর নির্ভরশীল মিত্ররূপে পরিণত করিয়া তিনি অযোধ্যারাজ্যকে বাংলাদেশের ও মারাঠাদের মধ্যবর্তী buffer state-এ পরিণত করিয়াছিলেন। শাহ্ আলমকে বাৎসরিক ২৬ লক্ষ টাকা করদানে প্রতিশ্রুত হইয়া এবং কারা ও এলাহাবাদ প্রদান করিয়া বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী তিনি লাভ করিয়াছিলেন। কোম্পানির সেই সময়কার পরিস্থিতি বিবেচনা করিয়া তিনি দেওয়ানীর দায়িত্ব কোম্পানির হস্তে না লইয়া নবাবের উপরই ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। অবশ্য এই 'দ্বৈত' শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলেই তিনি যে-সকল আভ্যন্তরীণ সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন, উহার সুফল বিনষ্ট হইয়া পুনরায় দুর্নীতির পথ প্রশস্ত হইয়াছিল।

দ্বিতীয়বার গবর্ণর হিসাবে কার্যাদি

উপসংহার

ক্লাইভের কোন কোন কার্য তাঁহার নিজ চরিত্রে এবং ইংরাজ জাতির নামে কলঙ্ক লেপন করিয়াছে সন্দেহ নাই, তথাপি তাঁহারই অক্লান্ত চেষ্টায় ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল। ব্রিটিশ ভারতীয় ইতিহাসে সেজন্য ক্লাইভের নাম অবিস্মরণীয়।

ভেরেলস্ট্, ১৭৬৭—৬৯ঃ কার্টিয়ার, ১৭৬৯—৭২ (Verelst : Cartier) : গবর্ণর ভেরেলস্ট্ ও কার্টিয়ারের শাসনকালে পূর্বেকার দুর্নীতি পুনরায় দেখা দিল। তদুপরি ক্লাইভ-প্রবর্তিত দ্বৈতশাসনের ফলে প্রজাবর্গের অবস্থাও শোচনীয় হইয়া উঠিল। দেওয়ানী-সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ—যথা রাজস্ব আদায়, দেওয়ানী বিচার প্রভৃতি নবাবের উপর রহিল অথচ প্রকৃত ক্ষমতা রহিল কোম্পানির হস্তে। নায়েব-সুবা রেজা খাঁ যথেচ্ছভাবে অর্থ আদায় করিয়া আত্মসাৎ করিতে লাগিলেন। ক্লাইভ-গঠিত একচেটিয়া বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপে ও ইংরাজ কর্মচারিবর্গের যথেচ্ছ ব্যবহারে দেশের শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হইল। প্রতি বৎসর কোম্পানির লভ্যাংশ বাবদ বাংলাদেশের সোনা-রূপা ইংলণ্ডে প্রেরণের ফলে দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তি দুর্বলতর হইতে লাগিল। রাজস্ব-নির্ধারণ সম্পর্কে নূতন নূতন ব্যবস্থা চালু করিবার ফলে কৃষিও ক্ষতিগ্রস্ত হইল। এমতাবস্থায় ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে (১১৭৬ বাংলা সনে) বাংলাদেশে এক দারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল।

ব্যাপক অব্যবস্থা ও দুর্নীতি

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর (বাংলা সন ১১৭৬, ১৭৭০ খ্রীঃ)

বাংলা ১১৭৬ সনে এই দুর্ভিক্ষ ঘটিয়াছিল বলিয়া ইহা 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' নামে পরিচিত। এই দুর্ভিক্ষের ফলে বাংলার লোকসংখ্যার মোট এক-তৃতীয়াংশ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে বারিপাতের স্বল্পতা-ই ছিল এই দুর্ভিক্ষের প্রধান কারণ, কিন্তু দুর্ভিক্ষ দেখা দেওয়ামাত্র মোহম্মদ রেজা খাঁ প্রমুখ উচ্চপদস্থ দেশীয় কর্মচারিবৃন্দ এবং কোম্পানির ইংরাজ কর্মচারিগণের অর্থগৃধ্নুতার ফলে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

বাংলার গ্রামে গ্রামে, পথে-ঘাটে অসংখ্য শিশু, বৃদ্ধ, নরনারী যখন খাদ্যাভাবে প্রতিদিন হাজারে হাজারে প্রাণ হারাইতেছিল, এমন কি পিতা-

মাতা যখন এক মুষ্টি অন্নের জন্য সন্তান বিক্রয় করিতেও প্রস্তুত ছিল, মানুষ যখন মৃতের মাংস ভক্ষণ করিতেছিল* তখনও অধিক মুনাফার আশায় কোম্পানির দেশীয় ও ইংরাজ কর্মচারিগণ খাদ্য-শস্য বাজার হইতে ক্রয় করিয়া লইয়া মজুত করিয়া রাখিতে দ্বিধাবোধ করে নাই। ইহা ভিন্ন দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত অঞ্চল হইতে সেনাবাহিনী অপসারিত না করায় যাহা কিছু সামান্য খাদ্য-শস্য পাওয়া যাইত তাহা তাহাদের জন্যই ক্রয় করিয়া লওয়া হইত। সেই সময়কার পরিবহণ-ব্যবস্থার অসুবিধা, দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ সম্পর্কে ইংরাজগণের অনভিজ্ঞতা এবং কোম্পানির কর্মচারিবর্গের মানুষের দুর্দশার সুযোগ গ্রহণ করিয়া অর্থলোভের অমানুষিক মনোবৃত্তি বাংলাদেশকে শ্মশানে পরিণত করিয়াছিল। ইহা ভিন্ন পর বৎসরের (১৭৭০-৭১) রাজস্ব আদায়েরও কোনপ্রকার উদারতা প্রদর্শন করা হইল না। দরিদ্র, দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত জনসাধারণের নিকট হইতে সেই বৎসর (১৭৭০-৭১) অপরাপর বৎসর অপেক্ষা দুইলক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা অধিক রাজস্ব আদায় করা হইয়াছিল।

বাংলার দুরবস্থা

ইতিমধ্যে ক্লাইভ-প্রবর্তিত দ্বৈত শাসনব্যবস্থাও সম্পূর্ণভাবে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। এইভাবে বাংলার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনে যখন এক বিপর্যয় দেখা দিয়াছে তখন ডাইরেক্টর সভা ওয়ারেন হেস্টিংস্‌কে বাংলার গবর্ণর নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন।

———

* "All through the stifling summer of 1770 the people went on dying. The husbandmen sold their cattle, they sold their implements of agriculture, they devoured their seed grain ; they sold their sons and daughters till at length no buyer of children could be found, they ate leaves of trees and the grass of the field and in June, 1770 the Resident at the durbar affirmed that the living were feeding on the dead". W. W. Hunter, *The Annals of Rural Bengal,* p. 26.

তৃতীয় অধ্যায়

ভারতে ব্রিটিশ শক্তির প্রসার

(Growth of the British Power in India)

ওয়ারেন হেস্টিংস্ ১৭৭২-৮৫ (Warren Hastings): ক্লাইভ-প্রবর্তিত দ্বৈত-শাসন এবং ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের ফলে বাংলার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনে যখন এক দারুণ বিপর্যয় ঘটিয়াছিল সেই সময় ওয়ারেন হেস্টিংস্ কলিকাতার গবর্ণর হইয়া আসিলেন। ইহার পূর্বে তিনি ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারী হিসাবে বাংলাদেশে কয়েক বৎসর অতিবাহিত করিয়াছিলেন। সুতরাং বাংলাদেশ, কোম্পানির বাণিজ্য ও শাসন সম্পর্কে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা তিনি পূর্বেই সঞ্চয় করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন।

হেস্টিংসের গবর্ণরি-পদ লাভ (১৭৭২)

পররাষ্ট্রীয় বা সীমান্ত-নীতি (Frontier Policy): গবর্ণরপদে নিযুক্ত হইয়া হেস্টিংস্ যখন কলিকাতায় আসিলেন তখন কোম্পানির আসন্ন সমস্যাগুলি যেমন ছিল জটিলতাপূর্ণ তেমনি ছিল নানাবিধ। হেস্টিংস্ সর্বপ্রথমেই সীমান্ত-নীতি (frontier policy)-সংক্রান্ত কতকগুলি পরিবর্তন-সাধন করিলেন। তিনি দেখিলেন যে, কোম্পানি ইতিমধ্যে বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান হইতে রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হইয়া পড়িয়াছে। এমতাবস্থায় কোম্পানিকে ভারতীয় অপরাপর রাজনৈতিক শক্তির সহিত সুস্পষ্ট সম্পর্কে আবদ্ধ হইতে হইবে। বাংলাদেশ ভারতেরই অংশ, সুতরাং বাংলার প্রভুত্ব লাভের ফলে অপরাপর অংশের প্রতি সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক নীতি গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন। তিনি ইহাও উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শক্তিকে প্রতিহত করিবার শক্তি ও ক্ষমতা সেই সময়ে একমাত্র মারাঠাদেরই ছিল। সুতরাং সীমান্ত-নীতি বা পররাষ্ট্র-নীতি নির্ধারণে একথা স্মরণ করিয়া চলাই ছিল

তাঁহার পররাষ্ট্রীয়-নীতি বা সীমান্ত-নীতির মূলসূত্র

একমাত্র যুক্তিসঙ্গত পন্থা। ব্রিটিশ অধিকার বিস্তার সম্পর্কে ডাইরেক্টর সভা পুনঃপুনঃ নিষেধাজ্ঞা জারী করিতেছিলেন। তাঁহারা সামরিক ও বেসামরিক ব্যয় সংক্ষেপের জন্য কলিকাতায় বারবার গবর্ণর ও কাউন্সিলকে নির্দেশ প্রেরণ করিতেছিলেন। তাঁহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল লাভের অঙ্ক বৃদ্ধি করা। কিন্তু ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ দেখিলেন যে, ভারতবর্ষে ব্রিটিশ অধিকার স্থায়ী করিতে হইলে দেশীয় নৃপতিগণকে যথাসম্ভব ব্রিটিশ সাহায্যের উপর নির্ভরশীল করিয়া তোলার প্রয়োজন। এজন্য তিনি 'অধীনতা-মূলক মিত্রতা'-নীতি (Subsidiary Alliance)-এর স্থচনা করেন। তাঁহার এই নীতিই পরবর্তী কালে ওয়েলেস্লী অধিকতর ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করিয়াছিলেন।

ক্লাইভের সহিত চুক্তিবদ্ধ হওয়ার (১৭৬৫) পর হইতে শাহ্ আলম কারা ও এলাহাবাদে শান্তিপূর্ণভাবেই কালাতিপাত করিতেছিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে মারাঠাগণ পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধে (১৭৬১) পরাজয়ের পর দ্রুত শক্তি সঞ্চয় করিয়া পুনরায় এক দুর্ধর্ষ শক্তি হিসাবে ভারতীয় রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করিতে শুরু করিয়াছিল। ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে তাহারা দিল্লী অধিকার করিয়া সম্রাট শাহ্ আলমকে মোগল রাজধানী দিল্লীতে স্থাপনের উদ্দেশ্যে লইয়া গিয়াছিল। ওয়াজীর বা প্রধানমন্ত্রীর হস্তে শাহ্ আলমের পিতা দ্বিতীয় আলমগীর ক্রীড়নকস্বরূপ হইয়া পড়িলে শাহ্ আলম (তখন শাহ্‌জাদা আলি গৌহর) দিল্লী ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিয়াছিলেন। কিছুকাল পর আলমগীর সেই ওয়াজীরের হস্তেই প্রাণ হারাইলেন। শাহ্ আলম নিজেকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিলেন, কিন্তু দিল্লীতে তিনি ফিরিয়া গেলেন না। বক্সারের যুদ্ধে (১৭৬৪) মিরকাশিমের পক্ষ গ্রহণ করিয়া পরাজিত হইলে ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ক্লাইভ তাঁহার নিকট হইতে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী আদায় করিলেন। বিনিময়ে অযোধ্যার নবাব হইতে অধিকৃত কারা ও এলাহাবাদ প্রদেশ দুইটি তিনি শাহ্ আলমকে দান করিলেন এবং বাৎসরিক ২৬ লক্ষ টাকা কর দানে প্রতিশ্রুত হইলেন।

হেষ্টিংস্ ও সম্রাট শাহ্ আলম

১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে মারাঠাগণ শাহ্ আলমকে দিল্লী লইয়া গিয়াছিল। দিল্লী সম্রাটের প্রতিনিধি হিসাবে মারাঠা শক্তির প্রসার-সাধন করাই ছিল তাহাদের মূল উদ্দেশ্য। মোগল সম্রাট মারাঠাদের হস্তে ক্রীড়নকে পরিণত হইয়াছেন

দেখিয়া হেস্টিংস্ বানারস-এর সন্ধির দ্বারা (১৭৭৩, আগস্ট) কারা ও এলাহাবাদ পঞ্চাশ লক্ষ টাকার বিনিময়ে পুনরায় অযোধ্যার নবাবকে ফিরাইয়া দিলেন। ইহা ভিন্ন তিনি বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানীর জন্য প্রতিশ্রুত ছাব্বিশ লক্ষ টাকা কর-দানও বন্ধ করিয়া দিলেন। অযোধ্যা রাজ্যের শক্তিবৃদ্ধি করিয়া মারাঠা ও ইংরাজদের মধ্যে উহাকে 'মধ্যবর্তী রাজ্য' (buffer state) হিসাবে রক্ষা করাই ছিল হেস্টিংসের অযোধ্যা-নীতির মূলসূত্র। বানারস-এর সন্ধি দ্বারা ইহাও স্থির হইল যে, প্রয়োজনবোধে অযোধ্যার নবাব কোম্পানির সেনাবাহিনীর সাহায্য গ্রহণ করিতে পারিবেন। সেজন্য যাবতীয় ব্যয় অবশ্য তাঁহাকে বহন করিতে হইবে।

অযোধ্যা নীতি ; বানারস-এর সন্ধি (১৭৭৩)

হেস্টিংস্ কর্তৃক কারা ও এলাহাবাদ অযোধ্যার নবাব সুজা-উদ্-দৌলাকে দান করা এবং সম্রাটের বাৎসরিক প্রাপ্য কর বন্ধ করা কতদূর ন্যায়সঙ্গত হইয়াছিল সেবিষয়ে মতানৈক্য রহিয়াছে। কিন্তু মারাঠাদের সহিত মিলিত হইয়া শাহ্ আলম ইংরাজদের একমাত্র শক্তিশালী শত্রু মারাঠাদের শক্তিবৃদ্ধি করিয়াছিলেন একথা অনস্বীকার্য। এমতাবস্থায় কারা ও এলাহাবাদ মারাঠাদের হস্তে চলিয়া গেলে ব্রিটিশের মিত্রশক্তি অযোধ্যার নবাবের নিরাপত্তা এবং সেহেতু বাংলার নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হইত। ইহা ভিন্ন বাৎসরিক কর হিসাবে ছাব্বিশ লক্ষ টাকা শাহ্ আলমকে দিবার অর্থই ছিল মারাঠাদের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করা। সর্বোপরি সুজা-উদ্-দৌলার নিকট হইতে প্রাপ্ত পঞ্চাশ লক্ষ টাকা এবং শাহ্ আলমকে বাৎসরিক কর না দিবার ফলে সঞ্চিত ছাব্বিশ লক্ষ টাকা সেই সময়ে কোম্পানির আর্থিক অনটন কতকাংশে দূর করিয়াছিল। এই সকল যুক্তির উপরই সম্রাটের প্রতি হেস্টিংসের অনুসৃত নীতিকে সমর্থনের চেষ্টা করা হইয়াছে।

শাহ্ আলমের প্রতি অনুসৃত নীতির যুক্তি

রুহেলা বা রোহিলা যুদ্ধ (Rohela or Rohila War): ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট শাহ্ আলমকে দিল্লীর সিংহাসনে স্থাপন করিয়া প্রথমেই মারাঠাগণ রোহিলখণ্ড আক্রমণ করিল। রোহিলা-সর্দার নাজিম-উদ্-দৌলার পুত্র জবিতা খাঁ যুদ্ধে পরাজিত হইয়া সুজা-উদ্-দৌলার রাজ্য অযোধ্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সুজা-উদ্-দৌলা মারাঠাগণ কর্তৃক রোহিলা রাজ্য

আক্রান্ত হওয়ায় অত্যন্ত ভীত হইয়া নিজ রাজ্যের নিরাপত্তার জন্য সীমান্ত দেশে সৈন্য মোতায়েন করিলেন। রোহিলাদের সহিত সুজা-উদ্-দৌলার তেমন সদ্ভাব ছিল না। যাহা হউক ব্রিটিশ রেসিডেন্ট সার্ রবার্ট বার্কারের চেষ্টায় সুজা-উদ্-দৌলা ও রোহিলাদের মধ্যে এক মিত্রতা-চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল (১৭ই জুন, ১৭৭২)। সুজা-উদ্-দৌলা রোহিলা রাজ্য হইতে মারাঠাগণকে বিতাড়িত করিতে সক্ষম হইলে তদানীন্তন রোহিলা-সর্দার হাফিজ রহমৎ খাঁ তাঁহাকে ৪০ লক্ষ টাকা পুরস্কার হিসাবে দান করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। কিন্তু অল্পকাল পরেই মারাঠাগণ পুনরায় রোহিলা রাজ্য আক্রমণ করিলে হাফিজ রহমৎ খাঁ পাঁচ লক্ষ টাকা দিয়া মারাঠাদের নিরস্ত করিলেন। সুজা-উদ্-দৌলা হাফিজ রহমৎ খাঁর এই আচরণকে বিশ্বাসঘাতকতা বলিয়া অভিহিত করিলেন। যাহা হউক, শেষ পর্যন্ত রোহিলা ও অযোধ্যার নবাবের যুগ্মবাহিনী মারাঠাগণকে রোহিলখণ্ড হইতে বিতাড়িত করিতে সমর্থ হইল। সেই সময়ে পেশওয়া মাধব রাও (১ম)-এর মৃত্যুতে মারাঠা রাজ্যের রাজধানী পুণায় গোলযোগ উপস্থিত হইলে মারাঠাগণ সেখানে চলিয়া গেল। ফলে, সুজা-উদ্-দৌলা রোহিলা রাজ্য অধিকার করিবার সুযোগ পাইলেন। রোহিলা রাজ্য অধিকার করিবার আকাঙ্ক্ষা অযোধ্যার নবাবগণ বহু পূর্ব হইতেই পোষণ করিতেছিলেন। উত্তর-ভারতে মারাঠা বাহিনীর অনুপস্থিতির সুযোগে সুজা-উদ্-দৌলা রোহিলা রাজ্য দখল করিবার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। বানারসের সন্ধির শর্তানুযায়ী হেস্টিংস্ সুজা-উদ্-দৌলাকে সামরিক সাহায্যদানে প্রতিশ্রুত ছিলেন। সুজা-উদ্-দৌলা ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর ব্যয় ভিন্ন আরও ৪০ লক্ষ টাকা ইংরাজদের দিতে স্বীকৃত হইলেন। হেস্টিংস্ কর্ণেল চ্যাম্পিয়ন-এর অধীনে এক ব্রিটিশ বাহিনী সুজা-উদ্-দৌলার সাহায্যে প্রেরণ করিলেন (ফেব্রুয়ারি, ১৭৭৪)। অযোধ্যার ও ব্রিটিশ বাহিনীর যুগ্ম আক্রমণে মিরণপুর কাট্‌রা-এর যুদ্ধে হাফিজ রহমৎ খাঁ পরাজিত ও নিহত হইলেন। রোহিলখণ্ড সুজা-উদ্-দৌলার রাজ্যের সহিত সংযুক্ত হইল।

রোহিলা যুদ্ধের সূচনা

রোহিলা যুদ্ধে হেস্টিংস্ কর্তৃক সামরিক সাহায্য দান—রোহিলাদের পরাজয়

পরবর্তী রোহিলা সর্দার ফৈজ-উল্লাহ্ খাঁ বিচ্ছিন্ন রোহিলা সৈন্যের

একাংশকে সঙ্গে লইয়া গাড়োয়াল পর্বতের পাদদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

পরবর্তী রোহিলা-সর্দার—ফৈজ-উল্লাহ্ খাঁ

দীর্ঘদিনের আলাপ-আলোচনার পর অযোধ্যার নবাব লাল ডাঙ-এর সন্ধি দ্বারা ফৈজ-উল্লাহ্ খাঁকে তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তি রামপুর ফিরাইয়া দিলেন। তাঁহার সৈন্য-সংখ্যা পাঁচ হাজারের অধিক থাকিবে না এবং প্রয়োজন-বোধে এই সৈন্যবাহিনী অযোধ্যার নবাবকে সাহায্যদানে প্রস্তুত থাকিবে—এই দুইটি শর্তও ফৈজ-উল্লাহ্‌কে মানিয়া লইতে হইল।

রোহিলা যুদ্ধে অযোধ্যার নবাব ওয়াজীরকে ব্রিটিশ সৈন্যসাহায্য দানের যৌক্তিকতা এবং নৈতিকতা সম্পর্কে সমসাময়িককাল হইতে শুরু করিয়া অদ্যাবধি দুইটি পরস্পর-বিরোধী মত রহিয়াছে। ওয়ারেন হেস্টিংসের ইম্পীচ্‌মেন্ট্ (Impeachment)-এর সর্বপ্রথম অভিযোগই ছিল রোহিলা যুদ্ধে অর্থের বিনিময়ে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীকে ভাড়াটিয়া সৈন্যের ন্যায় ব্যবহার করা।* বার্ক, ফ্রান্সিস্, মিল, ম্যাকলে, লায়েল প্রভৃতি অনেকেরই মতে রোহিলা যুদ্ধে সৈন্যসাহায্য দানের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল অর্থ লাভ করা। ৪০ লক্ষ টাকার বিনিময়ে ইংরাজদের সহিত কোনপ্রকার শত্রুতাসাধন করে নাই এইরূপ একটি স্বাধীন জাতির বিরুদ্ধে হেস্টিংসের সৈন্যপ্রেরণ মানবতা ও নৈতিকতার বিচারে সমর্থনযোগ্য নহে, ইহা-ই হইল সমসাময়িক এবং পরবর্তী কালের লেখকগণের অভিমত। ফরেস্ট্, স্ট্রেচি (Strachey)† প্রভৃতি ঐতিহাসিক, ডাইরেক্টর সভার সহিত হেস্টিংসের পত্রালাপ, ইম্পীচ্-মেন্টের সময় হেস্টিংসের জবাব প্রভৃতির বিশদ আলোচনা করিয়া সম্পূর্ণ বিপরীত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তাঁহাদের মতে রোহিলা যুদ্ধ মূলতঃ ব্রিটিশ অধিকারের নিরাপত্তার যুক্তি-তেই সমর্থনযোগ্য। মারাঠাগণের সহিত আত্মরক্ষার্থ যুদ্ধ করিবার সামর্থ্য বা অভিপ্রায় রোহিলাদের ছিল না। রোহিলখণ্ড মারাঠাগণ

হেস্টিংসের রোহিলা-নীতির সমালোচনা

---

* পরে অবশ্য এই অভিযোগটি বাদ দেওয়া হইয়াছিল।

† Strachey : Hastings and the Rohilla War, pp. 237-54.
Forrest : Selections from State-papers vol. I, pp. 79-81.

কর্তৃক অধিকৃত হইলে শুধু অযোধ্যা নহে বাংলাদেশেরও নিরাপত্তা ব্যাহত হইত। তাঁহাদের মতে রোহিলা যুদ্ধের সূত্রে প্রাপ্ত অর্থ ছিল রোহিলা-নীতি-প্রসূত উদ্বৃত্ত সুবিধা। হেস্টিংসের রোহিলা-নীতির বিচারে সেই সময়ে কোম্পানির অর্থাভাব এবং সমসাময়িক নৈতিকতার মান-এর কথাও বিস্মৃত হওয়া যুক্তিসঙ্গত হইবে না—একথাও স্ট্রেচি উল্লেখ করিয়াছেন। হেস্টিংসের রোহিলা-নীতির সমর্থন করিতে গিয়া একথাও বলা হইয়া থাকে যে, সুজা-উদ্-দৌলার রাজ্যের সহিত সংযুক্তির পর রোহিলা রাজ্যে আর কোন গোলযোগ দেখা দেয় নাই এবং মারাঠাগণও আর ঐ অঞ্চল আক্রমণ করে নাই।

কিন্তু নৈতিকতার প্রশ্ন বাদ দিলেও রাজনৈতিক দূরদর্শিতার দিক দিয়া হেস্টিংসের রোহিলা-নীতি যে ত্রুটিপূর্ণ ছিল, একথা অনস্বীকার্য। মারাঠাগণ ভবিষ্যতে আর রোহিলখণ্ড আক্রমণ করে নাই, ইহার কারণ ছিল মাধব রাও-এর মৃত্যুর ফলে মারাঠাদের মধ্যে আত্মকলহ। উত্তর-পশ্চিম দিক হইতেও কোনপ্রকার আক্রমণের ভয় সেই সময় ছিল না, কারণ ইতিমধ্যে পাঞ্জাবে শিখগণ যথেষ্ট শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং হেস্টিংসের নীতির ফলে রোহিলখণ্ড তথা অযোধ্যা রাজ্যে শান্তির সুযোগ বৃদ্ধি পাইয়াছিল, একথা বলা চলে না। উপরন্তু হেস্টিংস্ তাঁহার সীমান্ত-নীতি অযোধ্যার নবাব সুজা-উদ্-দৌলার আনুগত্যের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল করিয়া তুলিয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিপদের সম্ভাবনার স্থষ্টি করিয়াছিলেন। সুজা-উদ্-দৌলার শক্তিবৃদ্ধি করিয়া হেস্টিংস্ ব্রিটিশ শক্তির বিপদের সূচনা করিয়াছিলেন। ইহার পরিচয় সুজা-উদ্-দৌলার ব্রিটিশ-প্রভাব হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টার মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। সুজা-উদ্-দৌলা ক্রমেই ব্রিটিশের অধীনতামূলক মিত্রতা ছিন্ন করিবার জন্য উদ্গ্রীব হইয়া উঠিয়াছিলেন। ফরাসীদের সাহায্যে নিজ সেনাবাহিনীকে ইওরোপীয় সামরিক পদ্ধতিতে শিক্ষাদান ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব হইতে সুজা-উদ্-দৌলা বহিঃশক্তির সাহায্য লইয়া ব্রিটিশ প্রাধান্য নাশের চেষ্টা শুরু করিয়াছিলেন—এইরূপ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। সুজা-উদ্-দৌলার আকস্মিক মৃত্যু এবং তাঁহার পুত্র আসফ্-উদ্-দৌলার অকর্মণ্যতার ফলে ব্রিটিশ স্বার্থ রক্ষা পাইয়াছিল।

উপসংহার

প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ (The First Anglo-Maratha War): পেশওয়া প্রথম মাধব রাও-এর মৃত্যুর পর (১৭৭২) তাঁহার ভ্রাতা নারায়ণ রাও পেশওয়া-পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই নিজ পিতৃব্য রঘুনাথ রাও বা রাঘোবার ষড়যন্ত্রে তিনি প্রাণ হারাইলেন। রঘুনাথ রাও পেশওয়া বলিয়া স্বীকৃত হইলেন বটে, কিন্তু নারায়ণ রাও-এর অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীর পুত্রসন্তান জাত হইলে নানা ফড়নবিশ এই নবজাত পুত্রের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। অপরাপর মারাঠা নেতার সাহায্যে নানা ফড়নবিশ নারায়ণ রাও-এর শিশু পুত্রকে পেশওয়া-পদে স্থাপন করিতে সক্ষম হইলেন। রঘুনাথ রাও বাধ্য হইয়া পেশওয়া-পদ ত্যাগ করিয়া ইংরাজদের সাহায্যপ্রার্থী হইলেন। তিনি সুরাটের সন্ধি দ্বারা সল্‌সেট্ ও ব্যাসিন নামক দুইটি স্থান ইংরাজদের সমর্পণ করিলেন এবং ভারুচ ও সুরাটের রাজস্বের একাংশ দানে স্বীকৃত হইয়া ইংরাজ সেনাবাহিনীর সাহায্য গ্রহণ করিলেন। এই চুক্তির শর্তানুযায়ী বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কাউন্সিল রঘুনাথকে পেশওয়া বলিয়া স্বীকার করিয়া লইল। সুরাটের সন্ধি স্বাক্ষরিত হওয়ার অব্যবহিত পরে ইংরাজগণ সল্‌সেট্ অধিকার করিয়া লইল।

প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের কারণ

সুরাটের সন্ধি (১৭৭৫)

সল্‌সেট্ অধিকার করিবার সঙ্গে সঙ্গে মারাঠাদের সহিত বোম্বাই-এর ইংরাজ সরকারের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হইল। আরাস্ (Arras)-এর যুদ্ধে রঘুনাথ রাও এবং ইংরাজদের যুগ্মবাহিনী জয়লাভ করিল। কিন্তু ইতিমধ্যে কলিকাতাস্থ কাউন্সিল বোম্বাই সরকারের এইরূপ স্বাধীনভাবে যুদ্ধ ঘোষণার তীব্র নিন্দা করিয়া কর্ণেল আপ্‌টন (Upton)-কে মারাঠাদের সহিত সন্ধি স্থাপনের জন্য প্রেরণ করিলেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট রেগুলেটিং এ্যাক্ট্ (Regulating Act) নামে এক আইন পাস করিয়া বাংলার গবর্ণরকে গবর্ণর-জেনারেল-পদে উন্নীত করিয়াছিলেন এবং গবর্ণর-জেনারেল ও কাউন্সিলকে মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর উপর যুদ্ধ ও সন্ধি-সংক্রান্ত বিষয়ে পরিদর্শন ক্ষমতা দান করিয়াছিলেন।

বোম্বাই সরকার কর্তৃক রেগুলেটিং এ্যাক্ট্ অমান্য

কর্ণেল আপ্‌টন (Colonel Upton) মারাঠাদের সহিত পুরন্দরের সন্ধি স্বাক্ষর করিলেন (১৭৭৬)। বোম্বাই-এর কাউন্সিল কর্তৃক রঘুনাথ রাও-এর

সহিত সুরাটের সন্ধি-স্বাক্ষর হেস্টিংস্ ব্যক্তিগতভাবে সমর্থন না করিলেও পরিস্থিতি অনুযায়ী বোম্বাই-এর কাউন্সিলকে তিনি সাহায্যদানের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু কলিকাতা কাউন্সিলের অধিকাংশ সদস্য বোম্বাই কাউন্সিলকে সুরাটের সন্ধি নাকচ করিয়া পুরন্দরের সন্ধি গ্রহণে বাধ্য করিয়াছিলেন। এই সন্ধির শর্তানুযায়ী বোম্বাই সরকার রঘুনাথ রাও-এর পক্ষ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। সল্‌সেট্ অবশ্য ইংরাজ অধিকারেই রহিল। রঘুনাথ রাওকে উপযুক্ত ভাতা দানের ব্যবস্থাও করা হইল। যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ হিসাবে ভারুচ্ এবং ১২ লক্ষ টাকা মারাঠাদের নিকট হইতে গ্রহণ করাও স্থির হইল। কিন্তু ইংলণ্ডস্থ ডাইরেক্টর সভা (Board of Directors) বোম্বাই কাউন্সিল কর্তৃক স্বাক্ষরিত সুরাটের সন্ধি সমর্থন করিলে পরিস্থিতির সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটিল। বোম্বাই সরকার সঙ্গে সঙ্গেই রঘুনাথ রাও-এর পক্ষ সমর্থন করিয়া মারাঠাদের সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। এইবার তেলেগাঁও-এর যুদ্ধে মারাঠাদের হস্তে ইংরাজ বাহিনীর শোচনীয় পরাজয় ঘটিল। ইংরাজপক্ষ ওয়াড়গাঁও (Wargaon)-এর সন্ধি দ্বারা রঘুনাথ রাওকে মারাঠাদের নিকট সমর্পণ করিতে, মারাঠারাজ্যে অধিকৃত যাবতীয় স্থান প্রত্যর্পণ করিতে এবং মারাঠাদের নিকট প্রতিভূ (hostages) প্রেরণ করিতে স্বীকৃত হইল। ওয়াড়গাঁও-এর সন্ধি ব্রিটিশ মর্যাদায় চরম আঘাত হানিল। হেস্টিংস্ এই চুক্তি অগ্রাহ্য করিয়া সেনাপতি গোডার্ড (Goddard)-কে মারাঠাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। গোডার্ড মধ্য-ভারতের মধ্য দিয়া তাঁহার বিশাল সেনাবাহিনী লইয়া অগ্রসর হইলেন। ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি আহম্মদাবাদ এবং ঐ বৎসরেরই ডিসেম্বর মাসে ব্যাসিন দখল করিলেন। কিন্তু পরবৎসর পুণার দিকে অগ্রসর হইতে গিয়া তিনি পরাজিত হইলেন। ইতিমধ্যে হেস্টিংস্ ইংরাজদের মিত্রপক্ষ এবং সিন্ধিয়ার শত্রু গোহাড়-এর রাণার সাহায্যার্থে ক্যাপ্টেন পোফাম্‌কে (Popham) প্রেরণ করিলেন। পোফাম্ গোয়ালিওর দুর্গটি দখল করিতে সমর্থ হইলেন। ইহা ভিন্ন জেনারেল ক্যামাক্ (Camac) সিপ্রির যুদ্ধে সিন্ধিয়াকে পরাজিত করিলেন। এই সকল সাফল্যের ফলে একদিকে

পুরন্দরের সন্ধি (১৭৭৬)

ওয়াড়গাঁও-এর সন্ধি (১৭৬৯)

গোডার্ড, পোফাম্ ও ক্যামাক্-এর অভিযান

যেমন ইংরাজদের মর্যাদা বৃদ্ধি পাইল, অপরদিকে মাহাদজী সিন্ধিয়া ইংরাজদের সহিত মিত্রতা-স্থাপনে উৎসুক হইয়া উঠিলেন। তাঁহারই চেষ্টায় ইংরাজ ও মারাঠাদের মধ্যে সল্‌বই (Salbai)-এর সন্ধি স্বাক্ষরিত হইল। এই সন্ধির শর্তানুসারে মাধব রাও নারায়ণ পেশওয়া বলিয়া স্বীকৃত হইলেন, রঘুনাথ রাও বা রাঘোবাকে উপযুক্ত ভাতা দানের ব্যবস্থা করা হইল। সিন্ধিয়াকে যমুনা নদীর পশ্চিম তীরস্থ যাবতীয় স্থান ফিরাইয়া দেওয়া হইল। হায়দর আলি মারাঠা পক্ষ অবলম্বন করিয়া প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন। তাঁহাকে সল্‌বই-এর চুক্তিতে যোগদান করিতে হইল না বটে, কিন্তু তিনি কর্ণাটে যে সকল স্থান অধিকার করিয়াছিলেন সেগুলি ফিরাইয়া দিতে হইল। সল্‌সেটের উপর ইংরাজ অধিকার স্বীকৃত হইল।

সল্‌বই-এর সন্ধি (১৭৮২)

প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের ফলে ব্রিটিশ অধিকারের কোন বিস্তার সাধিত না হইলেও তাহাদের মর্যাদা যে বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল সেবিষয়ে সন্দেহ নাই। এই যুদ্ধের পর দীর্ঘ কুড়ি বৎসর ধরিয়া ইংরাজ ও মারাঠাদের মধ্যে শান্তি বিরাজিত ছিল বলিয়া ফরাসীগণ ও টিপু সুলতানের সহিত যুদ্ধে ইংরাজগণের পূর্ণশক্তি নিয়োগের সুযোগ ঘটিয়াছিল। ইহা ভিন্ন হায়দরাবাদের নিজাম, অযোধ্যার নবাব প্রভৃতিকে ব্রিটিশ প্রাধান্যাধীনে আনিবার অবকাশও পাওয়া গিয়াছিল।

সল্‌বই-এর সন্ধির গুরুত্ব

হেস্টিংস্ ও মহীশূর রাজ্য: দ্বিতীয় মহীশূর যুদ্ধ (Hastings & Mysore: Second Mysore War):

[হায়দর আলির অভ্যুত্থানকে ব্রিটিশ, মারাঠা ও নিজাম এই তিন শক্তির মধ্যে কোনটিই প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারিল না। উদীয়মান ব্রিটিশ শক্তির সম্মুখে মহীশূর রাজ্য এক বিরাট বাধার সৃষ্টি করিল। মহীশূর রাজ্য আক্রমণে মারাঠাগণই হইল অগ্রণী। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে তাহারা হায়দরের রাজ্য আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে গুটি, সবনুর নামক স্থান দুইটি এবং ৩২ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করিল। পরবৎসর নিজাম উত্তর-সরকার (Northren Circars) মাদ্রাজের ইংরাজ সরকারকে অর্পণের প্রতিশ্রুতিতে মহীশূর রাজ্যের বিরুদ্ধে ইংরাজ সাহায্য লাভ করিলেন। মারাঠাগণও পশ্চাৎপদ রহিল না। মারাঠা,

ব্রিটিশ ও নিজাম মহীশূর রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলে হায়দর আলি মারাঠাগণকে অর্থের দ্বারা বশীভূত করিলেন। অল্পকালের মধ্যে নিজামও ইংরাজপক্ষ ত্যাগ করিয়া হায়দরের পক্ষে যোগদান করিলেন। কিন্তু নিজাম নির্ভরযোগ্য মিত্র ছিলেন না। তিনি হায়দরের পক্ষ ত্যাগ করিলেন। হায়দর এককভাবে যুদ্ধ করিয়া বোম্বাই সরকারের সেনাবাহিনীকে পরাজিত করিলেন এবং ম্যাঙ্গালোর পুনরধিকার করিতে সমর্থ হইলেন। মাদ্রাজ সরকারের সেনাবাহিনীকেও পরাজিত করিতে হায়দরের বেগ পাইতে হইল না। তিনি মাদ্রাজের সন্নিকটে সসৈন্যে উপস্থিত হইলে মাদ্রাজ সরকার তাঁহার সহিত সন্ধিস্থাপনে বাধ্য হইলেন (১৭৬৯)। ইংরাজ ও হায়দরের মধ্যে পরস্পর সামরিক সাহায্য দানের শর্তে চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল। উভয়পক্ষ পরস্পর পরস্পরের অধিকৃত স্থান এবং যুদ্ধ-বন্দী প্রত্যর্পণ করিলেন। হায়দরের রাজ্য কোন তৃতীয় শক্তি কর্তৃক আক্রান্ত হইলে ইংরাজগণ সামরিক সাহায্য দান করিবে বলিয়া প্রতিশ্রুত হইল। কিন্তু ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে মারাঠাগণ মহীশূর আক্রমণ করিলে মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্ট ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দের চুক্তির শর্ত উপেক্ষা করিয়া হায়দরকে কোন সাহায্য দিলেন না। হায়দর আলিও মাদ্রাজ সরকারের এই বিশ্বাসঘাতকতার কথা ভুলিলেন না।]

প্রথম মহীশূর যুদ্ধ

আমেরিকার স্বাধীনতা-যুদ্ধে ফরাসীগণ মার্কিন বিদ্রোহীদের পক্ষে যোগদান করিয়াছিল। এই সূত্রে ভারতে ইংরাজগণ ফরাসী অধিকৃত মাহে বন্দরটি অধিকার করিয়া লইল। মাহে ছিল মহীশূর রাজ্যের অন্তর্গত। মহীশূর রাজ্যের স্বার্থের দিক দিয়া মাহে বন্দরটি ইংরাজ-অধিকৃত হওয়া মোটেই বাঞ্ছনীয় ছিল না। হায়দর আলি স্বভাবতই এইজন্য ইংরাজদের প্রতি অধিকতর বিদ্বেষভাবাপন্ন হইয়া উঠিলেন। তিনি ইংরাজদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। তিনি নিজাম কর্তৃক সংগঠিত এক শক্তিসংঘে যোগদান করিয়া ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজদের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। প্রথমে ইংরাজপক্ষ হায়দরের হস্তে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইলে ওয়ারেন হেস্টিংস্ সার আয়ার কূট (Sir Eyre Coote)-কে হায়দরের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। ইহা ভিন্ন তিনি কূটকৌশলে নিজাম, বেরারের রাজা ও মাহাদজী সিন্ধিয়াকে ইংরাজ-বিরোধী শক্তিসংঘ হইতে বিচ্ছিন্ন করিতেও সমর্থ হইলেন। মিত্রবর্গ কর্তৃক

দ্বিতীয় মহীশূর যুদ্ধ

পরিত্যক্ত হইলেও হায়দর এককভাবে ইংরাজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইতে লাগিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি পোর্টো-নোভের যুদ্ধে আয়ার কূট-এর হস্তে পরাজিত হইলেন। পলিলোর ও শলিংগুর (Pollilore and Sholinghur)-এর যুদ্ধেও হায়দর আয়ার কূট-এর হস্তে পরাজিত হইলেন। কিন্তু ব্রিটিশ কর্ণেল ব্রেইথওয়েট্ (Braithwaite) তাঞ্জোর-এর নিকট হায়দর আলির পুত্র টিপু সুলতানের হস্তে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইলেন।

হায়দরের মৃত্যু

সেই সময়ে ফরাসী অ্যাডমিরাল সাফ্রেঁ হায়দরের সাহায্যে এক নৌবহরসহ উপস্থিত হইলেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই দু' সেমিন (Du Chemin) নামে অপর একজন সেনাপতিও এক সেনাবাহিনীসহ উপস্থিত হইলেন। কিন্তু ফরাসী নৌবহর এবং সেনাবাহিনী হায়দরকে সাহায্য দানের পূর্বেই হায়দরের মৃত্যু হইল (১৭৮২)। হায়দরের মৃত্যুতে ইংরাজগণ স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। কিন্তু হায়দরের সুযোগ্য পুত্র টিপু পিতার মৃত্যুর পরও যুদ্ধ চালাইয়া যাইতে লাগিলেন। এ দিকে ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হইয়া গিয়াছিল। কর্ণেল ফুলারটন (Colonel Fullerton) কোইম্বাটুর দখল করিয়া টিপুর রাজধানী আক্রমণ করিবার জন্য যখন প্রস্তুত হইতেছিলেন সেই সময়ে মাদ্রাজের নূতন গবর্ণর লর্ড ম্যাকার্টনি কর্ণেল ফুলারটনকে যুদ্ধবিরতির আদেশ দিলেন। টিপু ও ইংরাজদের মধ্যে ম্যাঙ্গালোর-এর চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল (১৭৮৪)। উভয়পক্ষই পরস্পর পরস্পরের অধিকৃত স্থান ফিরাইয়া দিতে স্বীকৃত হইল। এই সকল শর্তে সন্ধিস্থাপন হেস্টিংসের মনঃপূত না হইলেও তিনি ম্যাঙ্গালোর-এর সন্ধি অনুমোদন করিলেন।

ম্যাঙ্গালোর-এর সন্ধি (১৭৮৪)

হেস্টিংসের আভ্যন্তরীণ নীতি ও শাসন (Internal Policy & Administration of Hastings) : হেস্টিংস্ যখন গবর্ণর হিসাবে শাসনভার গ্রহণ করেন তখন ক্লাইভ-প্রবর্তিত দ্বৈতশাসন ব্যবস্থার যাবতীয় ত্রুটি ব্যাপকভাবে প্রকাশ লাভ করিয়াছিল। হেস্টিংস্ ডাইরেক্টর সভার নির্দেশ অনুসারে ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে দ্বৈতশাসন ব্যবস্থার অবসান ঘটাইয়া দেওয়ানী পরিচালনার ভার কোম্পানির হস্তে ন্যস্ত করিলেন। এ যাবৎ কোম্পানি দেওয়ানী লাভের সুযোগ-সুবিধা সবই ভোগ করিয়া

দ্বৈতশাসন ব্যবস্থার অবসান—কোম্পানি কর্তৃক দেওয়ানীর দায়িত্ব গ্রহণ

আসিতেছিল বটে, কিন্তু দেওয়ানী-সংক্রান্ত যাবতীয় দায়িত্ব ছিল নবাবের উপর। কিন্তু ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে হেস্টিংস্ কোম্পানির হস্তে দেওয়ানীর দায়িত্ব ন্যস্ত করিলেন। তিনি নবাবের বাৎসরিক ভাতা ৩২ লক্ষ মুদ্রা হইতে ১৬ লক্ষ মুদ্রায় হ্রাস করিলেন এবং রেজা খাঁ ও সীতাব রায়কে পদচ্যুত করিয়া দেওয়ানপদ দুইটি উঠাইয়া দিলেন।

হেস্টিংসের নীতি ও উদ্দেশ্য

আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে হেস্টিংসের নীতি ছিল রাজস্ব আদায়ের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করা এবং দেওয়ানী বিচার-ব্যবস্থার সংস্কার সাধন করা। দ্বৈতশাসনের ফলে যে অব্যবস্থা এবং অর্থাভাব দেখা দিয়াছিল তাহা দূর করাও ছিল হেস্টিংসের অন্যতম উদ্দেশ্য।

রাজস্ব আদায়ের নূতন ব্যবস্থা

উপরি-উক্ত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য হেস্টিংস্ ভ্রাম্যমাণ কমিটি (Committee of Circuit) নামে একটি ক্ষুদ্র সভা গঠন করিলেন। এই কমিটিকে প্রত্যেক জেলায় উপস্থিত হইয়া জমিদারদের সহিত বন্দোবস্ত করিবার দায়িত্ব দেওয়া হইল। জমিদারগণকে একসঙ্গে পাঁচ বৎসরের জন্য জমিদারি বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে বলিয়া স্থির হইল। কোম্পানির রাজস্ব আদায়ের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারিগণ পূর্বে 'সুপারভাইজর' (Supervisors) বা পরিদর্শক নামে অভিহিত হইতেন। হেস্টিংস্ তাঁহাদিগকে 'কালেক্টর' (Collector) নামকরণ করিলেন। দেওয়ানীর কোষাগার মুর্শিদাবাদ হইতে কলিকাতায় স্থানান্তরিত করা হইল। গবর্ণর এবং তাঁহার কাউন্সিল লইয়া একটি রেভিনিউ বোর্ড (Board of Revenue) গঠিত হইল। দেওয়ানী-সংক্রান্ত কার্যাদির সর্বোচ্চ দায়িত্ব এই বোর্ড-এর উপর ন্যস্ত হইল।

হেস্টিংসের রাজস্ব-নীতির সমালোচনা

ওয়ারেন হেস্টিংসের রাজস্ব-বন্দোবস্ত সদিচ্ছা-প্রসূত হইলেও উহা সাফল্যলাভ করিয়াছিল একথা বলা চলে না। কারণ, হেস্টিংস্ ব্যক্তিগত-ভাবে পূর্বেকার জমিদারগণের সহিত বন্দোবস্তের পক্ষপাতী থাকিলেও কার্যক্ষেত্রে যে সকল ব্যক্তি সর্বোচ্চ পরিমাণ রাজস্ব দিতে স্বীকৃত হইয়াছিল তাহাদের নিকট-ই জমিদারি বন্দোবস্ত দেওয়া হইয়াছিল। ফলে, দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন জমিদারগণ যেমন তাঁহাদের জমিদারি হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন, তেমনি

কোম্পানিও এই অভিজ্ঞ রাজস্ব-আদায়কারীদের সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছিল। হেস্টিংসের পঞ্চবার্ষিক বন্দোবস্তের পূর্বে জমিদারগণ প্রতি বৎসর-ই নূতন করিয়া বন্দোবস্ত গ্রহণ করিতেন বটে, কিন্তু তাঁহারা নিজ জমিদারি হইতে কোন কালেই বঞ্চিত হইতেন না। কিন্তু অভিজ্ঞ জমিদার শ্রেণীর স্থলে অধিক রাজস্বের লোভে যে-কোন ব্যক্তির সহিত রাজস্ব-বন্দোবস্ত এবং অনভিজ্ঞ ইংরাজ কর্মচারিবর্গের হস্তে রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব স্থাপন হেস্টিংসের রাজস্ব-ব্যবস্থার অসাফল্যের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসেই ডাইরেক্টর সভার নির্দেশক্রমে রেভিনিউ বোর্ড ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দের জমি-বন্দোবস্তের পরিবর্তনের প্রশ্ন আলোচনা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সেই সময়ে ওয়ারেন হেস্টিংস্ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা করিতে হইলে রাজস্ব-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করা প্রয়োজন হইবে দেখিয়া অস্থায়ী বন্দোবস্তই চালু রাখা স্থির হইয়াছিল। অবশ্য রাজস্ব আদায়-সংক্রান্ত কতক পরিবর্তন সেই সময়ে করা একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল। এজন্য বাংলা-বিহার-উড়িষ্যাকে ছয়টি অংশে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক অংশে একটি করিয়া 'প্রাদেশিক কাউন্সিল' (Provincial Council) স্থাপন করা হইল এবং প্রত্যেক কাউন্সিলের কার্যে সাহায্য করিবার জন্য একজন করিয়া দেশীয় দেওয়ান নিযুক্ত করা হইল। এই ব্যবস্থা চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতি জেলার কালেক্টর-পদ উঠাইয়া দেওয়া হইল। সুতরাং ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে কেবলমাত্র ইংরাজ কর্মচারিবর্গের হস্তে রাজস্ব আদায়ের যে ভার দেওয়া হইয়াছিল, তাহা ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজ ও দেশীয় উভয় প্রকার কর্মচারিবর্গের উপর ন্যস্ত করা হইল। এই কারণে হেস্টিংসের আমলে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার রাজস্ব-ব্যবস্থা প্রধানত পরীক্ষামূলকই ছিল, বলা যাইতে পারে। ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে হেস্টিংস্ 'আমিনী কমিশন' (Amini Commission) নিযুক্ত করিয়া রাজস্ব-সংক্রান্ত নানাপ্রকার মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং উহার পরিপ্রেক্ষিতে প্রাদেশিক কাউন্সিল উঠাইয়া দিয়া পুনরায় কালেক্টরদের নিয়োগ করিয়াছিলেন।

রাজস্ব-নীতির পরিবর্তন

হেস্টিংসের বিচার বিভাগীয় সংস্কার (Hastings' Judicial Reforms) : মোগল শাসন-ব্যবস্থায় দেওয়ানকে রাজস্ব আদায় এবং

জমি-সংক্রান্ত মামলা-মোকদ্দমার বিচার এই দুই প্রকার কর্তব্য সম্পাদন করিতে হইত। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজ কোম্পানি দেওয়ানী লাভ করিবার ফলে স্বভাবতই দেওয়ানী বিচারের দায়িত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। সুতরাং ব্রিটিশ শাসনের প্রথম দিকে রাজস্ব-ব্যবস্থার কোনপ্রকার ব্যাপক পরিবর্তনের অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবেই দেওয়ানী বিচার-ব্যবস্থারও পরিবর্তন অপরিহার্য ছিল। ফৌজদারী বিচারের দায়িত্ব ছিল নবাবের উপর। এজন্য ফৌজদারী বিচারের ক্ষেত্রে কোম্পানির কোনপ্রকার পরিবর্তনের ক্ষমতা ছিল না। তথাপি কোম্পানি ফৌজদারা বিচারের ক্ষেত্রেও পরোক্ষভাবে পরিবর্তন সাধনে দ্বিধা করিত না।

রাজস্ব ব্যবস্থার সহিত বিচার-ব্যবস্থার সংযোগ

১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংস্ নূতন রাজস্ব-ব্যবস্থা চালু করিয়াই বিচার বিভাগের সংস্কারে হস্তক্ষেপ করিলেন। Committee of Circuit-এর সুপারিশ অনুযায়ী প্রত্যেক জেলায় তিনি একটি দেওয়ানী ও একটি ফৌজদারী আদালত স্থাপন করিলেন। এগুলির নামকরণ হইল মফঃস্বল দেওয়ানী ও মফঃস্বল ফৌজদারী আদালত।

মফঃস্বল দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত

মফঃস্বল দেওয়ানী আদালত: জমিদারি ও তালুকদারির উত্তরাধিকারী-সংক্রান্ত মামলা-মোকদ্দমা ভিন্ন অপরাপর যাবতীয় দেওয়ানী মামলার বিচারের ভার এই আদালতের উপর ন্যস্ত করা হইল। এই আদালতের সভাপতিত্ব করিতেন কালেক্টর। জমিদারি ও তালুকদারির উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত মামলার বিচারক্ষমতা ছিল সদর দেওয়ানী আদালতের হস্তে। গবর্ণর ও তাঁহার কাউন্সিলের দুইজন সদস্য লইয়া এই আদালত গঠিত ছিল। কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়ামে এই বিচারালয় স্থাপিত ছিল। এই ব্যবস্থার ফলে পূর্বে জমিদারগণের যেটুকু দেওয়ানী বিচারের ক্ষমতা ছিল তাহা বাতিল হইয়া গেল।

সদর দেওয়ানী আদালত

মফঃস্বল ফৌজদারী আদালত: এই বিচারালয় যাবতীয় ফৌজদারী মামলার বিচার করিবার অধিকারপ্রাপ্ত ছিল। কেবলমাত্র যে সকল মোকদ্দমায়

আসামীকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হইত, সেই সকল মোকদ্দমা চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য সদর নিজামত আদালতে প্রেরণ করিতে হইত। নাজিম অর্থাৎ নবাব ছিলেন এই আদালতের সভাপতি। প্রাণদণ্ডাদেশ নবাব কর্তৃক অনুমোদন-সাপেক্ষ ছিল। ফৌজদারী আদালতে কাজী ও মুফ্‌তি দুইজন মৌলবীর সাহায্য লইয়া আইনের ব্যাখ্যা করিতেন। মফঃস্বল ফৌজদারী আদালতের উপরও কালেক্টরের পরিদর্শন-ক্ষমতা ছিল। সদর নিজামত আদালতে আইনের ব্যাখ্যার ভার ছিল প্রধান কাজী, প্রধান মুফ্‌তি ও তিনজন খ্যাতিসম্পন্ন মৌলবীর উপর। সদর নিজামত আদালত মুর্শিদাবাদে অবস্থিত ছিল। এই বিচারালয়ের উপরও ইংরাজগণের পরিদর্শন অধিকার ছিল।

সদর নিজামত আদালত

হেস্টিংসের অপরাপর সংস্কার (Other Reforms by Hastings): হেস্টিংস্ অপরাপর আরও কতকগুলি সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন। (১) প্রত্যেক বিচারালয়ে মামলা-সংক্রান্ত কাগজপত্রাদি রক্ষা করা, (২) অন্ততঃ ১২ বৎসরের মধ্যে মোকদ্দমা না করিলে মোকদ্দমা তামাদি হইয়া যাওয়া, (৩) দেনাদারকে পাওনাদারের নিজগৃহে লইয়া গিয়া নির্যাতন করিবার অধিকার নাকচ করা, (৪) অত্যধিক পরিমাণ অর্থ জরিমানা নিষিদ্ধ করা, (৫) সুদের হার একশত টাকা পর্যন্ত মাসিক শতকরা ৩৵৹ এবং একশত টাকার বেশি অর্থের জন্য মাসিক ২৲ টাকার নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া—প্রভৃতি কতিপয় ক্ষুদ্র অথচ গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার হেস্টিংস্ কর্তৃক গৃহীত হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন (৬) দেওয়ানী বিচারে হিন্দু প্রজার ক্ষেত্রে হিন্দু-ধর্মশাস্ত্রের এবং মুসলমান প্রজার ক্ষেত্রে কোরাণের বিধি-নিয়ম প্রয়োগের নীতি হেস্টিংস্ স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। (৭) বিচারপ্রার্থীদের নিকট হইতে পূর্বে কাজী, মুফ্‌তি প্রভৃতি অর্থ গ্রহণ করিতেন। হেস্টিংস্ এই নিয়ম উঠাইয়া দিয়া তাঁহাদিগকে নিয়মিত বেতন দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

বিবিধ ক্ষুদ্র অথচ গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার : হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম-বিধির স্বীকৃতি

হেস্টিংসের অত্যাচার (High-handedness of Hastings): রেগুলেটিং এ্যাক্ট্ অনুসারে ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে হেস্টিংস্ ভারতে ব্রিটিশ-অধিকৃত সাম্রাজ্যের গবর্ণর-জেনারেল নিযুক্ত হইলেন। গবর্ণর-জেনারেল-এর

কাউন্সিলের চারিজন সদস্যের মধ্যে ক্ল্যাভারিং, মন্‌সন্‌ ও ফ্রান্সিস্‌ ইংলণ্ড হইতে আসিলেন এবং কোম্পানির কলিকাতাস্থ কর্মচারিগণের মধ্য হইতে বার্‌ওয়েলকে চতুর্থ সদস্য নিযুক্ত করা হইল। বার্‌ওয়েল ভিন্ন অপর তিনজন সদস্য প্রথম হইতেই হেস্টিংসের বিরোধিতা শুরু করিলেন এবং কাউন্সিলে তাঁহারা সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ায় প্রকৃত শাসনক্ষমতা অনায়াসেই হস্তগত করিতে সমর্থ হইলেন। ফলে, হেস্টিংস্‌ ও এই সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মধ্যে এক তীব্র বিরোধিতার সৃষ্টি হইল। এই সময়ে অযোধ্যার নবাব সুজা-উদ্‌-দৌলার আকস্মিক মৃত্যুতে তাঁহার পুত্র আসফ্‌-উদ্‌-দৌলা নবাব-পদ লাভ করিয়াছিলেন। কলিকাতা কাউন্সিলের হেস্টিংস্‌-বিরোধী সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সুজা-উদ্‌-দৌলার মৃত্যুতে অযোধ্যার সহিত কোম্পানির স্বাক্ষরিত চুক্তি বাতিল হইয়া গিয়াছে এই অজুহাতে আসফ্‌-উদ্‌-দৌলাকে এক নূতন চুক্তি সম্পাদনে বাধ্য করিলেন (মে, ১৭৭৫)। এই চুক্তি অনুসারে আসফ্‌-উদ্‌-দৌলা কোম্পানিকে বানারস-এর জমিদারি এবং আরও বহুবিধ সুযোগ-সুবিধা দানে বাধ্য হইলেন। হেস্টিংস্‌ অবশ্য এই ব্যাপারে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সহিত একমত ছিলেন না।

হেস্টিংস্‌ ও তাঁহার কাউন্সিলের মধ্যে বিরোধ

আসফ্‌-উদ্‌-দৌলার সহিত চুক্তি (১৭৭৫)

যাহা হউক, হেস্টিংসের সহিত তাঁহার কাউন্সিলের বিরোধ উপস্থিত হইলে হেস্টিংসের বিরুদ্ধে নানাপ্রকারের অভিযোগ কাউন্সিলের নিকট উপস্থিত হইতে লাগিল।

হেস্টিংসের বিরুদ্ধে অভিযোগ

(১) বর্ধমানের রাণীর অভিযোগ (Complaint of the Rani of Burdwan) : বর্ধমানের রাজা তিলক চাঁদের মৃত্যুর পর তাঁহার রাণী তাঁহার নাবালক পুত্রের অভিভাবিকা নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু কলিকাতা কাউন্সিল সেই ব্যবস্থা নাকচ করিয়া দিয়া ব্রজকিশোর নামে জনৈক ব্যক্তিকে সেই স্থলে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। রাণী কাউন্সিলের নিকট (ডিসেম্বর, ১৭৭৪) অভিযোগ করিলেন যে, ব্রজকিশোর যথেচ্ছভাবে বর্ধমান রাজসম্পত্তির অপচয় করিতেছেন এবং এই ব্যাপারেও ইংরাজ রেসিডেণ্টও লিপ্ত আছেন। কাউন্সিল হেস্টিংসের তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও ব্রজকিশোরকে বর্ধমান রাজসম্পত্তির আয়-ব্যয়ের হিসাব দাখিল করিতে বাধ্য করিলেন। এই হিসাবে হেস্টিংসকে

হেস্টিংসের বিরুদ্ধে উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগ

পনর হাজার টাকা এবং তাঁহার দেশীয় সেক্রেটারা কানাইলালবাবুকে পাঁচ হাজার এবং কানাইলালবাবুর সহকারীকে পাঁচ শত টাকা ঘুষ দেওয়া হইয়াছে বলিয়া লিখিত ছিল।* হেস্টিংস্ কাউন্সিলের সদস্যগণ কর্তৃক এবিষয়ে তদন্তের তীব্র বিরোধিতা করিয়া নিজের বিরুদ্ধে সন্দেহ গভীরতর করিয়া তুলিয়াছিলেন।

(২) রাণী ভবানীর অভিযোগ (Complaint of Rani Bhavani): হেস্টিংসের আমলে রাণী ভবানীর ন্যায় পুণ্যশ্লোকা মহীয়সী নারীর সম্পত্তিও যে কোম্পানির স্বার্থপরতা হইতে নিস্তার পায় নাই তাহা কাউন্সিলের নিকট রাণী ভবানীর দরখাস্ত হইতে জানিতে পারা যায়। ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশে যে মন্বন্তর দেখা দিয়াছিল তাহার ফলে বাংলার এক-তৃতীয়াংশ লোক যেমন মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল তেমনি প্রায় এক-তৃতীয়াংশ স্থানও জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। রাণী ভবানীর জমিদারি ছিল রাজসাহীতে। তাঁহার প্রজাবর্গও মন্বন্তরের প্রকোপ হইতে রক্ষা পায় নাই। তদুপরি ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দের প্লাবনে ফসল নষ্ট হইলে রাণী ভবানী প্রজাবর্গকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে খাজনা আদায় করা বন্ধ করিয়াছিলেন। প্রজাবর্গের অবস্থার পরিবর্তন হইলে অনাদায়িকৃত খাজনা গ্রহণে তিনি স্বেচ্ছায় স্বীকৃত হওয়ায় সরকারি খাজনা দিতে বিলম্ব হইয়াছিল।† এই কারণে রাণী ভবানীর প্রাসাদ ঘেরাও করিয়া তাঁহার নিকট হইতে মোট ২২,৫৮,৬৭৪ টাকা লইয়া যাওয়া হইয়াছিল।

রাণী ভবানীকে জমিদারিচ্যুত করিবার অভিযোগ

---

* Vide Beveridge: *Trial of Nun Coomer,* pp. 120-25.

R. C. Dutt: *Economic History of British India,* pp. 62-64.

† "I am Zamindar, so was obliged to keep the ryots from ruin and gave what ease to them I could, by giving them time to make up their payments; and requested the gentlemen (English officials) would in same manner give me time.........but not crediting me they were pleased to take the *cutchery* from my house.........Then my house was surrounded, and all my property enquired into; what collections I had made as farmer and zamindar were taken; what money I borrowed and my monthly allowances were taken and made together Rs. 22,58,674 (£ 226,000)". *Rani Bhavani's letter to the Council, Select Committee's Eleventh Report 1783, Appendix O.*

Also Vide R. C. Dutt, pp. 65-67.

ইহার পর ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে দুলাল রায় নামক জনৈক ব্যক্তিকে রাজসাহীর জমিদারি দেওয়া হইয়াছিল। রাণী ভবানী কলিকাতা কাউন্সিলের নিকট দরখাস্ত করিলে ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে হেস্টিংসের বিরোধিতা সত্ত্বেও সংখ্যাগরিষ্ঠ দল দুলাল রায়কে অপসারিত করিয়া রাণী ভবানীকে তাঁহার জমিদারি ফিরাইয়া দিয়াছিলেন।

(৩) নন্দকুমারের অভিযোগ (Complaint of Nanda Kumar) : হেস্টিংস্ মিরজাফরের পত্নী মণি বেগমের নিকট হইতে তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা ঘুষ লইয়াছেন, এই কথা নন্দকুমার কলিকাতা কাউন্সিলের নিকট এক অভিযোগ-পত্রে জানাইলে কাউন্সিলের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল এই অভিযোগের তদন্ত করিতে চাহিলেন। হেস্টিংস্ কাউন্সিলের সভা ভাঙ্গিয়া দিয়া বার্ওয়েল-এর সহিত সভাকক্ষ ত্যাগ করিয়া গেলেন। এই ব্যাপারে হেস্টিংসের আচরণ সম্পর্কে পরস্পর-বিরোধী নানাপ্রকার মত রহিয়াছে। ঐতিহাসিক মিল, কোম্পানির কৌঁসুলী (Counsel), সেয়ার (Sayer) প্রভৃতি অনেকের মতে হেস্টিংস্ এইরূপ অভিযোগের তদন্তে বাধাদান করিয়া নিজের দোষ প্রমাণিত করিয়াছিলেন। উইলসন প্রভৃতি ঐতিহাসিকের মতে হেস্টিংস্ কাউন্সিলের তদন্তের পদ্ধতির বিরোধিতা করিয়াছিলেন মাত্র। নন্দকুমারের অভিযোগ সম্পর্কেও মতানৈক্য রহিয়াছে। সার্ জেমস্ স্টিফেন্ (Sir James Stephen), ফরেস্ট্ (Forrest), ট্রাটার (Trotter) প্রভৃতি ঐতিহাসিক এই অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। অপরপক্ষে বার্ক (Burke), ইলিয়ট (Elliot), বেভারিজ (Beveridge) প্রভৃতি সমসাময়িক ও পরবর্তী রাজনীতিক ও ঐতিহাসিকদের মতে নন্দকুমারের অভিযোগ মূলতঃ সত্য ছিল।

হেস্টিংসের বিরুদ্ধে নন্দকুমারের অভিযোগ

নন্দকুমারের অভিযোগের অব্যবহিত পরেই কামাল-উদ্দিন নামে জনৈক ব্যক্তি যোসেফ ফৌক, ফ্রান্সিস্ ফৌক (Joseph and Francis Fowke) ও নন্দকুমারের বিরুদ্ধে হেস্টিংসের নিকট এক অভিযোগ করিয়াছিল। এই অভিযোগে বলা হইয়াছিল যে, নন্দকুমার, যোসেফ ও ফ্রান্সিস ফৌক কামাল-উদ্দিনকে

নন্দকুমারের বিরুদ্ধে কামাল-উদ্দিনের অভিযোগ

বলপূর্বক হেস্টিংসের বিরুদ্ধে উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগ-সম্বলিত একখানা কাগজ সহি করাইয়া লইয়াছেন। ফলে, নন্দকুমার, যোসেফ ও ফ্রান্সিস্ ফৌক, তিনজনকেই গ্রেপ্তার করা হইল এবং জামিনে মুক্তি দেওয়া হইল। কামাল-উদ্দিনের অভিযোগের বিচার হইবার পূর্বেই মোহনপ্রসাদ নামক এক ব্যক্তি নন্দকুমারকে জাল করিবার অভিযোগে অভিযুক্ত করিল (৬ই মে, ১৭৭৫)। বলাকী দাস নামে জনৈক মহাজন (Native Banker)-এর নিকট নন্দকুমার কতকগুলি মণিমুক্তা বিক্রয়ের জন্য দিয়াছিলেন। ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানি বলাকী দাসের নিকট হইতে তিন লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করিয়াছিল। এই ঋণ আদায়ের পূর্বেই বলাকী দাসের মৃত্যু আসন্ন প্রায় হইয়া উঠিলে তিনি রাজা নন্দকুমারের উপর নিজ পরিবারের দায়িত্ব এবং একটি উইল দ্বারা কোম্পানির নিকট হইতে তাঁহার যাবতীয় প্রাপ্য আদায়ের ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। ইহার অল্পকালের মধ্যেই বলাকী দাসের মৃত্যু হইলে (১৭৬৯) নন্দকুমার তাঁহার বিপন্ন পরিবারের সুবিধার্থে কোম্পানির নিকট হইতে প্রাপ্য তিন লক্ষ টাকা আদায় করেন। এই টাকা হইতে নন্দকুমার নিজ মণিমুক্তার মূল্য বাবদ ৪৮,০২১ টাকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই টাকার সংশ্লিষ্ট কাগজ (bond)-ই জাল বলিয়া অভিযোগ করা হইয়াছিল এবং বিচারে নন্দকুমার প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন।

নন্দকুমার জাল করিবার অভিযোগে অভিযুক্ত

নন্দকুমারের বিচার এমন সন্দেহজনকভাবে সম্পন্ন করা হইয়াছিল যে, সেই সময় হইতে অদ্যাবধি তিনি রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের ফলে প্রাণ হারাইয়াছিলেন এই ধারণা সাধারণ্যে বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে। বেভারিজ (Beveridge), সার আলফ্রেড লায়েল (Sir Alfred Lyall) প্রমুখ ঐতিহাসিকদের মতে হেস্টিংসের বিরুদ্ধে কাউন্সিলের নিকট যখন একের পর এক করিয়া অভিযোগ উপস্থাপিত হইতেছিল তখন এগুলি বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে হেস্টিংস্‌কেও নন্দকুমারের ফাঁসির ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল। ভবিষ্যতে কোন ব্যক্তি যাহাতে হেস্টিংসের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে সাহস না পায় সেইজন্য এইরূপ ব্যবস্থার প্রয়োজন ছিল। নন্দকুমারের প্রতি হেস্টিংসের আচরণ, হেস্টিংসের নিকট

নন্দকুমারের প্রাণদণ্ডের মূল কারণ

নন্দকুমারের ফাঁসির ব্যাপারে হেস্টিংসের দায়িত্ব

নন্দকুমারের মৃত্যুর প্রয়োজনীয়তা, নন্দকুমার কর্তৃক হেস্টিংসের বিরুদ্ধে উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগের পর হেস্টিংসের আচরণ এবং হেস্টিংসের কয়েকটি উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিয়া দেখিলে নন্দকুমারের ফাঁসির জন্য হেস্টিংসই যে প্রধানত দায়ী ছিলেন তাহাতে সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

নন্দকুমারের প্রতি হেস্টিংসের মনোভাব

হেস্টিংসের ব্যক্তিগত পত্রাবলীতে নন্দকুমারের প্রতি তাঁহার বিদ্বেষভাবের প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁহার পত্রাবলীর দুইটিতে তিনি নন্দকুমারকে ব্যক্তিগত শত্রু বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। এই দুইখানা পত্রে এইরূপ লেখা হইয়াছিল: "From the year 1759 to the date when I left Bengal in 1764. I was engaged in a continued opposition to the interest and designs of that man (Nanda Kumar) because I judged him to be averse to the interest of my employer"; "I was never the personal enemy of any man but Nanda Kumar whom from my soul I detested, even when I was compelled to countenance him."*

হেস্টিংসের নিকট নন্দকুমারের মৃত্যুর প্রয়োজনীয়তা

হেস্টিংসের মর্যাদা ও স্বার্থরক্ষার জন্য নন্দকুমারের মৃত্যু যে একান্ত প্রয়োজন ছিল সেকথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। কারণ, নন্দকুমার কর্তৃক হেস্টিংসের বিরুদ্ধে উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগের অল্পকাল পূর্বে হুগলীর ফৌজদার এবং মণিবেগমের ব্যয়ের হিসাব হইতেও হেস্টিংসের উৎকোচ গ্রহণের কথা কাউন্সিলের দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। নন্দকুমারের ন্যায় মর্যাদাশালী ব্যক্তিকে চরম শাস্তি দিতে পারিলে কাউন্সিলের নিকট হেস্টিংসের বিরুদ্ধে আর অভিযোগ পেশ করিবার সাহস কাহারও থাকিবে না এই ছিল হেস্টিংসের ধারণা।

হেস্টিংসের বিরুদ্ধে নন্দকুমারের অভিযোগ কাউন্সিলের সম্মুখে উত্থাপিত

* Gleig quoted by Beveridge, *Trial of Nun Coommer*, pp. 91-100.

হওয়ার পর নিজ মর্যাদা ও সততার খাতিরেও হেস্টিংসের পক্ষে তদন্তে স্বীকৃত হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তিনি প্রথম হইতেই তদন্তের বিরোধিতা শুরু করিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন এই অভিযোগের অব্যবহিত পরে হেস্টিংস্ গবর্ণর-জেনারেল-পদ ত্যাগ করিয়াছিলেন (২৭ মার্চ, ১৭৭৫) এবং তাঁহার পদত্যাগ কাউন্সিল কর্তৃক গৃহীত হওয়ার অপেক্ষায় ছিলেন। কিন্তু নন্দকুমারকে জালিয়াতির অভিযোগে অভিযুক্ত করিতে সমর্থ হইয়াই (১৮ মে, ১৭৭৫) হেস্টিংস্ গবর্ণর-জেনারেল-পদে নিযুক্ত থাকিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে তাঁহার এক পত্রে তিনি মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, নন্দকুমারকে 'আপাতদৃষ্টিতে আইনসম্মতভাবেই ফাঁসি-কাষ্ঠে ঝুলাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে' (*In a fair way to be hanged*)। বলা বাহুল্য নন্দকুমারের বিচার তখনও শেষ হয় নাই।

নন্দকুমার কর্তৃক হেস্টিংসের বিরুদ্ধে অভিযোগের তদন্তের ব্যাপারে হেস্টিংসের আচরণ

ইহা ভিন্ন, হেস্টিংস্ তাঁহার অন্তরঙ্গ সুহৃদ সুলিভান (Sulivan)-এর নিকট পত্রে লিখিয়াছিলেন যে, সার এলিজা ইম্পে একদিন তাঁহার নিরাপত্তা, ভাগ্য, সম্মান ও মর্যাদা সবকিছুই রক্ষা করিয়া তাঁহাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছিলেন (...Sir Elijah Impey a man *to whose support he was one day indebted for the safety of his fortune, honour and reputation*)। ডানিং (Dunning)-এর নিকট এক পত্রে সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ইম্পে লিখিয়াছিলেন, 'আমি একদিন হেস্টিংসকে সাহায্য করিয়াছিলাম, সেজন্য তিনি এখন আমাকে ন্যায়-অন্যায় বিচার না করিয়াই সাহায্য করিতে বাধ্য।' *(I helped Hastings once and therefore he is bound to help me now whether I am right or wrong)*। এই সকল উক্তি হইতে নন্দকুমারের ফাঁসির ব্যাপারে প্রধান বিচারপতি সার এলিজা ইম্পের অসদাচরণের পরিচয় পাওয়া যায়, বলা বাহুল্য। কারণ নন্দ-কুমারের বিচারকালে ইম্পে প্রথম হইতেই পক্ষপাতিত্বের পরিচয় দানে দ্বিধা-বোধ করেন নাই। হেস্টিংসের অনুচর এলিয়ট (Elliot)-কে নন্দকুমারের বিচারের দোভাষী (interpreter) নিয়োগে নন্দকুমার আপত্তি জানাইলেও

সার এলিজা ইম্পের সহায়তার প্রমাণ

এলিজা ইম্পে তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই। বিচারে নন্দকুমারের ফাঁসির আদেশ হইলে তাঁহার কৌঁসুলী ফ্যারার (Farrer) নন্দকুমারের প্রাণভিক্ষার জন্য দরখাস্ত করিলে ইম্পে তাহা ঘৃণাভরে অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন। এমন কি, বাংলার নবাব নন্দকুমারের প্রাণরক্ষার জন্য আবেদন করিয়াও অকৃতকার্য হইয়াছিলেন। হেস্টিংসের ইম্পীচ্‌মেণ্টে সাক্ষ্য দিবার কালে ফ্যারার নন্দকুমারের বিচারে ইম্পে এবং অপরাপর বিচারপতিগণ যে নন্দকুমারের পক্ষের সাক্ষীদিগকে অযথা নাজেহাল করিয়াছিলেন একথা বলিয়াছিলেন। বস্তুত, ইম্পে বিচারকালে, নন্দকুমারের বিরুদ্ধে এমন সব মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, নন্দকুমার স্বপক্ষ সমর্থন করিবার চেষ্টা অর্থহীন হইবে মনে করিয়া নিজ ভাগ্যের উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকিবেন কিনা সেবিষয়ে ভাবিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

এলিজা ইম্পের পক্ষপাতিত্ব

সর্বশেষে, বিচারে নন্দকুমারের দোষ যদি প্রমাণিত হইত তবুও তাঁহাকে যে আইনতঃ ফাঁসি দেওয়া সম্ভব ছিল না সেবিষয়ে দ্বিমত নাই। ভারতীয়দের ক্ষেত্রে বিলাতী আইন প্রযোজ্য ছিল না একথা ইম্পে বা তাঁহার সহকর্মিগণ উপলব্ধি করিলেন না, বা করিলেও হেস্টিংসকে সাহায্য করিতে গিয়া ধর্মাধিকরণের পবিত্রতা বিনষ্ট করিয়াও নন্দকুমারকে ফাঁসি দিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিগণ জাল করিবার অপরাধে নন্দকুমারের ফাঁসি দেওয়া আইনবিরুদ্ধ হইয়াছিল একথা স্বীকার করিয়াছিলেন। স্বভাবতই নন্দকুমারের ফাঁসি Judicial murder হিসাবেই বিবেচ্য।

নন্দকুমারের ফাঁসি আইন-বিরোধী—judicial murder

চৈৎ সিংহ-এর প্রতি হেস্টিংসের আচরণ (Hastings' treatment of Chait Singh) : ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে অযোধ্যার নবাবের সহিত কোম্পানির চুক্তির শর্তানুসারে বারাণসী কোম্পানির প্রাধান্যাধীনে স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু এই চুক্তিতে বারাণসীর রাজার উপর কোম্পানির কেবলমাত্র বাৎসরিক কর ভিন্ন অপর কোনপ্রকার দাবি থাকিবে না এই শর্তটি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হইয়াছিল। কিন্তু মারাঠা ও ফরাসীদের সহিত যুদ্ধপরিচালনার জন্য অর্থের অনটন ঘটিলে হেস্টিংস্‌ বারাণসীর রাজা চৈৎ সিংহের

নিকট পাঁচ লক্ষ টাকা অর্থ সাহায্য চাহিলেন। প্রথমে রাজা চৈৎ সিংহ আপত্তি জানাইলেও শেষ পর্যন্ত কেবলমাত্র একবারের জন্যই অর্থ সাহায্য দিতে রাজী হইলেন (১৭৭৮)। কিন্তু পর বৎসরও (১৭৭৯) চৈৎ সিংহের নিকট পুনরায় অর্থ দাবি করা হইল। রাজা অর্থদানে অক্ষমতা জানাইলে হেস্টিংস্ তাঁহার রাজ্যে সৈন্য প্রেরণ করিয়া মোট দাবির উপরে আরও ২০০০ পাউণ্ড জরিমানা হিসাবে আদায় করিলেন। ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দেও হেস্টিংস্ পূর্বের মত অর্থ দাবি করিলেন। চৈৎ সিংহ হেস্টিংস্‌কে দুই লক্ষ টাকা উপহার হিসাবে প্রেরণ করিয়া তাঁহার অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু হেস্টিংস্ দুই লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করিয়াও রাজাকে নিষ্কৃতি দিলেন না। তারপর চৈৎ সিংহকে বাৎসরিক কর ভিন্ন আরও পাঁচ লক্ষ টাকা দিতে বলা হইল, তদুপরি দুই হাজার অশ্বারোহী সৈন্যও কোম্পানির ব্যবহারের জন্য দিতে বলা হইল।* চৈৎ সিংহের আপত্তিতে অবশ্য উহা এক হাজারে নামিল। চৈৎ সিংহ পাঁচ শত অশ্বারোহী এবং পাঁচ শত পদাতিক সৈন্য যোগাড় করিয়া কোম্পানিকে জানাইলেন, কিন্তু উহার কোন উত্তর তিনি পাইলেন না। হেস্টিংস্ চৈৎ সিংহের অশ্বারোহী সৈন্য যোগাড় করিবার অক্ষমতা ও বিলম্বের অজুহাতে তাঁহাকে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা জরিমানা করিতে মনস্থ করিলেন। শেষ পর্যন্ত কাউন্সিলের অনুমতিক্রমে হেস্টিংস্ স্বয়ং বারাণসীতে উপস্থিত হইয়া রাজা চৈৎ সিংহের নিকট কৈফিয়ৎ চাহিলেন। রাজার কৈফিয়ৎ পাইয়া তিনি উহা অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহাকে গ্রেপ্তারের আদেশ দিলেন। চৈৎ সিংহ উপযুক্ত বাৎসরিক ভাতার বিনিময়ে বারাণসীর জমিদারিও ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। রাজাকে এইভাবে অপমান করিলে রামনগর হইতে একদল সশস্ত্র প্রজা হেস্টিংসের সেনাদলকে আক্রমণ করিল। হেস্টিংস্ প্রাণের ভয়ে চুণারে পলায়ন করিলেন। এই গোলযোগে রাজা চৈৎ সিংহ ইংরাজদের হাত

চৈৎ সিংহের উপর হেস্টিংসের দাবি

হেস্টিংস্ কর্তৃক রাজা চৈৎ সিংহের গ্রেপ্তার

* Macaulay says : "Hastings was determined to plunder Chait Singh and for that end to fasten a quarrel on him. Accordingly the Raja was now required to keep a body of cavalry for the services of Govt." Vide Forrest, Vol. III, p. 783.

হইতে পলাইয়া লতিফগড় নামক স্থানে চলিয়া গেলেন। ইহার পর তাঁহার ও ইংরাজ সেনাবাহিনীর মধ্যে পতিতা নামক স্থানে এক যুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধে চৈৎ সিংহের সেনাবাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইল। হেস্টিংস্ পুনরায় বারাণসীতে উপস্থিত হইয়া চৈৎ সিংহের জনৈক আত্মীয় মহীপ নারায়ণকে চৈৎ সিংহ যে পরিমাণ কর দিতেন উহার দ্বিগুণ বাৎসরিক করদানের শর্তে বারাণসীর জমিদারি অর্পণ করিলেন। কলিকাতার কাউন্সিল হেস্টিংসের তৎপরতার প্রশংসা করিয়া তাঁহার চৈৎ সিংহ-সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যের অনুমোদন করিলেন।

চৈৎ সিংহের পদচ্যুতি

চৈৎ সিংহ জমিদার হইলেও তাঁহার কতকগুলি বিশেষ অধিকার ছিল। কোম্পানির সহিত করদান ভিন্ন অন্য কোনপ্রকার সম্পর্ক তাঁহার থাকিবে না, এই শর্ত ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দের চুক্তিতে স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ ছিল। আর এই শর্তের কথা বাদ দিলেও অপরাপর জমিদারগণের নিকট যখন কোনপ্রকার অর্থ বা সামরিক সাহায্য দাবি করা হয় নাই ঠিক সেই সময়ে একমাত্র চৈৎ সিংহের নিকট পুনঃপুনঃ অর্থদাবির কোন যুক্তি হেস্টিংস্ প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। হেস্টিংসের কাউন্সিলের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল যখন প্রকৃত শাসনক্ষমতা হস্তগত করিয়া লইয়াছিলেন তখন চৈৎ সিংহ তাঁহাদের নিকট একবার উপহার প্রেরণ করিয়াছিলেন। সেই সময় হইতেই হেস্টিংস্ চৈৎ সিংহকে তাঁহার ব্যক্তিগত শত্রু বলিয়া মনে করিতেন। ব্যক্তিগত আক্রোশবশতঃই যে হেস্টিংস্ চৈৎ সিংহের প্রতি ঐরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন সেবিষয়ে সন্দেহ নাই।* ইহা ভিন্ন আইনত কোম্পানি চৈৎ সিংহের নিকট

হেস্টিংসের আক্রোশ ও প্রতিহিংসা-পরায়ণতা

* হেস্টিংস-এর ইম্পীচ্‌মেণ্ট-এর সময় বার্ক (Burke) হেস্টিংসের নিম্নলিখিত চিঠির উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, ইহাতেই আক্রোশ ও প্রতিহিংসাপরায়ণতার সুস্পষ্ট পরিচয় রহিয়াছে: "So long as I conceive Chait Singh's misconduct and contumacy to have me rather than the Company for its object, I looked upon a considerable file as sufficient both for his immediate punishment and binding him to future good behaviour."—*Hastings*.

বাৎসরিক করের অধিক কোন অর্থ দাবি করিতে পারিতেন কিনা সেবিষয়েও সন্দেহ আছে।

অযোধ্যার বেগমদের প্রতি হেস্টিংসের আচরণ (Hastings' treatment of the Begums of Oudh): বারাণসীর রাজা চৈৎ সিংহের উপর অত্যাচার করিয়াও যখন হেস্টিংস্ যথেষ্ট অর্থ সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইলেন না, তখন তিনি অযোধ্যার বেগমদের সঞ্চিত অর্থের উপর দৃষ্টি দিলেন। সুজা-উদ্-দৌলার স্ত্রী এবং মাতা, অযোধ্যার বেগম নামে অভিহিত। সুজা-উদ্-দৌলার মৃত্যুর পর উভয় বেগম তাঁহাদের নিজেদের ব্যয় সংকুলানের জন্য জায়গীর ভোগ করিতেছিলেন। ইহাই ছিল সেই সময়কার রীতি। বেগমদের নিজস্ব মণিমুক্তা এবং সঞ্চিত অর্থ যথেষ্ট ছিল। আসফ্-উদ্-দৌলা ক্রমেই যখন কোম্পানির প্রাপ্য অর্থ মিটাইতে না পারিয়া অধিকতর ঋণগ্রস্ত হইতে লাগিলেন তখন তিনি নিজ মাতা ও পিতামহীর অর্থের উপর দৃষ্টি দিলেন। হেস্টিংস্‌ও তাঁহাকে এবিষয়ে সাহায্য করিতে লাগিলেন। ক্রমে অতিষ্ঠ হইয়া সুজা-উদ্-দৌলার বেগম, অর্থাৎ আসফ্-উদ্-দৌলার মাতা তাঁহাকে ত্রিশ লক্ষ টাকা দিয়া কোম্পানির নিকট হইতে এই প্রতিশ্রুতি আদায় করিলেন যে, ভবিষ্যতে কোম্পানি অথবা আসফ্-উদ্-দৌলা তাঁহাকে অর্থের জন্য বিরক্ত করিবেন না। ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে অযোধ্যার বেগমরা চৈৎ সিংহের বিদ্রোহাত্মক আচরণের সমর্থন করিয়াছিলেন এই অজুহাতে কোম্পানি বেগমদের রক্ষা করিবার প্রতিশ্রুতি প্রত্যাহার করিলেন। তারপর অযোধ্যার ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট্ মিড্‌লটনের স্থলে অধিকতর অত্যাচারী ব্রিটিশ কর্মচারী ব্রিস্টো (Bristow)-কে নিযুক্ত করা হইল। বেগমদের দেওয়ান ও খোজাদের (Eunuchs) বন্দী করিয়া রাখিয়া নানাভাবে নির্যাতন করা হইল। হেস্টিংস্ আসফ্-উদ্-দৌলার মতের বিরুদ্ধেই একদল ব্রিটিশ সৈন্য অযোধ্যায় প্রেরণ করিয়া বেগমদের ভীতি প্রদর্শন করিলেন। বেগমদ্বয়ের যাবতীয় ধনরত্ন বলপূর্বক আদায় করা হইল। এইভাবে অর্থের জন্য নিরীহ বৃদ্ধা বেগমদের উপর অত্যাচার করিতেও হেস্টিংস্ দ্বিধাবোধ করিলেন না।

বেগমদের পরিচয়

বেগমদের উপর অত্যাচার

ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির ভারতীয় শাসন-ব্যবস্থায় ব্রিটিশ পার্লামেন্টের হস্তক্ষেপ (Parliamentary interference in the Indian Affairs of the E. I. Co.):

রেগুলেটিং এ্যাক্ট্, ১৭৭৩ (Regulating Act, 1773): ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির গঠনতন্ত্র ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত চার্টার (Charter)-এর উপর নির্ভরশীল ছিল। বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা দান করাই ছিল চার্টার-এর উদ্দেশ্য। কিন্তু ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের পর কোম্পানি ক্রমে বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান হইতে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইলে স্বভাবতই পূর্বেকার চার্টার-এর উপর ভিত্তি করিয়া কোম্পানির কার্যাদি পরিচালনার অসুবিধা দেখা দিল। ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির গঠনতন্ত্র পরিবর্তিত পরিস্থিতির প্রয়োজন মিটাইবার পক্ষে যথেষ্ট নহে বিবেচনা করিয়া এবং কোম্পানির কর্মচারিবর্গের অন্যায় অত্যাচার বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে রেগুলেটিং এ্যাক্ট্ (Regulating Act) নামে একটি আইন ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কর্তৃক গৃহীত হইল।

রেগুলেটিং এ্যাক্ট্-এর প্রয়োজনীয়তা

কোম্পানির ইংলণ্ডস্থ ডাইরেক্টর সভা (Board of Directors) এবং শেয়ার-হোল্ডারদের সভার (Court of Proprietors) গঠনতন্ত্রের সংস্কার সাধন করা হইল। পূর্বেকার পাঁচশত পাউণ্ডের শেয়ার-হোল্ডারদের ভোট-দানের ক্ষমতা নাকচ করিয়া অন্ততঃ এক হাজার পাউণ্ডের শেয়ার-হোল্ডারগণকে একটি করিয়া ভোট দিবার ক্ষমতা দেওয়া হইল। তিন, ছয় ও দশ হাজার পাউণ্ডের শেয়ার-হোল্ডারগণকে যথাক্রমে দুই, তিন ও চারটি ভোট দিবার অধিকার দেওয়া হইল। এইভাবে কোম্পানিতে যাহার অধিক অর্থ জড়িত আছে তাহাকে অধিক ক্ষমতাদানের নীতি স্বীকৃত হইল। ইহা ভিন্ন ডাইরেক্টর সভাকে শেয়ার-হোল্ডারগণের সভা হইতে কতকটা স্বাধীন করিয়া দেওয়া হইল। ২৪ জন ডাইরেক্টরের মধ্যে ছয়জন প্রতি বৎসর পদত্যাগ করিবেন এবং সেই স্থলে নূতন সদস্য নির্বাচিত হইবেন। ভবিষ্যতে গবর্ণর-জেনারেল ও কাউন্সিলের সদস্যগণ কোম্পানির ডাইরেক্টর সভা কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন, কিন্তু সে ক্ষেত্রেও

কোম্পানির গঠনতন্ত্রের পরিবর্তন

বাৎসরিক করের অধিক কোন অর্থ দাবি করিতে পারিতেন কিনা সেবিষয়েও সন্দেহ আছে।

অযোধ্যার বেগমদের প্রতি হেস্টিংসের আচরণ (Hastings' treatment of the Begums of Oudh) : বারাণসীর রাজা চৈৎ সিংহের উপর অত্যাচার করিয়াও যখন হেস্টিংস্ যথেষ্ট অর্থ সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইলেন না, তখন তিনি অযোধ্যার বেগমদের সঞ্চিত অর্থের উপর দৃষ্টি দিলেন। সুজা-উদ্-দৌলার স্ত্রী এবং মাতা, অযোধ্যার বেগম নামে অভিহিত। সুজা-উদ্-দৌলার মৃত্যুর পর উভয় বেগম তাঁহাদের নিজেদের ব্যয় সংকুলানের জন্য জায়গীর ভোগ করিতেছিলেন। ইহাই ছিল সেই সময়কার রীতি। বেগমদের নিজস্ব মণিমুক্তা এবং সঞ্চিত অর্থ যথেষ্ট ছিল। আসফ্-উদ্-দৌলা ক্রমেই যখন কোম্পানির প্রাপ্য অর্থ মিটাইতে না পারিয়া অধিকতর ঋণগ্রস্ত হইতে লাগিলেন তখন তিনি নিজ মাতা ও পিতামহীর অর্থের উপর দৃষ্টি দিলেন। হেস্টিংস্ও তাঁহাকে এবিষয়ে সাহায্য করিতে লাগিলেন। ক্রমে অতিষ্ঠ হইয়া সুজা-উদ্-দৌলার বেগম, অর্থাৎ আসফ্-উদ্-দৌলার মাতা তাঁহাকে ত্রিশ লক্ষ টাকা দিয়া কোম্পানির নিকট হইতে এই প্রতিশ্রুতি আদায় করিলেন যে, ভবিষ্যতে কোম্পানি অথবা আসফ্-উদ্-দৌলা তাঁহাকে অর্থের জন্য বিরক্ত করিবেন না। ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে অযোধ্যার বেগমরা চৈৎ সিংহের বিদ্রোহাত্মক আচরণের সমর্থন করিয়াছিলেন এই অজুহাতে কোম্পানি বেগমদের রক্ষা করিবার প্রতিশ্রুতি প্রত্যাহার করিলেন। তারপর অযোধ্যার ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট্ মিড্লটনের স্থলে অধিকতর অত্যাচারী ব্রিটিশ কর্মচারী ব্রিস্টো (Bristow)-কে নিযুক্ত করা হইল। বেগমদের দেওয়ান ও খোজাদের (Eunuchs) বন্দী করিয়া রাখিয়া নানাভাবে নির্যাতন করা হইল। হেস্টিংস্ আসফ্-উদ্-দৌলার মতের বিরুদ্ধেই একদল ব্রিটিশ সৈন্য অযোধ্যায় প্রেরণ করিয়া বেগমদের ভীতি প্রদর্শন করিলেন। বেগমদ্বয়ের যাবতীয় ধনরত্ন বলপূর্বক আদায় করা হইল। এইভাবে অর্থের জন্য নিরীহ বৃদ্ধা বেগমদের উপর অত্যাচার করিতেও হেস্টিংস্ দ্বিধাবোধ করিলেন না।

বেগমদের পরিচয়

বেগমদের উপর অত্যাচার

ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির ভারতীয় শাসন-ব্যবস্থায় ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের হস্তক্ষেপ (Parliamentary interference in the Indian Affairs of the E. I. Co.) :

রেগুলেটিং এ্যাক্ট্, ১৭৭৩ (Regulating Act, 1773) : ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির গঠনতন্ত্র ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত চার্টার (Charter)-এর উপর নির্ভরশীল ছিল। বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা দান করাই ছিল চার্টার-এর উদ্দেশ্য। কিন্তু ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের পর কোম্পানি ক্রমে বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান হইতে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইলে স্বভাবতই পূর্বেকার চার্টার-এর উপর ভিত্তি করিয়া কোম্পানির কার্যাদি পরিচালনার অসুবিধা দেখা দিল। ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির গঠনতন্ত্র পরিবর্তিত পরিস্থিতির প্রয়োজন মিটাইবার পক্ষে যথেষ্ট নহে বিবেচনা করিয়া এবং কোম্পানির কর্মচারিবর্গের অন্যায় অত্যাচার বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে রেগুলেটিং এ্যাক্ট্ (Regulating Act) নামে একটি আইন ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট কর্তৃক গৃহীত হইল।

রেগুলেটিং এ্যাক্ট্-এর প্রয়োজনীয়তা

কোম্পানির ইংলণ্ডস্থ ডাইরেক্টর সভা (Board of Directors) এবং শেয়ার-হোল্ডারদের সভার (Court of Proprietors) গঠনতন্ত্রের সংস্কার সাধন করা হইল। পূর্বেকার পাঁচশত পাউণ্ডের শেয়ার-হোল্ডারদের ভোট-দানের ক্ষমতা নাকচ করিয়া অন্ততঃ এক হাজার পাউণ্ডের শেয়ার-হোল্ডারগণকে একটি করিয়া ভোট দিবার ক্ষমতা দেওয়া হইল। তিন, ছয় ও দশ হাজার পাউণ্ডের শেয়ার-হোল্ডারগণকে যথাক্রমে দুই, তিন ও চারটি ভোট দিবার অধিকার দেওয়া হইল। এইভাবে কোম্পানিতে যাহার অধিক অর্থ জড়িত আছে তাহাকে অধিক ক্ষমতাদানের নীতি স্বীকৃত হইল। ইহা ভিন্ন ডাইরেক্টর সভাকে শেয়ার-হোল্ডারগণের সভা হইতে কতকটা স্বাধীন করিয়া দেওয়া হইল। ২৪ জন ডাইরেক্টরের মধ্যে ছয়জন প্রতি বৎসর পদত্যাগ করিবেন এবং সেই স্থলে নূতন সদস্য নির্বাচিত হইবেন। ভবিষ্যতে গবর্ণর-জেনারেল ও কাউন্সিলের সদস্যগণ কোম্পানির ডাইরেক্টর সভা কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন, কিন্তু সে ক্ষেত্রেও

কোম্পানির গঠনতন্ত্রের পরিবর্তন

ব্রিটিশ সরকারের অনুমোদন গ্রহণ করা প্রয়োজন হইবে। ডাইরেক্টর সভা ব্রিটিশ সরকারের নিকট কোম্পানির শাসন ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য পেশ করিতে বাধ্য থাকিবেন।

বাংলাদেশের গবর্ণরকে 'গবর্ণর-জেনারেল' আখ্যা দেওয়া হইল। শাসনকার্যে তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য চারিজন সদস্যের একটি কাউন্সিল নিযুক্ত করা হইল। কাউন্সিলের সদস্যগণের প্রত্যেককেই সমান অধিকার দেওয়া হইল এবং অধিকাংশের ভোটে সকল বিষয়ের মীমাংসা করা হইবে, এই নীতি গৃহীত হইল। একমাত্র দুইদিকেই সমান সংখ্যক ভোট হইলে গবর্ণর-জেনারেল তাঁহার নিজ মতের প্রাধান্য দিতে পারিবেন।

গবর্ণর-জেনারেল ও কাউন্সিল নিয়োগ

রেগুলেটিং অ্যাক্ট্-এ কাউন্সিলের প্রথম চারিজন সদস্যের নাম উল্লেখ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এই চারিজন সদস্য ছিলেন ক্ল্যাভারিং (Clavering), মন্‌সন্ (Monson), বারওয়েল (Barwell) ও ফিলিপ ফ্রান্সিস্ (Philip Francis)। এই কাউন্সিল পাঁচ বৎসরের জন্য নিযুক্ত হইয়াছিল, কিন্তু একমাত্র ডাইরেক্টর সভার সুপারিশক্রমে পাঁচ বৎসরের পূর্বে-ই প্রয়োজনবোধে উহা ভাঙ্গিয়া দেওয়া সম্ভব ছিল। মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর উপর গবর্ণর-জেনারেল ও কাউন্সিলকে যুদ্ধ-ঘোষণা ও শান্তি-স্থাপনাদি ব্যাপারে পরিদর্শনের ক্ষমতা দেওয়া হইল।

একজন প্রধান বিচারপতি (Chief Justice) ও অপর তিনজন সাধারণ বিচারপতি লইয়া ফোর্ট উইলিয়ামে সুপ্রীম কোর্ট নামে একটি বিচারালয় স্থাপিত হইল। এই বিচারালয়কে গবর্ণর ও কাউন্সিল হইতে সম্পূর্ণ স্বাধীন রাখা হইল। গবর্ণর-জেনারেল, কাউন্সিলের সদস্য ও বিচারপতিগণের জন্য উপযুক্ত বেতন ধার্য করা হইল এবং তাহাদের পক্ষে কোনপ্রকার পারিতোষিক গ্রহণ নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া হইল।

সুপ্রীম কোর্ট স্থাপন

রেগুলেটিং এ্যাক্ট্-এর প্রধান ত্রুটি ছিল এই যে, (১) ইহা গবর্ণর-জেনারেল ও কাউন্সিল-এর ক্ষমতা সুনির্দিষ্ট করিয়া দেয় নাই। (২) ইহা ভিন্ন গবর্ণর-জেনারেল ও কাউন্সিল মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের কাউন্সিলের উপর কি প্রকার ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন তাহাও ইহাতে পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করা হয় নাই।

ফলে, বোম্বাই ও মাদ্রাজের কাউন্সিল কলিকাতার কাউন্সিল ও গবর্ণর-জেনারেল-এর মতামত না লইয়া স্বাধীনভাবে চলিতে দ্বিধাবোধ করিত না। বোম্বাই সরকারের রাঘোবাকে সাহায্য দান এবং দ্বিতীয় মহীশূরের যুদ্ধকালে মাদ্রাজ সরকারের নিজাম ও হায়দর আলির সহিত যুদ্ধ ও সন্ধির বিষয়ে স্বাধীনভাবে চলার দৃষ্টান্ত হইতেই রেগুলেটিং এ্যাক্ট্-এর ত্রুটি উপলব্ধি করিতে পারা যায়। (৩) সুপ্রীম কোর্টের ক্ষমতা এবং গবর্ণর-জেনারেল ও কাউন্সিলের সহিত সুপ্রীম কোর্টের সম্পর্কও পরিষ্কারভাবে বর্ণনা না করিবার ফলে অল্পকালের মধ্যেই সুপ্রীম কোর্ট ও কাউন্সিলের মধ্যে প্রকাশ্য বিরোধের সৃষ্টি হইয়াছিল। (৪) সুপ্রীম কোর্টের বিচার-ক্ষমতা সুনির্দিষ্টভাবে বর্ণিত ছিল না বলিয়া জমিদার-গণের বিরুদ্ধে যে-কোনও ব্যক্তির অভিযোগও সুপ্রীম কোর্ট শুনিতে আরম্ভ করিল। দেশীয় দেওয়ানী বিচারালয়ের বিচার-ক্ষমতায়ও সুপ্রীম কোর্ট হস্ত-ক্ষেপ করিতে লাগিল। পাটনা মামলা, ঢাকা মামলা, কাশিজোড়া মামলা প্রভৃতি কয়েকটি মামলায় সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক দেশীয় বিচারালয়গুলির বিচার-ক্ষমতা উপেক্ষা করিয়া নিজ ক্ষমতা প্রয়োগের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। (৫) রেগুলেটিং এ্যাক্ট্ গবর্ণর-জেনারেলকে নিজ কাউন্সিলের মতামতের উপর চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের ক্ষমতা না দিয়া শাসনব্যবস্থাকে পঙ্গু করিয়াছিল। সুতরাং উহা ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির গঠনতন্ত্র ও কার্যপদ্ধতির উন্নতি সাধন করিতে গিয়া আরও নানাপ্রকার জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছিল। (৬) সর্বশেষে, একথার উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক ভারতবর্ষে অধিকৃত স্থানসমূহের উপর সার্বভৌমত্বের (sovereignty) অধিকারী কোম্পানি অথবা ব্রিটিশ সরকার, সেই সম্পর্কে কিছুকাল পূর্ব হইতে যে মতানৈক্যের সৃষ্টি হইয়াছিল উহারও মীমাংসা রেগুলেটিং এ্যাক্ট্-এ করা হয় নাই।

রেগুলেটিং এ্যাক্ট্-এর ত্রুটি : সমালোচনা

১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দের সনন্দ বা চার্টার এ্যাক্ট্ (Charter Act of 1781) : রেগুলেটিং এ্যাক্ট্ কোম্পানির শাসনব্যবস্থার প্রকৃত উন্নতি-সাধনে সমর্থ হয় নাই, উপরন্তু উহাতে কতকগুলি ত্রুটি ছিল বলিয়া নূতন নূতন অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছিল। ইতিমধ্যে কলিকাতা কাউন্সিলের আভ্যন্তরীণ গোল-যোগের সংবাদ ইংলণ্ডে পৌঁছিলে কোম্পানির ভারতে অধিকৃত রাজ্যের নিরাপত্তা ও শাসন-সম্পর্কে সেখানে এক দারুণ সন্দেহ ও অনিশ্চয়তার সৃষ্টি

হইল। কোম্পানির স্বার্থের সহিত ইংরাজ জনসাধারণের অনেকেরই ভাগ্য জড়িত ছিল। এই কারণে লর্ড নর্থ কোম্পানির শাসনব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের প্রস্তাব করিলেন। বার্ক ও ফক্স্ (Burke & Fox)-এর বিরোধিতায় শেষ পর্যন্ত ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে চার্টার এ্যাক্ট্ পাস করা ভিন্ন অধিক কিছু সেই সময়ে করা সম্ভব হইল না। এই আইন দ্বারা সুপ্রীম কোর্ট এবং গবর্ণর-জেনারেল ও তাঁহার কাউন্সিলের ক্ষমতা সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করিয়া দেওয়া হইল।

রেগুলেটিং এ্যাক্ট্-এর ত্রুটিগুলির যৎসামান্য পরিবর্তন

পিট্-এর ভারত আইন, ১৭৮৪ (Pitt's India Act): অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংলণ্ডে রাজনৈতিক দলাদলি চরমে পৌঁছিয়াছিল। স্বভাবতই ভারতে উদীয়মান ব্রিটিশ সাম্রাজ্য এই সকল রাজনৈতিক দলের বাক্-বিতণ্ডার অতি সুন্দর বিষয়-বস্তু হইয়া দাঁড়াইল। পার্লামেন্টের বিরোধী দলের এক প্রস্তাব অনুযায়ী সিলেক্ট্ কমিটি (Select Committee) নামে একটি সমিতি গঠন করা হইল। উহার কর্তব্য ছিল ভারতীয় শাসনব্যবস্থার উন্নতিকল্পে এমন সুপারিশ করা যাহাতে ভারতে ব্রিটিশ শাসন ভারতীয় ও ইংরাজ উভয় জাতির পক্ষেই মঙ্গলজনক হইতে পারে। ইহা ভিন্ন ভারতের বিচার-ব্যবস্থা সম্পর্কে তদন্ত করিবার ভারও এই কমিটির উপর ছিল। এই কমিটির রিপোর্টের উপর নির্ভর করিয়া বাংলাদেশের বিচার-ব্যবস্থার উন্নতির জন্য একটি আইন পাস করা হইয়াছিল।

রাজনৈতিক দলগুলির ভারতবর্ষের ব্রিটিশ শাসন সম্পর্কে ঔৎসুক্য

বিচার-ব্যবস্থার উন্নয়ন

১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে ডাণ্ডাস্ (Dundas)-এর প্রস্তাবক্রমে সার এলিজা ইম্পেকে ভারতবর্ষ হইতে ফিরিয়া যাওয়ার আদেশ দেওয়া হইল। অপর প্রস্তাব দ্বারা ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসনব্যবস্থাকে সুষ্ঠু ও সুসংহত করা স্থির হইল। ইহার অব্যবহিত পরেই ডাণ্ডাস্ তাঁহার ইণ্ডিয়া বিল পার্লামেন্টে উপস্থিত করিলে পিট্-এর বিরোধিতায় তাহা অগ্রসর হইতে পারিল না। ইহার পর ফক্স্ তাঁহার ইণ্ডিয়া বিল উপস্থিত করিলেন। এই বিলে শাসনব্যবস্থার উন্নয়ন এবং ভারতীয় শাসনব্যবস্থা পরিচালনার জন্য

ডাণ্ডাস্-এর প্রস্তাব

ফক্স্-এর ইণ্ডিয়া বিল পরিত্যক্ত

ইংলণ্ডে একটি সরকারী প্রতিষ্ঠান গঠন করিবার প্রস্তাব করা হইল। বিলটি কমন্স সভায় গৃহীত হইলেও লর্ড সভা কর্তৃক পরিত্যক্ত হইল। ফক্স্-এর মন্ত্রিসভার পতনের পর পিট্ প্রধানমন্ত্রী হইলেন। তিনি ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার বিখ্যাত ইণ্ডিয়া এ্যাক্ট্ (Pitt's India Act) পাস করিলেন।

এই আইনের শর্তানুযায়ী ইংলণ্ডে 'বোর্ড-অব্-কণ্ট্রোল' নামে একটি সভা স্থাপিত হইল। এই সভা ব্রিটিশ অর্থসচিব, একজন সেক্রেটারী-অব্-স্টেট্ ও রাজা কর্তৃক মনোনীত প্রিভি কাউন্সিলের চারিজন সদস্য লইয়া গঠিত হইল। ইহা ভিন্ন কোম্পানির তিনজন ডাইরেক্টর লইয়া একটি 'সিক্রেট্ কমিটি' (Secret Committee) গঠিত হইল। বোর্ড-অব্-কণ্ট্রোলের যাবতীয় আদেশ-নির্দেশ বা মতামত এই সিক্রেট্ কমিটি মারফত ভারতবর্ষে কোম্পানির প্রতিনিধিবর্গের নিকট প্রেরণ করা স্থির হইল। বোর্ড-অব্-কণ্ট্রোল সামরিক ও বে-সামরিক উভয় প্রকার বিষয় সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন। বোর্ড-অব্-কণ্ট্রোল এবং সিক্রেট্ কমিটি এই দুই সভার যুগ্ম মতামত বা সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের আর কাহারও ক্ষমতা থাকিবে না স্থির হইল। ভারতের গবর্ণর-জেনারেল প্রধান সেনাপতি এবং অপর দুইজন সদস্য লইয়া গঠিত মোট তিনজনের একটি কাউন্সিলের সাহায্য লইয়া শাসনকার্য পরিচালনা করিবেন স্থির হইল। বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী দুইটিকে যুদ্ধ, শান্তি, দেশীয় রাজ্যগুলির সহিত যোগাযোগ প্রভৃতি বিষয়ে সম্পূর্ণভাবে গবর্ণর-জেনারেল ও তাঁহার কাউন্সিলের অধীনে স্থাপন করা হইল। রেগুলেটিং এ্যাক্ট-এর ত্রুটির অভিজ্ঞতা হইতে এইবার গবর্ণর-জেনারেলকে কোন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে কাউন্সিলের মতামত অগ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইল। পিট্-এর ইণ্ডিয়া এ্যাক্ট্-এর আরও কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ছিল। কোম্পানির কর্মচারিগণ ভারতবর্ষে চাকরি-জীবন শেষ করিয়া ইংলণ্ডে ফিরিয়া যাইবার কালে কি পরিমাণ অর্থ লইয়া গেলেন তাহার হিসাব দেওয়া বাধ্যতামূলক করা হইয়াছিল। ভারতে চাকরি করিবার কালে কৃত অপরাধের জন্য ইংরাজ কর্মচারিগণের বিচার করিবার উদ্দেশ্যে ইংলণ্ডে একটি ট্রাইবুন্যাল (Tribunal) স্থাপনের ব্যবস্থাও করা হইয়াছিল। অবশ্য এই শর্তটি কোন দিনই কার্যকরী করা হয়

পিট্-এর ইণ্ডিয়া এ্যাক্ট্-এর শর্তাদি

কোম্পানির ইংরাজ কর্মচারিগণের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা

নাই। ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তার করা ইংরাজ জাতির মর্যাদা ও নীতির বহির্ভূত বলিয়াও এই আইনে ঘোষণা করা হইয়াছিল। অবশ্য এই নীতি ও মর্যাদাবোধ ভারতে আগত ইংরাজদের ছিল না, বলা বাহুল্য। ফলে, ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছিল।

(১) পিট্-এর ভারত আইন ফক্স্-প্রস্তাবিত আইন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ছিল বলা যায় না। ফক্স্ চাহিয়াছিলেন ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির অস্তিত্ব নষ্ট করিয়া ব্রিটিশ সরকারের হস্তে ভারতীয় শাসনব্যবস্থার দায়িত্ব ন্যস্ত করা। ইহা কার্যকরী হইলে পরবর্তী কালে ভারতে কোম্পানির কর্মচারিগণের অন্যায়-অবিচার অনেকটা হ্রাস পাইত, বলা বাহুল্য। পিটের আইন কোম্পানির ক্ষমতা হ্রাস করিয়াছিল বটে, কিন্তু বোর্ড-অব্-কন্ট্রোল যাহাতে ভারতীয় শাসনব্যবস্থা ও ভারতবর্ষের তদানীন্তন অবস্থা সম্পর্কে তথ্যাদি জানিতে পারে সেইরূপ কোন ব্যবস্থা তাহাতে ছিল না।

সমালোচনা

(২) বোর্ড-অব্-কন্ট্রোল এবং ডাইরেক্টর সভার মধ্যে ক্ষমতা বণ্টিত করিয়া এই আইন কোম্পানি পরিচালনার দায়িত্ববোধ বহুল পরিমাণে হ্রাস করিয়াছিল। সিক্রেট্ কমিটির পশ্চাতে থাকিয়া বোর্ড-অব্-কন্ট্রোলের কাজ করিবার যে নীতি এই আইনের দ্বারা প্রবর্তিত হইয়াছিল তাহা শাসনকার্যের দায়িত্ববোধ-বৃদ্ধির সহায়ক ছিল না, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। ভারতে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ব্যাপারে ডাইরেক্টর সভার স্বার্থ জড়িত ছিল, কারণ উহার সভ্যগণ ভারতবর্ষ হইতে অর্থলাভের আশা করিতেন, কিন্তু বোর্ড-অব্-কন্ট্রোলের সেইরূপ কোনও স্বার্থ ছিল না। (৩) পিট্-এর ইণ্ডিয়া এ্যাক্ট্ প্রধানত ডাইরেক্টর সভার এবং সমসাময়িক কালের জনমতের মধ্যে একটি সমন্বয়-সাধনের চেষ্টা হিসাবে বিবেচ্য। ফলে, ইহাতে মধ্যপন্থা অনুসরণের আগ্রহ পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। বোর্ড-অব্-কন্ট্রোল যেমন ডাইরেক্টর সভার নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে স্থাপিত হইয়াছিল, তেমনি উহাকে স্বাধীনভাবে নীতি প্রবর্তন বা কাজ করিবার কোন ক্ষমতা না দিয়া ডাইরেক্টর সভারও ক্ষমতা রক্ষার চেষ্টা করা হইয়াছিল। (৪) কোম্পানি কর্তৃক ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তার-নীতির বিরোধিতা সত্ত্বেও ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ক্রমেই বিস্তৃত হইতেছিল। এই সকল কারণে পিট্-এর ভারত-আইন জটিলতা ও অসংহতিপূর্ণ ছিল, একথা অনস্বীকার্য।

ওয়ারেন হেস্টিংস্-এর ইম্পীচ্মেণ্ট্ (Impeachment of Warren Hastings): হেস্টিংসের কার্যকালের শেষ দিকে ইংলণ্ডে তাঁহার বিরুদ্ধে নানাপ্রকার অভিযোগ প্রকাশ পাইতে লাগিল। ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে ডাণ্ডাস্ (Lord Melville Dundas) ওয়ারেন হেস্টিংস্, সার এলিজা ইম্পে, লরেন্স সুলিভান প্রভৃতি ইংরাজ কর্মচারিগণকে ভারতবর্ষ হইতে স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য করিবার উদ্দেশ্যে পার্লামেণ্টে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। শেষ পর্যন্ত হেস্টিংস্ এবং অপরাপর কয়েকজনের বিরুদ্ধে প্রস্তাব বাতিল করা হইলেও সার এলিজা ইম্পেকে ফিরিয়া যাইতে হইয়াছিল। ইহার অল্পকাল পরেই পিট্ প্রধানমন্ত্রী হইলেন। তিনি হেস্টিংসের কার্যনীতির সমর্থন করিলেন না। ইতিমধ্যে *Letters of Junius* শিরোনামায় ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করিয়া কতকগুলি পত্র বাহির হইয়াছিল। এই সকল পত্রের লেখক কে ছিলেন সেবিষয়ে কোন কিছুই সঠিকভাবে বলা সম্ভব হয় নাই। তবে ফিলিপ ফ্রান্সিসের রচনা-ভঙ্গীর সহিত জুনিয়াসের পত্রাবলীর যথেষ্ট সাদৃশ্য ছিল বলিয়া তিনিই এগুলির রচয়িতা ছিলেন এই ধারণা সাধারণ্যে প্রচলিত আছে।

ইংলণ্ডে হেস্টিংস্-বিরোধী মনোভাব

জুনিয়াসের পত্রাবলী (Letters of Junius)

এইভাবে হেস্টিংস্-বিরোধী মনোভাব বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে হেস্টিংস্ পদত্যাগ করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া গেলেন। পরবর্তী তিন বৎসর ধরিয়া প্রধানতঃ পিট্ এবং ডাণ্ডাসের চেষ্টায়-ই ওয়ারেন হেস্টিংস্কে ইম্পীচ্ করা হইল। ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারি হইতে ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে এপ্রিল পর্যন্ত দীর্ঘ সাত বৎসর ধরিয়া লর্ড সভা কর্তৃক কমন্স সভার অভিযোগে হেস্টিংসের বিচার চলিল। রোহিলা যুদ্ধ প্রথমে অভিযোগের প্রধান বিষয়-বস্তু ছিল বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই অভিযোগ পরিত্যক্ত হইল। প্রধানতঃ বারাণসীর রাজা চৈৎ সিংহ এবং অযোধ্যার বেগমদের প্রতি অসদাচরণ ও অত্যাচারের অভিযোগেই হেস্টিংস্ অভিযুক্ত হইলেন। পার্লামেণ্টের হুইগদল নিজেদের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির জন্য এ বিচারকে সেই সময়কার এক চাঞ্চল্যকর ঘটনায় পরিণত করিলেন। ইংলণ্ডের ডেমোস্থিনিস অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ বাগ্মী বার্ক কমন্স-

হেস্টিংসের বিরুদ্ধে অভিযোগ

সভার পক্ষে হেস্টিংস্‌কে অত্যাচার ও অসদাচরণের অপরাধে অভিযুক্ত করিয়া মানবতা, ইংরাজ জাতি, ভারতবাসী—সকলের নামে হেস্টিংসকে 'মানবজাতির শত্রু' বলিয়া অভিযুক্ত করিলেন।* দীর্ঘ সাত বৎসর ধরিয়া বিচারের পর হেস্টিংস্ অভিযোগ হইতে মুক্তি পাইলেন, কিন্তু আত্মপক্ষ সমর্থনের ব্যয়-সংকুলান করিতে গিয়া তিনি সর্বস্বান্ত হইলেন। ডাইরেক্টর সভা কর্তৃক প্রস্তাবিত ভাতাও পিট্ এবং ডাণ্ডাসের আপত্তিতে তাঁহাকে দেওয়া সম্ভব হইল না। তাই দুঃখ করিয়া হেস্টিংস্ বলিয়াছিলেন : *I gave you all and you have rewarded me with confiscation, disgrace and a life of impeachment.*

বস্তুত, ইংরাজ স্বার্থের দিক হইতে বিচার করিলে হেস্টিংসের ইম্পীচ্‌মেন্ট্ ব্রিটিশ জাতির অকৃতজ্ঞতার নিদর্শন ভিন্ন অপর কিছুই যে ছিল না তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। বাংলাদেশে ইংরাজ শাসন যখন ধ্বংসোন্মুখ হইয়া পড়িয়াছিল, অর্থাভাবহেতু যখন ভারতে ইংরাজ প্রভুত্ব লোপ পাইতে বসিয়াছিল সেই সময়ে হেস্টিংস্-ই কোম্পানির শাসনে দৃঢ়তা ও স্বচ্ছলতা আনিয়াছিলেন। ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রকৃত স্থাপয়িতা ছিলেন ওয়ারেন হেস্টিংস্, সে বিষয়ে দ্বিমত নাই। তাঁহাকে ইম্পীচ্ করা ইংরাজ জাতির পক্ষে তাঁহার প্রতি অকৃতজ্ঞতার পরিচায়ক বটে, কিন্তু মানবতা ও শাসনকার্যের সততার দিক হইতে বিচার করিলে তাঁহাকে ইম্পীচ্ করিয়া ইংরাজ জাতির নেতৃবৃন্দ তাঁহাদের মানসিক উৎকর্ষের পরিচয় দান করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ

হেস্টিংসের ইম্পীচ্‌মেন্টের সমালোচনা

* "Therefore, hath it with all confidence been ordered, by the commons of Great Britain, that I impeach Warren Hastings of high crimes and misdemeanours. I impeach him in the name of the Commons' House of Parliament whose trust he has betrayed. I impeach him in the name of English nation, whose ancient honour he has sullied. I impeach him in the name of the people of India, whose rights he has trodden under foot, and whose country he has turned into a desert. Lastly, I impeach him in the name of human nature itself, in the name of both sexes, in the name of every age, in the name of every rank, I impeach the common enemy and oppressor of all." (*Burke*) Lord Macaulay : *The Impeachment of Warren Hastings.*

নাই। তাঁহাকে ইম্পীচ্ করিয়া ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ন্যায় এবং সততার সূচনা করা হইয়াছিল। শাসনকার্যে দায়িত্বজ্ঞান-বৃদ্ধি, শাসিতের প্রতি সম্মানজনক ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তাবোধ ওয়ারেন হেস্টিংসের ইম্পীচ্মেন্টের ফলে বৃদ্ধি পাইয়াছিল ইহা স্বীকার্য। (ক্লাইভ এবং সার এলিজা ইম্পেকেও অসদাচরণের অভিযোগে ইম্পীচ করা হইয়াছিল।)

ওয়ারেন হেস্টিংসের কৃতিত্ব বিচার (Critical Estimate of Warren Hastings): ভারতে ইংরাজ শাসকবর্গের মধ্যে হেস্টিংসের কার্যনীতি ও কার্যকলাপ সম্পর্কে যেরূপ পরস্পর-বিরোধী মতামত ব্যক্ত হইয়াছে সেইরূপ অপর কাহারও ক্ষেত্রে হইয়াছে কিনা সন্দেহ। কিন্তু হেস্টিংসের কৃতিত্বের সমালোচনা সর্বপ্রথমই তাঁহার গবর্ণর-পদ গ্রহণকালে কোম্পানির আভ্যন্তরীণ ও সীমান্ত-সংক্রান্ত অব্যবস্থার কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন। ইহা ভিন্ন রেগুলেটিং এ্যাক্ট পাস হওয়ার পর কাউন্সিলের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের বিরোধিতার কথাও স্মরণ রাখা উচিত হইবে।

হেস্টিংস সম্পর্কে পরস্পর-বিরোধী মতামত

হেস্টিংস্ যখন বাংলার গবর্ণর হইয়া আসিলেন তখন ক্লাইভ-প্রবর্তিত দ্বৈত শাসনের ত্রুটি সর্বত্র প্রকাশ পাইয়াছিল। কোম্পানির ইংরাজ কর্মচারীদের মধ্যে দুর্নীতি চরমে পৌঁছিয়াছিল। কোম্পানির কোষাগার তখন প্রায় শূন্য। তদুপরি মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সী হইতে পুনঃপুনঃ অর্থ সাহায্যের জন্য তাগিদ আসিতেছিল। আবার ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দের মন্বন্তরের ফলে দেশের অর্থনৈতিক দুরবস্থাও চরমে পৌঁছিয়াছিল। দেশের কৃষি প্রভৃতি সকল প্রকার উৎপাদনমূলক কার্য অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। বিচার তখন কেবলমাত্র নামেই পর্যবসিত হইয়াছিল, নিয়মিতভাবে রাজস্ব আদায় করাও সম্ভব ছিল না। রাস্তাঘাটও তখন দস্যু-তস্করের উপদ্রবহেতু নিরাপদ ছিল না। পররাষ্ট্রীয় বা সীমান্ত সমস্যারও তখন অভাব ছিল না। সম্রাট শাহ্ আলম তখন মারাঠাদের হস্তের ক্রীড়নকে পরিণত, মারাঠাগণ তখন কোম্পানির অধিকৃত রাজ্যে হানা দিতে উদ্যত। অযোধ্যা রাজ্যের নিরাপত্তার অভাবহেতু কোম্পানির রাজ্যের নিরাপত্তাও তখন প্রতি মুহূর্তেই ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশংকা ছিল।

হেস্টিংসের আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্রীয় সমস্যা

এইরূপ আভ্যন্তরাণ ও পররাষ্ট্রীয় সমস্যা-সংকুল শাসনভার গ্রহণ করিবার ক্ষমতা যে-কোন ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব হইত না। কিন্তু এই গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া কোম্পানির শাসনে সংহতি আনিবার এবং সম্মুখীন সমস্যাগুলির সমাধানের ক্ষমতা ওয়ারেন হেস্টিংসের ছিল। তিনি ইংরাজ-অধিকৃত রাজ্য ও শাসনব্যবস্থার উন্নয়নে প্রথম হইতেই দৃঢ়সংকল্পভাবে আত্মনিয়োগ করিলেন। (১) প্রারম্ভেই তিনি ডাইরেক্টর সভার নির্দেশ অনুযায়ী বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী অর্থাৎ রাজস্ব-আদায়-সংক্রান্ত কার্যাদি কোম্পানির হস্তে গ্রহণ করিয়া ক্লাইভ-প্রবর্তিত দ্বৈত শাসনের অবসান ঘটাইলেন। রাজস্ব-সংক্রান্ত কার্যাদির তদারকের ভার তিনি 'বোর্ড-অব-রেভিনিউ' (Board of Revenue) নামে একটি সভার উপর স্থাপন করিলেন এবং রেজা খাঁ ও সীতাব রায়কে দেওয়ানী কাজ হইতে সরাইয়া দিলেন। পাঁচ বৎসরের মেয়াদে জমিদারগণের সহিত জমিদারির বন্দোবস্ত করা হইল এবং প্রত্যেক জেলায় পূর্বেকার সুপারভাইজর (Supervisor)-এর স্থলে একজন করিয়া 'কালেক্টর' (Collector) নিযুক্ত করিয়া তাঁহার উপর রাজস্ব আদায়ের ভার অর্পণ করা হইল।

তাঁহার কার্যাদি : (১) রাজস্ব-আদায়-সংক্রান্ত

(২) বিচার-ব্যবস্থা-সংক্রান্ত

(২) রাজস্ব-সংক্রান্ত বিচারকার্যও দেওয়ানের উপর ছিল। সুতরাং রাজস্ব আদায়ের ভার কোম্পানির হস্তে গ্রহণের অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবেই দেওয়ানী বিচারের ব্যবস্থারও প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করা দরকার হইল। হেস্টিংস্ প্রতি জেলায় একটি করিয়া মফঃস্বল দেওয়ানী আদালত স্থাপন করিলেন। ফৌজদারী বিচারকার্যাদি নবাবের অধীন ছিল বটে, তথাপি ইংরাজ কোম্পানির প্রতিপত্তি-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ফৌজদারী বিচারেও ইংরাজগণ হস্তক্ষেপ করিত। হেস্টিংস্ প্রত্যেক জেলায় একটি করিয়া মফঃস্বল ফৌজদারী আদালত স্থাপন করিলেন। দেওয়ানী বিচারের আপীলের জন্য কলিকাতায় সদর দেওয়ানী আদালত এবং ফৌজদারী বিচারের আপীলের জন্য মুর্শিদাবাদে সদর নিজামত আদালত স্থাপিত হইল। এইভাবে ওয়ারেন হেস্টিংস্ ভারতে ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থা দৃঢ়ভিত্তিতে স্থাপন করিয়াছিলেন। হেস্টিংস্-ই সর্বপ্রথম উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত যাবতীয় মামলা-মোকদ্দমা হিন্দু ও মুসলমানদের ধর্মশাস্ত্রানুসারে বিচারের নিয়ম প্রবর্তন করিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন মহাজন কর্তৃক খাতকের উপর অত্যাচার, নির্দিষ্ট হার

অপেক্ষা অধিক সুদ গ্রহণ, বিচারপ্রার্থীদের নিকট হইতে কাজী ও মুফ্‌তিদের পারিশ্রমিক গ্রহণ প্রভৃতি নিষিদ্ধ করা হইয়াছিল। বলা বাহুল্য কাজী ও মুফ্‌তিগণকে বেতন দিবার ব্যবস্থা তিনি করিয়াছিলেন। হেস্টিংস্ মুদ্রানীতির সংস্কার সাধন করিয়া সমসাময়িক কালের মুদ্রানীতির অব্যবস্থা দূর করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

অপরাপর সংস্কার

তিব্বত এবং তিব্বতের মধ্য দিয়া নেপাল অঞ্চলের সহিত কোম্পানির বাণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যে ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে হেস্টিংস্ জর্জ বোগ্‌ল্ (George Bogle)-কে তাশি লামা (Tashi Lama)-র রাজসভায় দূত হিসাবে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

তিব্বত ও নেপালে দূত প্রেরণ

পররাষ্ট্রীয় ব্যাপারে হেস্টিংসের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কোম্পানির রাজ্যের নিরাপত্তা বিধান করা। এই উদ্দেশ্যে তিনি অযোধ্যার নবাবকে কোম্পানির অনুগত মিত্রে পরিণত করিলেন। এদিক দিয়া দেখিতে গেলে অধীনতামূলক মিত্রতার (Subsidiary Alliance) নীতি হেস্টিংস্-ই সর্বপ্রথম প্রবর্তন করিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে ওয়েলেস্‌লী এই নীতিই ব্যাপকভাবে কার্যকরী করিয়া তুলিয়াছিলেন। শাহ্ আলম মারাঠাদের হস্তে ক্রীড়নকে পরিণত হইয়াছিলেন, এই কারণে হেস্টিংস্ তাঁহার বাৎসরিক প্রাপ্য ২৬ লক্ষ টাকা বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। তদুপরি কারা ও এলাহাবাদ তাঁহার নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া অযোধ্যার নবাবের নিকট পঞ্চাশ লক্ষ টাকার বিনিময়ে বিক্রয় করিয়াছিলেন। অযোধ্যা রাজ্যের শক্তি ও নিরাপত্তার মধ্যেই ইংরাজ অধিকৃত রাজ্যের নিরাপত্তা নিহিত, এই কথা উপলব্ধি করিয়া হেস্টিংস্ অযোধ্যার নবাবকে রোহিলখণ্ড জয় করিতে সাহায্য করিয়াছিলেন। অবশ্য এই সাহায্যদানের বিনিময়ে তিনি অযোধ্যার নবাবের নিকট হইতে ৪০ লক্ষ টাকা আদায় করিয়াছিলেন।

পররাষ্ট্র-নীতি

বোম্বাই ও মাদ্রাজ সরকার সেই সময়ে মারাঠা ও হায়দর আলির সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইলে হেস্টিংসের চেষ্টায় প্রথম মারাঠা যুদ্ধ এবং দ্বিতীয় মহীশূর যুদ্ধ ইংরাজদের অনুকূলেই সমাপ্ত হইয়াছিল। এই দুই প্রেসিডেন্সীকে সামরিক অর্থ সাহায্য দান করিয়া হেস্টিংস্ সেই সকল অঞ্চলে ইংরাজ-স্বার্থ রক্ষা করিয়াছিলেন।

ইঙ্গ-মারাঠা ও ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ

কোম্পানির আর্থিক অনটন দূর করিবার উদ্দেশ্যে হেস্টিংস্ অবৈধভাবে অর্থ গ্রহণ করিতেও দ্বিধাবোধ করেন নাই। বারাণসীর রাজা চৈৎ সিংহের ও অযোধ্যার বেগমদের পীড়ন করিয়া অর্থসংগ্রহেও তিনি সংকোচ বোধ করেন নাই। এই দুই অভিযোগেই তাঁহাকে পরে ইম্পীচ্ করা হইয়াছিল।

কোম্পানির অর্থাভাব দূরীকরণ

ভারতে হেস্টিংসের কার্যাবলী আমাদিগকে দুইটি দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিতে হইবে। তদানীন্তন ইংরাজ বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির অর্থলোলুপতা, কোম্পানির আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্রীয় সমস্যার সব কিছুর কথা স্মরণ রাখিলে হেস্টিংস্ ইংরাজ জাতির স্বার্থ কি পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছিলেন তাহা উপলব্ধি করা সহজ হইবে। কোম্পানির শাসনব্যবস্থায় শৃঙ্খলা স্থাপন, বৈদেশিক সম্পর্ক কোম্পানির স্বার্থের অনুকূলে নিয়ন্ত্রণ, কোম্পানির অর্থাভাব দূরীকরণ প্রভৃতি বিভিন্ন সমস্যার যথাযথ সমাধান করিয়া হেস্টিংস্ ইংরাজ জাতিকে ভারতের সাম্রাজ্য ভোগের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া গিয়াছিলেন। ইম্পীচ্মেণ্টের পর তিনি দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন: "I gave you all and you have rewarded me with confiscation, disgrace and a life of impeachment."—এই উক্তির সত্যতা সম্পর্কে দ্বিমতের অবকাশ নাই। ব্রিটিশ স্বার্থের দিক হইতে বিচার করিলে ভারতবর্ষে হেস্টিংসের আচরণ সমর্থনযোগ্য, সন্দেহ নাই। কিন্তু ভারতবাসীর স্বার্থ, মর্যাদা, ন্যায়, সততা ও মানবতার দৃষ্টিতে হেস্টিংসের কার্যকলাপের অনেক কিছুই নিন্দনীয় ছিল, সন্দেহ নাই। তাঁহার অত্যাচারী শাসনের কথা তাঁহার ইম্পীচ্মেণ্টের সময়ে বিখ্যাত বাগ্মী এড্মণ্ড বার্ক ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের তথা ইংরাজ জাতির সমক্ষে বর্ণনা করিয়াছিলেন।

সমালোচনা

তথাপি তাঁহার প্রকৃত গুণাবলীর প্রশংসা না করা অনুচিত হইবে। ভারতীয় বিচার-ব্যবস্থার গোড়াপত্তন, কোম্পানির শাসনে শৃঙ্খলা আনয়ন, ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসার সাধন, সর্বোপরি কোম্পানির রাজত্বকে আসন্ন পতনের সম্ভাবনা হইতে সংরক্ষণ করিয়া হেস্টিংস্ অনন্যসাধারণ দক্ষতা ও ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছিলেন।

তাঁহার অবদান

সর্বশেষে তাঁহার সাহিত্যানুরাগের কথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন। তিনি বাংলা ও ফার্সী ভাষা আয়ত্ত করিয়াছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল এবং তিনি সংস্কৃত শিক্ষার উৎসাহ দান করিতেন। কলিকাতা মাদ্রাসা ও 'রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি' (Royal Asiatic Society) তাঁহারই পৃষ্ঠপোষকতায় স্থাপিত হইয়াছিল। এইভাবে বহুমুখী প্রতিভা ও অসাধারণ কার্যক্ষমতার দ্বারা ভারতে ব্রিটিশ শাসনের প্রথম যুগে হেস্টিংস্ নিজ পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন।

সাহিত্যানুরাগ

চতুর্থ অধ্যায়

মারাঠা শক্তির পুনরভ্যুত্থান ঃ মহীশূর রাজ্যের উত্থান

(The Maratha Revival : Rise of Mysore)

পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের পর মারাঠা শক্তির পুনরভ্যুত্থান (Revival of the Maratha Power after the Third Battle of Panipath) : পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে মারাঠাদের পরাজয়ের সংবাদ শুনিয়া পূর্ব হইতেই পীড়িত বালাজী বাজীরাও-এর মৃত্যু হইল (১৭৬১)। এই যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে মারাঠা সাম্রাজ্যবাদের অবসান ঘটিল। বালাজী বাজীরাও-এর সপ্তদশবর্ষীয় তরুণ পুত্র মাধবরাও (১ম)-এর আমলে মারাঠা শক্তি যে দ্রুত :পুনঃসঞ্জীবিত হইতে পারিবে সেই আশা তখন কেহ করিতে পারে নাই। যাহা হউক, প্রথমে মাধব রাও পিতৃব্য রঘুনাথ রাও-এর অভিভাবকত্বাধীনে রহিলেন। রঘুনাথ রাও ইতিহাসে রাঘোবা নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ। পানিপথের যুদ্ধে মারাঠা শক্তি একেবারে দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে ভাবিয়া হায়দরাবাদের নিজাম আলি মারাঠা রাজ্য

পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের পর মারাঠা শক্তির দুর্বলতা ঃ নিজাম কর্তৃক মারাঠা রাজ্য আক্রমণ

আক্রমণ করিলেন, কিন্তু শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইয়া সন্ধি স্থাপনে বাধ্য হইলেন (১৭৬২)। অতি সহজ শর্তেই নিজাম আলি মারাঠাদের সহিত সন্ধি স্থাপনে সক্ষম হইলেন। ইতিমধ্যে রঘুনাথ রাও ও মাধব রাও-এর মধ্যে বিবাদের সৃষ্টি হইলে পুনরায় হায়দরাবাদের সৈন্য মারাঠা রাজ্য আক্রমণ করিয়া রাক্ষসভুবন-এর যুদ্ধে পরাজিত হইল। এবারও অতি সহজ শর্তেই সন্ধি স্থাপন করা হইল। হায়দরাবাদের প্রতি এইরূপ উদারতা প্রদর্শনের পশ্চাতে রাঘোবার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ভবিষ্যতে মাধব রাও-এর সহিত দ্বন্দ্বে হায়দরাবাদের নিজামের সাহায্য গ্রহণ করা।

হায়দর আলির সহিত মারাঠাদের সংঘর্ষ

ইহার অল্পকালের মধ্যেই হায়দর আলির ক্রমবর্ধমান শক্তিতে আশঙ্কিত হইয়া পেশওয়া মাধব রাও মহীশূর রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া (১৭৬৪-৬৫) হায়দর আলিকে পরাজিত করিলেন। রঘুনাথ রাও-এর চেষ্টায় হায়দর আলিও নিজামের ন্যায় অতি সহজ শর্তেই পেশওয়ার সহিত সন্ধিবদ্ধ হইতে সমর্থ হইলেন। ইহার পরবৎসরই পুনরায় মারাঠা ও হায়দর আলির মধ্যে যুদ্ধের সৃষ্টি হইল (১৭৬৬-৬৭)। এইবারও হায়দর আলি পরাজিত হইলেন।

মাধব রাও-এর অধীনে মারাঠা শক্তির পুনরভ্যুত্থান

মাধব রাও ছিলেন অনন্যসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী। তাঁহার সামরিক দূরদর্শিতা, মারাঠাদের শক্তি পুনর্গঠনের আকাঙ্ক্ষা এবং সেইজন্য অক্লান্ত চেষ্টা এবং সর্বোপরি তাঁহার চরিত্রের গুণাবলী তাঁহাকে মারাঠা জাতির স্বাভাবিক শ্রদ্ধা ও আনুগত্যলাভে সাহায্য করিয়াছিল। বেরার-এর জানোজী ভোঁস্‌লে মারাঠা রাষ্ট্রসংঘের (Maratha Confederacy) শত্রু নিজাম ও হায়দর আলির সহিত যোগদান করিবার চেষ্টা করিলে মাধব রাও তাঁহাকে আনুগত্যাধীনে আনিতে সক্ষম হইলেন। তারপর মাধব রাও দক্ষিণ ও উত্তর-ভারতে মারাঠা শক্তিকে অপ্রতিহত করিয়া তুলিবার চেষ্টায় উভয় দিকেই মারাঠা বাহিনী প্রেরণ করিলেন। উত্তর-ভারতে মারাঠাগণ বুন্দেলখণ্ড, মালব প্রভৃতি রাজ্য পুনরায় মারাঠা সাম্রাজ্যভুক্ত করিতে সমর্থ হইল। এমন কি তাহারা দিল্লী অধিকার করিয়া সম্রাট শাহ্‌ আলমকে কারা ও এলাহাবাদ হইতে তথায় লইয়া গেল। সম্রাট মারাঠাদের হস্তে ক্রীড়নক-স্বরূপ হইয়া পড়িলেন। দাক্ষিণাত্যে মারাঠাগণ হায়দরকে শ্রীরঙ্গপত্তম-এর

নিকটে এক যুদ্ধে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করিল। সেই সময়ে (১৭৭২) পেশওয়া মাধব রাও-এর হঠাৎ মৃত্যু ঘটিলে উত্তর-ভারত হইতে মারাঠা বাহিনী পুণায় ফিরিয়া গেল। ইহার পর মাধব রাও-এর ভ্রাতা নারায়ণ রাও পেশওয়া বলিয়া ঘোষিত হইলেন। মাধব রাও-এর অকালমৃত্যু মারাঠা শক্তির পক্ষে পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে পরাজয় অপেক্ষা কম ক্ষতিকর ছিল না। তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই মারাঠাশক্তি দ্রুত পতনের দিকে ধাবিত হইয়াছিল।

মাধব রাও-এর ভ্রাতা নারায়ণ রাও পেশওয়া পদে অধিষ্ঠিত হইবার কয়েক মাসের মধ্যেই রঘুনাথ রাও-এর চক্রান্তে নিহত হইলেন। সেই সময়ে নারায়ণ রাও-এর পত্নী ছিলেন অন্তঃসত্ত্বা। এদিকে রাঘোবা বা রঘুনাথ রাওকে পেশওয়া বলিয়া ঘোষণা করা হইল, কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই নারায়ণ রাও-এর একটি পুত্রসন্তান জাত হইলে এক নূতন পরিস্থিতির সৃষ্টি হইল। মারাঠা নেতৃবর্গের মধ্যে অনেকেই নারায়ণ রাও-এর শিশুপুত্রের পক্ষ অবলম্বন করিলে রাঘোবা পুণা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। নারায়ণ রাও-এর শিশুপুত্রকেই পেশওয়া-পদে স্থাপন করা হইল। ইহার পরবর্তী কালের ঘটনার সূত্রে প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা সংঘর্ষের সৃষ্টি হইল এবং শেষ পর্যন্ত সলবই-এর সন্ধি দ্বারা ব্রিটিশ ও মারাঠাদের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হইল। [প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের বিশদ আলোচনা—৮৬-৮৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।]

মারাঠাদের অন্তর্দ্বন্দ্ব

মহীশূর রাজ্য : হায়দর আলি (Mysore State : Hyder Ali) : অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে হায়দর আলির উত্থান নিজাম, মারাঠা ও ইংরাজ—এই তিন পক্ষেরই ভীতির সঞ্চার করিয়াছিল। হায়দর আলি ভাগ্যান্বেষী সৈনিক হিসাবেই জীবন শুরু করিয়াছিলেন। প্রথমে তিনি মহীশূর রাজ্যের হিন্দু রাজার প্রধানমন্ত্রী ও সেনাপতি নঞ্জরাজ (Nanjraj)-এর অধীনে সামান্য 'নায়েক' হিসাবে কার্য গ্রহণ করেন। বিজয়নগর সাম্রাজ্যের পতনের পর যাদব বংশের ক্ষত্রিয়গণ শ্রীরঙ্গপত্তমে নূতন রাজধানী স্থাপন করিয়া মহীশূর রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে যাদব বংশের অবসান ঘটিলেও মহীশূর রাজ্য হিন্দু রাজবংশের অধীনেই ছিল। কিন্তু রাজা কৃষ্ণরায়-এর অকর্মণ্যতার সুযোগ লইয়া প্রধানমন্ত্রী ও সেনাপতি নঞ্জরাজ

রাজ্যের সর্বেসর্বা হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহারই প্রসাদে হায়দর আলির ক্রমেই পদোন্নতি হইতে লাগিল। নঞ্জরাজের অধীনে হায়দর আলি কর্ণাটে ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্বে যুদ্ধ করিয়া ইওরোপীয়দের যুদ্ধকৌশল সম্পর্কে ধারণা লাভ করিয়াছিলেন। ১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দে নঞ্জরাজ কর্তৃক তিনি দিন্দিগুল নামক স্থানের ফৌজদার-পদে নিযুক্ত হন। ইহার পর মহীশূর রাজ্য এবং সমগ্র দাক্ষিণাত্যের রাজনৈতিক অব্যবস্থার সুযোগ লইয়া হায়দর আলি তাঁহারই পৃষ্ঠপোষক নঞ্জরাজকে ক্ষমতাচ্যুত করিয়া মহীশূর রাজ্যের শাসন-ক্ষমতা হস্তগত করিলেন (১৭৬১)।

হায়দর আলির প্রথম জীবন

মহীশূর রাজ্যের শাসন-ক্ষমতা হস্তগত করিয়া হায়দর রাজ্য-বিস্তারে মনোনিবেশ করিলেন এবং একে একে বেদনোর, সুন্দা, কানাড়া, সিরা, গুটি প্রভৃতি স্থান দখল করিয়া মহীশূর রাজ্যের সীমা বিস্তার করিলেন। ইতিমধ্যে মহীশূরে হিন্দুরাজার মৃত্যু হইলে তিনি স্বয়ং মহীশূরের সিংহাসন অধিকার করিয়া লইলেন। হায়দর আলির শক্তিবৃদ্ধিতে মারাঠাগণ শঙ্কিত হইয়া উঠিল। হায়দর আলির শক্তিবৃদ্ধি মারাঠা রাজ্যের নিরাপত্তার প্রতিকূল, এই কথা উপলব্ধি করিয়া পেশবা মাধব রাও হায়দরের রাজ্য আক্রমণ করিলেন। হায়দর মারাঠা বাহিনীর হস্তে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইয়া গুটি ও সবনুর নামক দুইটি স্থান এবং ৩২ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ হিসাবে দিতে বাধ্য হইলেন (১৭৭৫)। হায়দরের অভ্যুত্থান হায়দরাবাদের নিজামেরও ভীতি ও ঈর্ষার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। নিজাম মাদ্রাজের ইংরাজ কর্তৃপক্ষের সহিত হায়দরের বিরুদ্ধে ইংরাজ সেনাবাহিনীর সাহায্য লাভের জন্য এক চুক্তি সম্পাদন করিলেন (১৭৬৬)। এই সাহায্যের বিনিময়ে নিজাম ইংরাজগণকে নিজ রাজ্যের কতকাংশ দান করিবেন বলিয়াও স্থির হইল। এদিকে মারাঠাগণও হায়দর আলিকে সম্পূর্ণভাবে দমন করিবার জন্য প্রস্তুত ছিল। সুতরাং হায়দর আলিকে নিজাম, ইংরাজ ও মারাঠা এই তিন শত্রুর বিরুদ্ধে এককভাবে যুদ্ধ করিতে হইল। মারাঠাগণই সর্বপ্রথম মহীশূর রাজ্য আক্রমণ করিলে হায়দর আলি প্রভূত পরিমাণে অর্থ দ্বারা তাহাদিগকে নিরস্ত করিলেন।

হায়দর কর্তৃক মহীশূর-রাজ্যের বিস্তার সাধন ও সিংহাসন দখল

মারাঠা-মহীশূর সংঘর্ষ

এদিকে নিজাম ও ইংরাজদের যুগ্মবাহিনীও হায়দরের রাজ্য আক্রমণ করিল। সুচতুর হায়দর কর্ণাটের নবাবের ভ্রাতা মাহ্ফুজ খাঁর মাধ্যমে নিজামকে ইংরাজপক্ষ ত্যাগ করিতে রাজী করাইলেন। এমতাবস্থায় ইংরাজগণ একাই হায়দরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইতে বাধ্য হইল। এইভাবে বিনা কারণে হায়দরের ন্যায় ক্ষমতাশালী, দুর্ধর্ষ যোদ্ধার সহিত যুদ্ধসৃষ্টির জন্য দায়ী ছিলেন মাদ্রাজের অদূরদর্শী ইংরাজ কর্তৃপক্ষ। যাহা হউক, যুদ্ধে হায়দর আলি ইংরাজ সেনাধ্যক্ষ কর্ণেল স্মিথের হস্তে চঙ্গম ও ত্রিনোমালি (Changama and Trinomali)-এর যুদ্ধে পরাজিত হইলেন। হায়দরাবাদের নিজাম মোটেই নির্ভরযোগ্য মিত্র ছিলেন না। তিনি পুনরায় হায়দরের পক্ষ ত্যাগ করিয়া ইংরাজ পক্ষে যোগদান করিলেন এবং হায়দরের বিরুদ্ধে ইংরাজ ও কর্ণাটের নবাব উভয়কেই সাহায্য দানে স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু হায়দর পরিস্থিতির এইরূপ পরিবর্তনেও নিরুৎসাহ হইলেন না। তিনি এককভাবে যুদ্ধ করিয়া শেষ পর্যন্ত ইংরাজগণকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করিতে সমর্থ হইলেন। ম্যাঙ্গালোর তাঁহার অধিকারভুক্ত হইল, এমন কি মাদ্রাজের নিরাপত্তা অবধি ক্ষুণ্ণ হইতে চলিল। এমতাবস্থায় হায়দরের সহিত ইংরাজদের এক সন্ধি স্বাক্ষরিত হইল (১৭৬৯)। এই সন্ধির শর্তানুসারে হায়দরের রাজ্য অপর কোন শক্তি কর্তৃক আক্রান্ত হইলে ইংরাজগণ তাঁহাকে সাহায্যদানে স্বীকৃত হইল। ইহা ভিন্ন উভয় পক্ষই পরস্পর পরস্পরের বিজিত স্থান ও যুদ্ধ-বন্দী ফিরাইয়া দিল। এইভাবে প্রথম ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের অবসান ঘটিল। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই মারাঠাগণ মহীশূর রাজ্য আক্রমণ করিলে হায়দর আলি ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দের সন্ধির শর্তানুযায়ী ইংরাজদের সাহায্য চাহিলেন। কিন্তু ইংরাজগণ তাহাদের পূর্ব প্রতিশ্রুতি বিস্মৃত হইয়া তাঁহাকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইল না। ইংরাজদের এই বিশ্বাসঘাতকতায় হায়দর স্বভাবতই ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি নিজাম, বেরারের রাজা ও মাহ্দজী সিন্ধিয়াকে লইয়া ইংরাজ-বিরোধী এক শক্তিসংঘ গঠন করিলেন। ইতিমধ্যে ইংরাজগণ মহীশূর রাজ্যের অন্তর্গত ফরাসী-অধিকৃত মাহে বন্দর দখল করিলে হায়দর আলি ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিলেন। ইংরাজগণ তাঁহার প্রতিবাদে কর্ণপাত না করিলে ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে হায়দর

নিজাম-মারাঠা-ইংরাজ বাহিনীর মহীশূর আক্রমণ

প্রথম ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ

আলি ইংরাজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। এক বিশাল সৈন্যবাহিনী সহ তিনি কর্ণাটে প্রবেশ করিলেন। তুষারস্তূপ-পতনের (avalanche) সম্মুখে যেমন কোন কিছুই টিকিতে পারে না, সেইরূপ হায়দর আলিও সম্মুখের সব কিছু ধ্বংস করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ইংরাজ বাহিনীকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করিয়া তিনি আর্কট দখল করিলেন। সার্ আলফ্রেড্ লায়েল (Sir Alfred Lyall)-এর ভাষায় ইংরাজদের ভাগ্য-বিড়ম্বনা তখন চরমে পৌঁছিয়াছিল। এই শোচনীয় অবস্থা হইতে ব্রিটিশ স্বার্থ রক্ষা করিলেন ওয়ারেন হেস্টিংস্। তিনি আয়ার কূট-এর সেনাপতিত্বে এক বিশাল বাহিনী হায়দরের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। বেরারের রাজা, নিজাম ও সিন্ধিয়াকে তিনি কূটকৌশলে হায়দর আলি-গঠিত শক্তিসংঘ হইতে বিচ্ছিন্ন করিলেন। হায়দর এককভাবে ইংরাজদের সহিত যুদ্ধ করিয়া চলিলেন, কিন্তু আয়ার কূট-এর হস্তে পোর্টো-নোভো (Proto-Novo)-এর যুদ্ধে পরাজিত হইলেন। নেগাপত্তম ও ত্রিনোমালি ইংরাজগণ কর্তৃক অধিকৃত হইল। সেই সময়ে আমেরিকার স্বাধীনতা-যুদ্ধ শুরু হইলে ফরাসী সরকার ইংরাজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহারা সাফ্রেঁ (Suffrein) নামক নৌ সেনাপতির অধীনে কয়েকটি যুদ্ধজাহাজ ভারতবর্ষে প্রেরণ করিলেন। সাফ্রেঁর নিকট হইতে প্রকৃত কোন সাহায্য লাভের পূর্বেই অকস্মাৎ হায়দর আলির মৃত্যু ঘটিল (১৭৮২)। ইংরাজগণও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল।

দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ

হায়দর আলির মৃত্যু (১৭৮২)

[প্রথম ও দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের বিশদ আলোচনা ৮৮-৯০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।]

হায়দর আলির চরিত্র ও কৃতিত্ব (Character and Estimate of Hyder Ali) : সামান্য ভাগ্যান্বেষী সৈনিক হিসাবে জীবন শুরু করিয়া হায়দর আলি নিজ প্রতিভা ও কর্মক্ষমতা বলে মহীশূরের সিংহাসন অধিকার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহার অসীম সাহসিকতা, তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি, অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা এবং লৌহ-কঠিন প্রতিজ্ঞা তাঁহাকে জীবনে জয়যুক্ত হইতে সাহায্য করিয়াছিল। বিপদে তিনি কখনও স্থৈর্য হারাইতেন না—অত্যধিক জটিল পরিস্থিতিতেও বিভ্রান্ত হইতেন না। তিনি ছিলেন কূটকৌশলী এবং দূরদর্শী রাজনীতিক। তিনি নিরক্ষর ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার স্মরণশক্তি

ছিল অনন্যসাধারণ। প্রখর স্মরণশক্তির সাহায্যে তিনি তাঁহার নিরক্ষরতা-জনিত অসুবিধা দূর করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। বিভিন্ন পাঁচটি ভাষায় তিনি অনর্গল কথা বলিতে পারিতেন। ডক্টর স্মিথ্ হায়দর আলির চরিত্র বর্ণনা করিতে গিয়া তাঁহাকে সম্পূর্ণভাবে বিবেক, দয়া, ধর্ম, নীতিজ্ঞানহীন অত্যাচারী শাসক হিসাবে রূপায়িত করিয়াছেন।* বস্তুতঃ নিজ প্রতিশ্রুতি-রক্ষা, পরধর্মের প্রতি সহিষ্ণুতা, ব্রিটিশদের সহিত ব্যবহারে অকপটতা† প্রভৃতি গুণ তাঁহার চরিত্রকে তদানীন্তন মাদ্রাজ কাউন্সিলের ইংরাজদের চরিত্র অপেক্ষা বহু ঊর্ধ্বে স্থাপন করিয়াছিল। সেই কারণে ডক্টর স্মিথের মন্তব্য যে অযৌক্তিক একথা বলা ভুল হইবে না। হায়দর তাঁহারই পৃষ্ঠপোষক নঞ্জরাজকে অপসারিত করিয়া স্বয়ং মহীশূর রাজ্যের শাসন-ক্ষমতা হস্তগত করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই সত্য, কিন্তু অব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করাই ছিল সেই যুগের রীতি। তথাপি এই ব্যাপারে হায়দর আলি অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছিলেন, একথা বলা যাইতে পারে।

হায়দরের চরিত্র

হায়দর আলি কেবল মহীশূর রাজ্যের সিংহাসন অধিকার করিয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন না। পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের ফলে মারাঠা শক্তির দুর্বলতার সুযোগ লইয়া তিনি মহীশূর রাজ্যের সীমাও প্রসারিত করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন অনন্যসাধারণ সংগঠক এবং সুনিপুণ ও সমরকুশল সেনাপতি। সুলতান হিসাবে তাঁহার জীবনের প্রায় সকল সময়ই যুদ্ধ-বিগ্রহে অতিবাহিত হইয়াছিল। অধিকাংশ সময়ই তাঁহাকে একই সঙ্গে একাধিক শত্রুর সহিত যুঝিতে হইয়াছিল, কিন্তু তিনি কোন সময়েই আত্মপ্রত্যয় বা সাহস হারান নাই। মারাঠা, নিজাম ও ইংরাজ—এই তিন শক্তির সম্মিলিত বাহিনীর বিরুদ্ধে তাঁহাকে কোন কোন সময়ে এককভাবেই যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তিনি যুদ্ধ এবং কূটকৌশল উভয় প্রকার অস্ত্রের দ্বারা ইহাদের সহিত

* "Haidar Ali in the south and Ranjit Singh in the north were the ablest of the fierce adventurers who rose to power during the turmoil of the eighteenth century. Both were illiterate and absolutely unscrupulous. Haidar Ali had no religion, no morals and no compassion."—Smith, *Oxford History of India*, p. 543.

† "He was singularly faithful to his engagements, and straightforward in his policy towards the British." Bowring quoted in *An Advanced History of India*, vide, p. 685.

লড়িয়াছিলেন। একাধিকবার তিনি কূটকৌশলে তাঁহার বিরুদ্ধ পক্ষের শক্তি-সংঘকে বিচ্ছিন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন ইংরাজদের সহিত যুঝিবার জন্য তিনি নিজেও একাধিকবার মারাঠা, নিজাম প্রভৃতিকে নিজপক্ষে টানিয়া লইয়া শক্তিসংঘ গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। শাসন-ব্যাপারেও তিনি যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহার শাসন-পদ্ধতি অবশ্য স্বৈরাচারী ও ব্যক্তিগত ধরনের ছিল এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি কঠোরতারও পরিচয় দিয়াছিলেন। তথাপি পরধর্ম-সহিষ্ণুতা, শাসনকার্যের সকল বিষয়ে তৎপরতা এবং সর্বোপরি নিজ রাজ্যের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য অক্লান্ত চেষ্টা ভারত-ইতিহাসে হায়দর আলিকে এক গৌরবোজ্জ্বল আসনের অধিকারী করিয়াছে।

কৃতিত্ব

পঞ্চম অধ্যায়

ভারতে ব্রিটিশ শক্তির প্রসার (পূর্বানুস্থতি)

(Growth of the British Power in India)

লর্ড কর্ণওয়ালিস, ১৭৮৬-৯৩ (Lord Cornwallis): ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংস্ পদত্যাগ করিলে লর্ড জন ম্যাক্‌ফার্‌সন (Lord John Macpherson) এক বৎসর অস্থায়ী গবর্ণর-জেনারেল হিসাবে কাজ করিলেন। ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিস গবর্ণর-জেনারেল নিযুক্ত হইয়া ভারতবর্ষে আসিলেন। ওয়ারেন হেস্টিংসের কার্যকলাপে সেই সময়ে ইংলণ্ডের জনসাধারণের মধ্যে এই ধারণা জন্মিয়াছিল যে, কোম্পানির দুর্নীতিপূর্ণ আবহাওয়া দ্বারা প্রভাবিত কোন ব্যক্তিকে আর গবর্ণর-জেনারেল-পদে নিযুক্ত করা সমীচীন হইবে না। এই কারণেই বোর্ড-অব-কণ্ট্রোল-এর সভাপতি হেনরী ডাণ্ডাস্ এবং ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী পিট্-এর অন্তরঙ্গ সুহৃদ্ লর্ড কর্ণওয়ালিসকে গবর্ণর-

লর্ড জন ম্যাক্‌ফার্‌সন (১৭৮৫-৮৬)

কর্ণওয়ালিসের গবর্ণর-জেনারেল-পদে নিয়োগ

জেনারেল হিসাবে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। সুতরাং ডাইরেক্টর সভা ও ব্রিটিশ সরকারের সমর্থন ও সহানুভূতি লর্ড কর্ণওয়ালিসের পশ্চাতে ছিল।

পিট্-এর ভারত-আইন (Pitt's India Act)-এর শর্তানুযায়ী কর্ণওয়ালিসকে ভারতে রাজ্যবিস্তার ও যুদ্ধ-নীতি হইতে সম্পূর্ণভাবে বিরত থাকিবার নির্দেশ দেওয়া হইল। ব্রিটিশ স্বার্থ রক্ষার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রেই যুদ্ধ করা চলিবে, এই নির্দেশও তিনি পাইলেন। রেগুলেটিং এ্যাক্ট্-এর দোষ-ত্রুটি লক্ষ্য করিয়া কর্ণওয়ালিসকে প্রয়োজনবোধে কলিকাতা কাউন্সিলের মতামত অগ্রাহ্য করিবার ক্ষমতাও দেওয়া হইল। সেই সময়ে কোম্পানির শাসনব্যবস্থার সংস্কার-সাধনের প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছিল, এইজন্য লর্ড কর্ণওয়ালিসকে যাবতীয় প্রয়োজনীয় সংস্কার-সাধনের বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছিল। কর্ণওয়ালিস ছিলেন সম্মানিত, ক্ষমতাশালী ব্যক্তি। নিজ কর্তব্যনিষ্ঠা, সততা, সর্বোপরি জনসাধারণের উপকার করিবার ইচ্ছার সহিত তদানীন্তন ভারতীয় শাসনক্ষেত্রে অভিজ্ঞ ইংরাজ কর্মচারী জন শোর (John Shore), জেম্স্ গ্রাণ্ট্ (James Grant), উইলিয়াম জোনস্ (William Jones), জোনাথান ডান্কান্ (Jonathan Duncan)—প্রভৃতির অভিজ্ঞতার সমন্বয় সাধন করিয়া এক সুসংহত শাসনব্যবস্থা গড়িয়া তুলিবার সুযোগ কর্ণওয়ালিসের সম্মুখে উপস্থিত ছিল।

পিট্-এর ভারত-আইন অনুসারে কর্ণওয়ালিসের উপর নির্দেশ

কর্ণওয়ালিসের সাফল্য লাভের সুযোগ

তাঁহার সংস্কার-কার্যাদি (His Reforms) : লর্ড কর্ণওয়ালিসের সংস্কার-নীতি কোম্পানির শাসনব্যবস্থার কোন দিকই বাদ দেয় নাই। (১) প্রথমেই তিনি কোম্পানির বাণিজ্য-পরিচালনা-সংক্রান্ত ব্যবস্থার সংস্কারে মনোনিবেশ করিলেন। পূর্বে ভারতবর্ষ হইতে যে সকল পণ্য ইংলণ্ডে রপ্তানি করা হইত তাহা ক্রয় করিবার জন্য কোম্পানি নিজ কর্মচারীদের সহিতই চুক্তিবদ্ধ হইত। অর্থাৎ ইংরাজ কর্মচারিগণ কোম্পানির প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহের ভার গ্রহণ করিত। তাহারা দেশীয় বণিক বা দালালদের নিকট হইতে মালপত্র ক্রয় করিয়া কিছু লাভ রাখিয়া কোম্পানির নিকট বিক্রয় করিত। ফলে কোম্পানি এক বিরাট পরিমাণ মুনাফা হইতে বঞ্চিত হইত। কর্ণওয়ালিস

বাণিজ্য-সংক্রান্ত সংস্কার (১), (২)

সরাসরি দেশীয় বণিকদের সহিত প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহের জন্য চুক্তিবদ্ধ হওয়ার নিয়ম প্রবর্তন করিলেন। (২) পূর্বে কোম্পানির বাণিজ্য-সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যপরিচালনার জন্য এগারজন সদস্য লইয়া গঠিত একটি বাণিজ্য-সংস্থা (Board of Trade) ছিল। কর্ণওয়ালিস কাজের সুবিধার জন্য উহার সদস্য-সংখ্যা করিলেন পাঁচ।

কর্ণওয়ালিস বিচার-ব্যবস্থারও সংস্কার সাধন করিলেন। তাঁহার বিচার-ব্যবস্থার সংস্কার প্রধানতঃ ফৌজদারী ও দেওয়ানী, এই দুইভাগে ভাগ করিয়া আলোচনা করা-ই সঙ্গত হইবে। (১) হেস্টিংস্ মুর্শিদাবাদে সদর নিজামত আদালত নামে সর্বোচ্চ ফৌজদারী বিচারালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। এই বিচারালয়ের সভাপতিত্ব করিতেন বাংলার নবাব। কর্ণওয়ালিস সদর নিজামত আদালত মুর্শিদাবাদ হইতে কলিকাতায় স্থানান্তরিত করিলেন এবং নবাবের স্থলে গবর্ণর-জেনারেল ও কাউন্সিলকে উহার পরিচালনার ভার দিলেন (১৭৯০)। গবর্ণর-জেনারেল ও কাউন্সিলকে দেশীয় আইন-কানুন ও রীতি-নীতি সম্পর্কে উপদেশ দিবার জন্য কাজী ও মুফ্‌তি নিযুক্ত করা হইল। (২) সদর নিজামত আদালতের অধীনে কর্ণওয়ালিস চারিটি ভ্রাম্যমাণ বিচারালয় (Circuit Courts) স্থাপন করিলেন। এগুলির প্রত্যেকটি দুইজন করিয়া ইংরাজ বিচারক লইয়া গঠিত ছিল। বিচারকদিগকে দেশীয় আইনের ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইবার জন্য কাজী ও মুফ্‌তি নিযুক্ত করা হইয়াছিল। ভ্রাম্যমাণ বিচারালয়ের বিচারকগণ বৎসরে দুইবার করিয়া বিভিন্ন জেলায় যাইতেন এবং স্থানীয় ফৌজদারী বিচারকার্য সম্পাদন করিতেন। (৩) পূর্বে কোন কোন ক্ষেত্রে নিষ্ঠুর দণ্ডদানের রীতি ছিল। কর্ণওয়ালিস এই সকল নিষ্ঠুর দণ্ডদানের প্রথা উঠাইয়া দিলেন। (৪) পূর্বে নরহত্যা রাষ্ট্র বা সমাজের বিরুদ্ধে অপরাধ বলিয়া পরিগণিত হইত না। ফলে, হত্যাকারী ভীতি প্রদর্শন করিয়া বা নিহত ব্যক্তির আত্মীয়স্বজনকে উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ দিয়া মামলা মিটাইয়া লইতে পারিত। কর্ণওয়ালিস হত্যার অপরাধকে সমাজ-বিরোধী বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং মৃত ব্যক্তির আত্মীয়স্বজনের ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর হত্যাকারীর বিচার নির্ভর করিবে না, এই আইন প্রবর্তন করিলেন। সমাজের উপকারের জন্যই

ফৌজদারী বিচার-ব্যবস্থার সংস্কার: (১), (২), (৩), (৪), (৫)

হত্যাকারীকে উপযুক্ত শাস্তি দিবার রীতি তিনি প্রবর্তন করেন। (৫) মুসলমান আইন অনুসারে পূর্বে অ-মুসলমান সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়া কোন মুসলমানকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া চলিত না। আবার, কোন কোন অপরাধের বিচারে দুইজন অ-মুসলমান সাক্ষীকে একজন মুসলমান সাক্ষীর সমান বলিয়া ধরা হইত। কর্ণওয়ালিস বিচার-ব্যাপারে এই সকল বৈষম্য-মূলক ব্যবহার উঠাইয়া দিয়া আইনের চক্ষে সকলকে সমান অধিকার দান করিলেন।

পূর্বে রাজস্ব অর্থাৎ দেওয়ানীর সহিত দেওয়ানী মামলা-মোকদ্দমা বিচারের ব্যবস্থা জড়িত ছিল বলিয়া রাজস্ব-ব্যবস্থার কোন বিশেষ পরিবর্তন ঘটিলে দেওয়ানী বিচার-ব্যবস্থারও পরিবর্তন-সাধন প্রয়োজন হইত। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে কর্ণওয়ালিস দেওয়ানী বিচার-ব্যবস্থাকে রাজস্ব বিভাগ হইতে সম্পূর্ণভাবে পৃথক করিয়া লইয়া নিম্নতম স্তর হইতে উপরের দিকে পর্যায়ক্রমে সাজাইয়াছিলেন। (১) দেওয়ানী বিচার-ব্যবস্থার সর্বনিম্নে তিনি সদর আমিন ও মুন্‌সেফী বিচারালয়গুলিকে স্থাপন করিয়াছিলেন। এই সকল বিচারালয়ে সাধারণ ধরনের দেওয়ানী মামলা বিচারের ব্যবস্থা ছিল। (২) সদর আমিন ও মুন্‌সেফী বিচারালয়ের উপরে প্রতি জেলায় একটি করিয়া জেলা-বিচারালয় (District Court) স্থাপন করা হয়। জেলা-বিচারালয়গুলি এক একজন ইংরাজ জেলা-জজের অধীনে ছিল। ভারতীয় আইনজ্ঞদের সাহায্য লইয়া ইংরাজ জজগণ বিচারকার্য সম্পাদন করিতেন। (৩) জেলা-বিচারালয়ের উপর চারিটি প্রাদেশিক বিচারালয় (Provincial Court) স্থাপন করা হইয়াছিল। কলিকাতা, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ ও পাটনা—এই চারিস্থানে চারিটি প্রাদেশিক বিচারালয় স্থাপিত হইয়াছিল। এগুলির পরিচালনার ভারও ছিল ইংরাজ জজদের উপর। জেলা-জজের বিচারের বিরুদ্ধে প্রাদেশিক বিচারালয়ে আপীল করা চলিত। (৪) সমগ্র দেওয়ানী বিচারের সর্বোচ্চ ছিল সদর দেওয়ানী আদালত। গবর্ণর-জেনারেল ও কাউন্সিল এই বিচারালয়ের বিচারকার্য পরিচালনা করিতেন। (৫) পূর্বে জেলা-কালেক্টরগণ দেওয়ানী মামলা-মোকদ্দমারও বিচার করিতেন। কর্ণওয়ালিস তাঁহাদের বিচারক্ষমতা

দেওয়ানী বিচার-ব্যবস্থার সংস্কার : (১), (২), (৩), (৪), (৫)

নাকচ করিয়া তাঁহাদের শাসন-ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। সাধারণ ধরনের ফৌজদারী মামলার বিচার অবশ্য তাঁহারা করিতে পারিতেন।

কর্ণওয়ালিস কোম্পানির কর্মচারীদের কার্য-নীতি ও কার্য-পদ্ধতির পরিবর্তন সাধন করিয়া ভারতীয় সিভিল সার্ভিস (Indian Civil Services)-এর ঐতিহ্য গঠনে সাহায্য করিয়াছিলন। তিনি কর্মচারিবর্গের কার্য-নীতি ব্যাখ্যা করিয়া 'কর্ণওয়ালিস কোড' নামে কতকগুলি নিয়ম-কানুন (Cornwallis Code) চালু করিয়াছিলেন। কর্মচারিগণ যাহাতে অবৈধভাবে অর্থ উপার্জনের চেষ্টা না করে সেজন্য তিনি তাহাদের মাহিনা বাড়াইয়া দিয়াছিলেন। কর্মচারিবর্গের আনুগত্য, সততা, নিয়মানুবর্তিতা প্রভৃতি গুণের উপর অত্যধিক জোর দিয়া তিনি কোম্পানির শাসনব্যবস্থার দক্ষতা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

কোম্পানির কর্মচারী-বর্গের ঐতিহ্য গঠন

দেশের সর্বত্র শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপনের উদ্দেশ্যে কর্ণওয়ালিস পুলিশ-ব্যবস্থারও সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন। গ্রামাঞ্চলকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক অংশে তিনি একজন করিয়া দারোগা নিযুক্ত করেন। পূর্বে জমিদারগণ নিজ নিজ এলাকায় শান্তিরক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন। এজন্য তাঁহারা পুলিশ বাহিনী পোষণ করিতেন। কিন্তু কর্ণওয়ালিসের সংস্কারের ফলে জমিদারগণের পুলিশ বাহিনীর মাধ্যমে শান্তিরক্ষার দায়িত্ব লোপ পাইল। জেলার পুলিশ-ব্যবস্থা জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের অধীনে স্থাপন করা হইয়াছিল। কলিকাতায় একজন পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ নিযুক্ত করিয়া কলিকাতার শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব তাঁহার উপর অর্পণ করা হইয়াছিল।

পুলিশ-ব্যবস্থার সংস্কার

কর্ণওয়ালিসের আমলে সর্বপ্রধান উল্লেখযোগ্য সংস্কার হইল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তন। এই ব্যবস্থার ফলে জমিদারগণ রাজস্ব-আদায়কারী হইতে জমির মালিকে পরিণত হইয়াছিলেন। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ খাজনা দিবার শর্তে জমিদারগণ জমি ভোগদখল করিতে পারিতেন। সময়মত কোম্পানির খাজনা দিলে জমিদারগণের জমিদারি হইতে অপসারিত হইবার কোন আশঙ্কা ছিল না। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের ফলে কোম্পানি প্রতিবৎসর নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হইতে পারিয়াছিল এবং তাহাতে

রাজস্ব-ব্যবস্থার সংস্কার —চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত

বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের হিসাব অর্থাৎ (Budget) প্রস্তুতেরও সুবিধা হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন জমিদারি প্রথা প্রবর্তনের ফলে উদ্ভূত ভূম্যধিকারী শ্রেণীর সাহায্য ও সহানুভূতিতে বিদেশী শাসন দৃঢ়তর হইবার সুযোগ লাভ করিয়াছিল।

[চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিশদ আলোচনা অন্যত্র দেওয়া হইয়াছে।]

কর্ণওয়ালিসের সংস্কার-কার্যাদির সমালোচনা (Criticism of Cornwallis' Reforms) : কর্ণওয়ালিসের সংস্কার-কার্যাদি সম্পূর্ণ ত্রুটিহীন ছিল একথা বলা যায় না। (১) তিনি দেশীয় বণিকদের সহিত কোম্পানিকে রপ্তানি বাণিজ্যের প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহের জন্য চুক্তিবদ্ধ করিয়া একদিকে যেমন কোম্পানির আয় বৃদ্ধি করিয়াছিলেন অপরদিকে কোম্পানির কর্মচারিবর্গের ব্যক্তিগত স্বার্থ-সিদ্ধির পথও বন্ধ করিয়াছিলেন। বাণিজ্য-সংক্রান্ত তাঁহার সংস্কার-কার্যাদি কোম্পানির ও দেশীয় বণিকদের প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছিল বলা বাহুল্য। (২) কিন্তু বিচার-ব্যবস্থার সংস্কার করিতে গিয়া তিনি নবাব এবং অপরাপর দেশীয় বিচারকদের বিচার-ক্ষমতার বিলোপসাধন করিয়া বিচার-কার্যাদি সম্পূর্ণভাবে ইংরাজ করায়ত্ত করিয়াছিলেন। অবশ্য ইহা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বিচার-ব্যবস্থাকে পর্যায়ক্রমে ভাগ করিয়া তিনি উহাকে অধিকতর দৃঢ় এবং যুক্তিসম্মত করিয়া তুলিয়াছিলেন। বিচার-ব্যাপারে মুসলমান-অমুসলমানকে সমপর্যায়ে স্থাপন করিয়া, হত্যা অপরাধের বিচার-সংক্রান্ত আইনের সংস্কারসাধন করিয়া এবং নিষ্ঠুর দণ্ডদান বন্ধ করিয়া তিনি বিচার-ব্যবস্থাকে উন্নত করিয়াছিলেন, একথা স্বীকার করিতেই হইবে। বিচার-ব্যবস্থার সংস্কারে কর্ণওয়ালিস হেস্টিংসের অনুসরণ করিয়াছিলেন, উহা তাঁহার নিজস্ব উদ্ভাবন ছিল, একথা বলা চলে না। (৩) ইংরাজ-কর্মচারিবর্গের দক্ষতা, সততা-বৃদ্ধি এবং তাহাদের কর্ম-পদ্ধতির উন্নতি-সাধন করিতে গিয়া তিনি কেবলমাত্র বেতনের উপরই জোর দিয়াছিলেন। অধিক বেতন দিলেই কর্মচারীদের নৈতিকতা বৃদ্ধি পাইবে এই ছিল তাঁহার ধারণা। অধিক বেতন দিবার ফলে তাহাদের উৎকোচ-গ্রহণের আগ্রহ

বাণিজ্য-সংক্রান্ত সংস্কার ত্রুটিহীন

বিচার-ব্যবস্থার অত্যধিক বিদেশীয়করণ

ইংরাজ কর্মচারিগণের নীতিবোধ বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা অনুপলব্ধ

কতক পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছিল বটে, কিন্তু শাসনকার্যে তাহাদের নীতিবোধ যে খুব বৃদ্ধি পাইয়াছিল, একথা বলে চলে না। (৪) পুলিশ-ব্যবস্থার সংস্কার করিতে গিয়াও কর্ণওয়ালিস ভারতীয়দের অর্থাৎ জমিদারগণের ক্ষমতা হ্রাস করিয়া সেই ক্ষমতা ইংরাজ কর্মচারীদের উপর অর্পণ করিয়াছিলেন।

পুলিশ-ব্যবস্থার বিদেশীয়করণ

(৫) কর্ণওয়ালিস-প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নানা দিক দিয়া উন্নতি-মূলক ছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহার ত্রুটিও ছিল যথেষ্ট। রাজস্ব-আদায়ের ব্যাপারে সময়ের কড়াকড়ি জমিদারের হস্তে 'রায়ত' (ryot) অর্থাৎ প্রজাবর্গকে সম্পূর্ণভাবে ছাড়িয়া দেওয়া প্রভৃতি জমিদার এবং প্রজা উভয়ের পক্ষেই ক্ষতিকর হইয়াছিল। রাজস্বের পরিমাণ নির্ধারণেও ছিয়াত্তরের মন্বন্তর-জনিত তৎকালীন দুরবস্থার কথাও বিবেচনা করা হয় নাই। ফলে, বহু জমিদার যেমন জমিদারি হারাইয়াছিল তেমনি জমিদারগণের অত্যাচারে বহু প্রজাও দুর্দশাগ্রস্ত হইয়াছিল। সদিচ্ছা-প্রণোদিত হইলেও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ত্রুটি ক্রমেই প্রকাশ পাইয়াছিল।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ত্রুটিসমূহ

[চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের গুণাগুণের বিশদ আলোচনা অন্যত্র দ্রষ্টব্য।]

(৬) সর্বশেষে এই কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কর্ণওয়ালিসের সংস্কার-কার্যাদির আলোচনা করিলে ভারতীয়দের প্রতি তাঁহার প্রচ্ছন্ন অবিশ্বাস লক্ষ্য করা যায়। ভারতীয়দের শাসনব্যবস্থা হইতে বিচ্ছিন্ন রাখিয়া কর্ণওয়ালিস শাসক ও শাসিতের পরস্পর প্রীতি ও সহযোগিতার পথ প্রশস্ত করিয়াছিলেন। ভারতীয় শাসনব্যবস্থার খুঁটিনাটি বিষয়ে অনভিজ্ঞ ইংরাজ কর্মচারিবর্গের উপর শাসনকার্যের যাবতীয় দায়িত্ব অর্পণ করিয়া তিনি একদিকে যেমন তাহাদের দায়িত্ব ভারাক্রান্ত করিয়াছিলেন, অপরদিকে তাহাদের অত্যধিক ক্ষমতা-জনিত ঔদ্ধত্যবৃদ্ধির পথও প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

ভারতীয়দের প্রতি অবিচার

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, ১৭৯৩ (The Permanent Settlement): লর্ড কর্ণওয়ালিসের সংস্কার-কার্যাদির মধ্যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তই সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ধারণা লর্ড কর্ণওয়ালিস কর্তৃক উদ্ভাবিত, একথা সত্য নহে। ওয়ারেন হেস্টিংসের শাসনকালেও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রশ্ন আলোচিত হইয়াছিল। ওয়ারেন হেস্টিংসের কাউন্সিলের

অন্যতম সদস্য সার্ ফিলিপ ফ্রান্সিস্ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পক্ষপাতী ছিলেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রশ্নের প্রতি ডাইরেক্টর সভা ও ব্রিটিশ পার্লামেন্টের দৃষ্টি প্রধানতঃ সার্ ফিলিপ ফ্রান্সিস্-এর চেষ্টায়-ই আকৃষ্ট হইয়াছিল। পিট্-এর ভারত-আইন (Pitt's India Act, 1784)-এর ৩৯নং বিধানেও বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার রাজস্ব স্থায়ী ভিত্তিতে নির্ধারণের নির্দেশ ছিল।* লর্ড কর্ণওয়ালিস যখন গবর্ণর-জেনারেল হইয়া আসিলেন তখনও ইংরাজ কর্মচারিগণ বাংলার রাজস্ব-ব্যবস্থা সম্পর্কে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জনে সমর্থ হয় নাই। এই কারণেই ১৭৮৭, ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দ—এই দুই বৎসরের রাজস্ব বাৎসরিক ভিত্তিতেই বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিস জেলা কালেক্টরগণকে (১) রাজস্বের পরিমাণ, (২) কাহাদের নিকট জমি বন্দোবস্ত দেওয়া উচিত, (৩) জমিদারগণের অত্যাচার হইতে 'রায়ত' (ryot) অর্থাৎ প্রজাবর্গকে রক্ষা করিবার জন্য কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন প্রভৃতি সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করিয়া পাঠাইবার আদেশ দিলেন।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কর্ণওয়ালিস কর্তৃক উদ্ভাবিত নহে

কর্ণওয়ালিস কর্তৃক রাজস্ব-সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহ

জেলা কালেক্টরগণ কর্ণওয়ালিসের নির্দেশানুসারে দীর্ঘ দুই বৎসর ধরিয়া তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়া পাঠাইলেন। এই সকল তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া কর্ণওয়ালিস ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে জমিদারগণের সহিত দশ বৎসরের জন্য জমি বন্দোবস্ত দিতে প্রস্তুত হইলেন। অবশ্য ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে দশ বৎসরের বন্দোবস্ত দেওয়া সম্ভব হইল না। যাহা হউক, এই বন্দোবস্তের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রতিশ্রুতিও তিনি দিতে চাহিলেন যে, কোম্পানির ডাইরেক্টর সভার অনুমোদন লাভ করা সম্ভব হইলে এই দশ

দশ বৎসরের বন্দোবস্তের সঙ্গে সঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রতিশ্রুতিদানের প্রশ্ন-সংক্রান্ত বিতর্ক

*"For settling and establishing upon principles of moderation and justice according to the laws and constitution of India, the permanent rule by which their respective tributes, rents and services shall be in future rendered and paid." Sec. 39, *Pitt's India Act.*

বৎসরের বন্দোবস্তকেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে পরিণত করা হইবে। ঠিক সেই সময়ে লর্ড কর্ণওয়ালিস এবং জন শোর-এর মধ্যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দেওয়া-না-দেওয়া সম্পর্কে যে বিতর্ক হইয়াছিল উহা তদানীন্তন বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার অর্থ নৈতিক অবস্থা এবং রাজস্ব নীতির এক অতি সুন্দর এবং মনোজ্ঞ আলোচনা বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে।

শোর-কর্ণওয়ালিস বিতর্ক (Shore-Cornwallis Controversy): (১) জন শোর এবং কর্ণওয়ালিসের বিতর্কের প্রধান প্রশ্ন-ই ছিল বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী করা হইবে কি না। শোর-এর মতে কোম্পানি অর্থাৎ কোম্পানির ব্রিটিশ কর্মচারিবৃন্দ তখনও রাজস্ব-সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যাপারের প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা অর্জন করে নাই, এমতাবস্থায় বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী করিবার পূর্বে আরও অভিজ্ঞতা অর্জন করা প্রয়োজন। সুতরাং দশ বৎসরের জন্য বন্দোবস্ত দিবার সঙ্গে সঙ্গেই ভবিষ্যতে উহাই চিরস্থায়ী করা হইবে, এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া সমীচীন হইবে না। কর্ণ-ওয়ালিসের মতে কোম্পানি রাজস্ব-সম্পর্কে যে সকল তথ্য সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিল এবং যে অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিল তাহাই বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী করিবার পক্ষে ছিল যথেষ্ট।

অভিজ্ঞতার প্রশ্ন

(২) ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দের (বাংলা ১১৭৬ সাল) মন্বন্তরের ফলে বাংলাদেশের লোকসংখ্যা এমন হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছিল যে, বাংলাদেশের কৃষি-জমির এক-তৃতীয়াংশ জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। কর্ণওয়ালিস মনে করিতেন যে, জমিদারগণ চিরস্থায়িভাবে এই সকল জমির অধিকার না পাইলে এই সকল জমিকে পুনরায় চাষ-আবাদের যোগ্য করিয়া তুলিবার ব্যয় বহন করিতে প্রস্তুত হইবে না। দশ বৎসর পরে জমিদারি হস্তান্তরিত হইবার কোন আশঙ্কা থাকিলে জমি-উন্নয়নের কোন চেষ্টা-ই জমিদারগণ করিবে না। পক্ষান্তরে শোর-এর মতে জমিদারগণ ইতিপূর্বে এক বৎসর, অধিক হইলে পাঁচ বৎসরের জন্য জমি বন্দোবস্ত পাইয়াছে। সুতরাং তাহাদের পক্ষে দশ বৎসরের জন্য জমির বন্দোবস্ত পাওয়া-ই জমি-উন্নয়নের প্রেরণা-স্বরূপ হইবে। (৩) জন শোর একথাও বলিয়াছিলেন যে, দশ বৎসরের জন্য

জঙ্গলাকীর্ণ কৃষি জমি আবাদের প্রশ্ন

---

* Ferminger, vol. II. pp. 513, 516-18, 532-33.

বন্দোবস্ত দিবার কালেই ভবিষ্যতে বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী করা হইবে, এইরূপ কোন প্রতিশ্রুতি দেওয়া উচিত হইবে না। কারণ, ডাইরেক্টর সভা যদি দশ বৎসরের বন্দোবস্তের ভিত্তিতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অনুমোদন না করেন তাহা হইলে কোম্পানির উপর জমিদারগণের আর আস্থা থাকিবে না।

দশ বৎসরের বন্দোবস্তের সঙ্গে সঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রতিশ্রুতিদানের প্রশ্ন

ইহার উত্তরে কর্ণওয়ালিস ডাইরেক্টর সভা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু করিবার যে নির্দেশ দিয়াছিলেন উহার উল্লেখ করেন এবং দশ বৎসরের বন্দোবস্ত যে ডাইরেক্টর সভা কর্তৃক অনুমোদিত হইবেই একথা তিনি দৃঢ়তার সহিত প্রকাশ করেন। (৪) শোর আরও একটি কারণে ঠিক সেই সময়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁহার মতে ১৭৮৯-৯০ খ্রীষ্টাব্দে যে রাজস্ব জমিদারগণের নিকট হইতে গ্রহণ করা হইতেছিল, উহা ন্যায্য রাজস্ব অপেক্ষা অনেক বেশি ছিল। সেজন্য জমিদারি জরিপ না করিয়া খাজনা নির্ধারণ অন্যায়মূলক হইবে, এই কথার উপর জন শোর জোর দিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন জমিদারগণকে যদি জমির মালিক বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে রায়তদের ও জমিদারগণের পরস্পর সম্পর্কে হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা কোম্পানির আর থাকিবে না, ফলে, রায়তদের দুর্দশার সৃষ্টি হইতে পারে। কিন্তু ইংলণ্ডের রাজস্ব-ব্যবস্থা ও জমিদারি অভিজ্ঞতাসম্পন্ন লর্ড কর্ণওয়ালিস এদেশের জমিদারগণকেই জমির মালিক বলিয়া ধরিয়া লইলেন এবং প্রজা ও জমিদারগণের পরস্পর সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা কোম্পানির হস্তে রাখা হইবে বলিয়া স্থির করিলেন।

রাজস্বের পরিমাণ-নির্ধারণ, রায়তদের জমিদারগণের অত্যাচার হইতে রক্ষা এবং জমির মালিকানার প্রশ্ন

কর্ণওয়ালিস চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের নির্দেশ ডাইরেক্টর সভার নিকট হইতে পাইয়াছিলেন। সুতরাং এ বিষয়ে তিনি শোর-এর মতামত অগ্রাহ্য করিয়া ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে ১০ই ফেব্রুয়ারি প্রচলিত বাৎসরিক বন্দোবস্ত দশ বৎসরের জন্য চালু থাকিবে এবং ডাইরেক্টর সভা কর্তৃক অনুমোদিত হইলে উহাই চিরস্থায়ী করা হইবে, এই ঘোষণা করিলেন। ডাইরেক্টর সভার অনুমোদন ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে সেপ্টেম্বর আসিয়া পৌঁছিলে

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তন (মার্চ ২২, ১৭৯৩)

১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে মার্চ প্রচলিত বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী বলিয়া ঘোষিত হইল।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের গুণাগুণ (Merits and defects of the Permanent Settlement) : (১) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সম্ভাব্য অপগুণ সম্পর্কে কর্ণওয়ালিস বা ডাইরেক্টর সভা অবহিত ছিলেন না, এমন নহে। কোম্পানির ডাইরেক্টর সভার সহিত কর্ণওয়ালিসের পত্রালাপ এবং শোর-কর্ণওয়ালিস বিতর্ক হইতে একথা প্রমাণিত হইবে। কিন্তু কোম্পানির রাজস্ব-আয় সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হওয়া এবং বাৎসরিক বাজেট প্রস্তুতের সুবিধার জন্যই প্রধানতঃ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হইয়াছিল এবং ইহাই ছিল এই বন্দোবস্তের প্রধান গুণ। (২) জমিদারগণ জমির মালিক বলিয়া স্বীকৃত হওয়ার ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে যে জমির এবং প্রজাবর্গের উন্নতি সাধিত না হইয়াছিল এমন নহে। বাংলাদেশে এমন বহু দৃষ্টান্ত আছে যেখানে জমিদারগণ প্রজাবর্গের উপকারার্থে পুষ্করিণী-খনন, বিদ্যালয়, চিকিৎসালয় প্রভৃতি স্থাপনের জন্য অকাতরে অর্থদান করিয়াছেন। দুর্ভিক্ষ, মহামারীর সময়েও জমিদারগণ প্রজাবর্গকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, এইরূপ প্রমাণও পাওয়া যায়। (৩) গ্রামাঞ্চলের ক্ষুদ্র শিল্পগুলিও জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতায় উন্নতি লাভ করিয়াছিল। (৪) চির-স্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে যে জমিদার শ্রেণীর উদ্ভব ঘটিয়াছিল, উহা স্বভাবতই কোম্পানির নির্ভরযোগ্য সমর্থক শ্রেণীতে পরিণত হইয়াছিল।

গুণ

কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের গুণ অপেক্ষা অপগুণের পরিমাণই যে বেশি ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। খ্যাতনামা ইতিহাস-সাহিত্য রচয়িতা হান্টার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অপগুণ-গুলির সুযৌক্তিক ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রথমত, এই বন্দোবস্তে জমিদারদের অধীনে জমি জরিপ না করিয়া, কি পরিমাণ নিষ্কর ভূমি ছিল এবং কি পরিমাণ ভূমি পশুচারণ হিসাবে ব্যবহৃত হইতেছিল সে সকল বিষয়ে কোন প্রকার খোঁজ-খবর না লইয়া-ই রাজস্ব নির্ধারিত হইয়াছিল। ফলে, রাজস্বের হার অত্যধিক বেশি হইয়াছিল। জমিদারগণের নিকট হইতে মোটামুটিভাবে যে ধারণা পাওয়া গিয়াছিল উহাই ছিল রাজস্ব-নির্ধারণের ভিত্তি। জন শোর

অপগুণ

(১) জরিপ না করিয়া রাজস্ব-নির্ধারণের ত্রুটি

১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে ডিসেম্বরের পত্রে জমিদারগণের ভূসম্পত্তির সঠিক জরিপ না করিয়া রাজস্ব-নির্ধারণের অযৌক্তিকতার কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন। এইভাবে জমিদারির প্রকৃত সীমা নির্দেশিত না হওয়ার ফলে অসংখ্য মামলা-মোকদ্দমা এবং নানাপ্রকার অব্যবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল।

(২) নির্দিষ্ট সময়ে খাজনা অনাদায়ে জমিদারি নিলাম

দ্বিতীয়ত, নির্দিষ্ট সময়ে রাজস্ব অনাদায়ে জমিদারি নিলাম করিয়া অনাদায়িকৃত রাজস্ব আদায় করিয়া লইবার ব্যবস্থা থাকায় বহু প্রাচীন জমিদার পরিবার তাঁহাদের জমিদারি হারাইয়াছিলেন। আরামপ্রিয় জমিদার শ্রেণীর নিকট হইতে নিয়মিতভাবে এবং সময়মত রাজস্ব পাইবার আশা সফল হয় নাই। তদুপরি রাজস্বের হার অত্যধিক হওয়ায় সময়মত রাজস্ব দেওয়া জমিদারদের পক্ষে কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল, ফলে মাত্র ২২ বৎসরের মধ্যে প্রায় অর্ধেক সংখ্যক জমিদারি বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল। যে সকল জমিদার সামন্ত-প্রথার অনুকরণে নির্দিষ্ট পরিমাণ খাজনা দিবার শর্তে তালুকদার, ইজারাদার প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদারদের নিকট জমি বন্দোবস্ত দিতে পারিয়াছিলেন কেবলমাত্র সেই সকল জমিদারই টিকিয়া থাকিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

(৩) রায়তদের উপর জমিদারদের অত্যাচার

তৃতীয়ত, লর্ড কর্ণওয়ালিস আশা করিয়াছিলেন যে, জমিদারগণ যেমন নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব দিবার শর্তে জমি ভোগদখলের স্থায়ী অধিকার কোম্পানির নিকট হইতে লাভ করিয়াছিলেন, ঠিক অনুরূপ শর্তে তাঁহারাও রায়তদের জমি বন্দোবস্ত দিবেন। কিন্তু তাঁহার এই আশা মিথ্যা প্রমাণিত হইয়াছিল। পরবর্তী অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়াছিল যে, অতি সামান্য কারণে এমন কি বিনা কারণেও জমিদারগণ রায়তদের জমি হইতে উচ্ছেদ করিতে দ্বিধাবোধ করিতেন না।

(৪) রায়তদের দুর্দশা

চতুর্থত, অতি উচ্চহারে রাজস্ব নির্ধারিত হওয়ায় জমিদারগণ রায়তদের নিকট হইতে উচ্চহারে খাজনা আদায় করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ফলে রায়তদের আর্থিক দুর্দশা বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

পঞ্চমত, ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে জমির যে মূল্য ছিল, পরবর্তী কালে উহা বহুগুণে বৃদ্ধি পাইলেও রাজস্বের পরিমাণ বাড়াইবার কোন অবকাশ ছিল না। ফলে, সরকার সেই বর্ধিত মূল্য-জনিত লাভের (unearned increment) অংশ হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন।

(৫) জমির মূল্যবৃদ্ধি-জনিত লাভের অংশ হইতে সরকার বঞ্চিত

ষষ্ঠত, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদারগণ জমির উন্নয়নে সচেষ্ট হইবেন বলিয়াই কর্ণওয়ালিস আশা করিয়াছিলেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে জমিদারগণ জমির উন্নতি-সাধনে সচেষ্ট না হইলেও জমি তাঁহাদের হস্তচ্যুত হইবার কোন আশঙ্কা নাই, এজন্য এবিষয়ে তাঁহারা মোটেই মনোযোগী হইলেন না। অপর পক্ষে রায়তগণ জমিতে তাহাদের কোন অধিকার না থাকায় স্বভাবতই জমির উন্নয়নের কোন চেষ্টা করিল না।

(৬) জমির উন্নয়ন ব্যাহত

সপ্তমত, পরবর্তী কালে জমিদারগণ যখন গ্রাম ত্যাগ করিয়া শহরে বসবাস করিতে লাগিলেন এবং নায়েব-গোমস্তার সাহায্যে খাজনা আদায়ের ব্যবস্থা করিলেন তখন রায়তদের দুর্দশা চরমে পৌঁছিল। নায়েব-গোমস্তাগণ নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য রায়তগণকে উৎপীড়ন করিতে দ্বিধাবোধ করিল না। ইহা ভিন্ন গ্রামের কৃষকদের শ্রমে উৎপন্ন আয় হইতে খাজনা আদায় করিয়া আনিয়া উহা শহর এলাকায় ব্যয় করিবার ফলে গ্রামের আর্থিক সমৃদ্ধিও দিন দিন হ্রাস পাইতে লাগিল। এই সকল কারণে কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইলেও ত্রুটিপূর্ণ ছিল (benevolent blunder), একথা বলা হইয়া থাকে।

(৭) নায়েব-গোমস্তার অত্যাচার

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দোষ-ত্রুটি দূরীকরণের চেষ্টা (Remedial Measures): চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দোষ-ত্রুটি যখন ক্রমেই পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে লাগিল তখন সরকার সেগুলি দূর করিবার উদ্দেশ্যে কয়েকটি আইন প্রবর্তন করিতে বাধ্য হইলেন।

রাজস্ব আইন (১৮৫৯) (Rent Act)

(১) ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে 'রাজস্ব আইন' (Rent Act) পাস করিয়া লর্ড ক্যানিং অন্যায়ভাবে রায়তদের উচ্ছেদ করা বা অন্যায্যভাবে

খাজনা বৃদ্ধি করা নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। (২) ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা-দেশে প্রজাস্বত্ব আইন (Tenancy Act) পাস করিয়া কয়েকটি বিশেষ কারণ ভিন্ন রায়তগণকে জমি হইতে উচ্ছেদ করা নিষিদ্ধ হইল। এইভাবে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আইনের দ্বারা রায়তগণের অধিকার রক্ষার চেষ্টা করা হইল।

প্রজাস্বত্ব আইন (১৮৮৫, ১৯২৮, ১৯৩৮)

১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে 'রায়তি স্থিতিবান' স্বত্ব বিক্রয়ের অধিকার রায়তগণকে দেওয়া হইল। কিন্তু রায়ত জমির স্বত্ব বিক্রয় করিয়া যাহা পাইবে উহার এক-পঞ্চমাংশ জমিদারকে 'হস্তান্তর মূল্য' (Transfer fee) হিসাবে দিতে হইত। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে এই 'হস্তান্তর মূল্য' দেওয়ার নিয়ম রহিত করা হইল। স্বাধীনতার পর ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত উঠাইয়া দিয়া রায়তদের সঙ্গে সরাসরি জমি বন্দোবস্ত দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ

লর্ড কর্ণওয়ালিস ও মারাঠাগণ (Lord Cornwallis & the Marathas): ওয়ারেন হেস্টিংস্ মারাঠাগণ ও হায়দর আলির শত্রুতা হইতে ব্রিটিশ স্বার্থ রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেও সম্পূর্ণভাবে ব্রিটিশ স্বার্থের নিরাপত্তা বিধান করিতে পারেন নাই। সল্‌বই-এর সন্ধির পর মারাঠাদের সহিত দীর্ঘ বিশ বৎসর ধরিয়া মোটামুটিভাবে ইংরাজদের পক্ষে শান্তি রক্ষা করিয়া চলা সম্ভব হইলেও মারাঠাগণ যে ইংরাজদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন রহিয়া গিয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কর্ণওয়ালিস্ যখন গবর্নর-জেনারেল পদে নিযুক্ত হইয়া আসিলেন তখন পিট্-এর ভারত আইন (Pitt's India Act)-এর শর্তানুযায়ী তাঁহাকে দেশীয় রাজগণের সহিত যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত না হইবার সুস্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। এজন্য তিনি শাহ্ আলমের পুত্রকে দিল্লীর সিংহাসন লাভে সাহায্য করিতে স্বীকৃত হন নাই। কিন্তু ভারতবর্ষের তদানীন্তন অবস্থায় নিরপেক্ষ-নীতি (Policy of non-intervention) অনুসরণ করা সম্ভব হইল না। কর্ণওয়ালিস মারাঠা ও নিজামের সহিত টিপু সুলতানের বিরুদ্ধে এক শক্তিসংঘ স্থাপন করিলেন। মারাঠাদের সহিত কর্ণওয়ালিস মিত্রতা রক্ষা করিয়া চলিলেও ব্রিটিশের অধীন মিত্রশক্তি অযোধ্যা রাজ্যে মাহ্‌দজী সিন্ধিয়া যাহাতে কোনরূপ

ইঙ্গ-মারাঠা-নিজাম মৈত্রী

গোলযোগের সৃষ্টি না করিতে পারেন সেজন্য তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই।

তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ, ১৭৯০-৯২ (The Third Anglo-Mysore War): ম্যাঙ্গালোর-এর সন্ধি (১৭৮৪) দ্বারা দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের অবসান ঘটিয়াছিল বটে, কিন্তু ইহা দ্বারা ইঙ্গ-মহীশূর বিরোধিতার কোন স্থায়ী মীমাংসা হয় নাই। এই কারণে ম্যাঙ্গালোর-এর সন্ধি নামেমাত্রই শান্তি আনিয়াছিল। টিপু সুলতান এবং ইংরাজগণেরও একথা জানা ছিল যে, অনতিবিলম্বেই উভয়পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিবে। টিপু সুলতান এবং ইংরাজদের মধ্যে একপক্ষ দাক্ষিণাত্য হইতে উৎখাত না হইলে এই দুইয়ের যুদ্ধ চলিবেই, একথা কাহারও অজানা ছিল না। দুর্ধর্ষ স্বাধীনচেতা বীর টিপু দাক্ষিণাত্য হইতে ইংরাজ প্রাধান্য বিনাশ করিতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। তিনি এইজন্য গোপনে ফ্রান্স ও কন্‌স্টান্টিনোপল্, মরিশাস, কাবুল প্রভৃতি স্থানে সামরিক সাহায্য চাহিয়া দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন।

পরোক্ষ কারণ

যাহা হউক, ম্যাঙ্গালোর-এর সন্ধির পরবর্তী কয়েক বৎসরের মধ্যে দাক্ষিণাত্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতির এক দ্রুত পরিবর্তন ঘটিতেছিল। ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিস নিজামের নিকট হইতে গুণ্টুর নামক স্থানটি প্রাপ্তির বিনিময়ে ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দের বিস্মৃত-প্রায় মসুলিপত্তমের সন্ধির শর্তগুলি পুনরায় অনুমোদন করিয়া প্রয়োজনবোধে নিজামকে সামরিক সাহায্যদানে স্বীকৃত হইলেন। পর বৎসর (১৭৮৯) কর্ণওয়ালিস নিজামের নিকট এক শক্তিসংঘ গঠনের প্রস্তাব করিলেন, কিন্তু ইহাতে টিপুকে গ্রহণ করিবার কোন ইচ্ছা প্রকাশ করা হইল না। টিপুকে এবিষয়ে কোন সংবাদও দেওয়া হইল না। ঐতিহাসিক উইলকৃস্ (Wilks) ও সার্ জন ম্যাল্‌কম (Sir John Malcolm) কর্ণওয়ালিসের এই আচরণ টিপুর সহিত মিত্রতা-চুক্তির বিরোধী এবং টিপুর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার সামিল বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।* এমতাবস্থায় টিপু ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য আক্রমণ করিলে (১৭৮৯) তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের সূচনা হইল। ত্রিবাঙ্কুরের রাজা ম্যাঙ্গালোর-এর সন্ধির শর্তানুযায়ী ইংরাজদের নিকট সামরিক সাহায্য

প্রত্যক্ষ কারণ

* Vide *An Advanced History of India*, pp. 686-87.

দাবি করিতে পারিতেন। সেই অনুসারে তিনি মাদ্রাজ সরকারের নিকট সাহায্যের জন্য আবেদন করিয়াও কোন সাহায্য পাইলেন না। লর্ড কর্ণওয়ালিস মাদ্রাজ সরকারের তীব্র নিন্দা করিলেন এবং মারাঠা ও নিজামের সহিত এক 'ত্রয়ী-শক্তি-মৈত্রী' (Triple Alliance) স্বাক্ষর করিয়া টিপুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। কর্ণওয়ালিস স্বয়ং ইংরাজ বাহিনীর সেনাপতিত্ব গ্রহণ করিলেন। প্রথমে তিনি টিপুর বিরুদ্ধে সাফল্যলাভে সমর্থ না হইলেও শেষ পর্যন্ত টিপুকে পরাজিত করিয়া শ্রীরঙ্গপত্তমের সন্ধি স্বাক্ষর করিতে বাধ্য করিলেন (মার্চ, ১৭৯২)। এই সন্ধি দ্বারা ইংরাজগণ মালাবার, পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসহ দিন্দিগুল ও বড়মহল দখল করিল। উহা ভিন্ন কুর্গ-এর রাজার উপর মহীশূরের সুলতানের স্থলে ইংরাজদের প্রভুত্ব স্বীকৃত হইল। কৃষ্ণা হইতে পেনার নদী পর্যন্ত রাজ্যাংশ নিজামকে এবং তুঙ্গভদ্রা নদীর নিকটবর্তী অঞ্চল মারাঠাগণকে ছাড়িয়া দিতে হইল। এইভাবে টিপুর রাজ্যের অর্ধেকাংশ ইংরাজ-মারাঠা-নিজাম মিত্রসংঘ কর্তৃক অধিকৃত হইল।

ত্রয়ী-শক্তি-মৈত্রী (Triple Alliance)

শ্রীরঙ্গপত্তমের সন্ধি (১৭৯২)

ম্যাঙ্গালোর-এর সন্ধির শর্তাদি উপেক্ষা করিয়া লর্ড কর্ণওয়ালিস কিভাবে টিপু সুলতানকে তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে বাধ্য করিয়াছিলেন সেবিষয়ে আলোচনা পূর্বেই করা হইয়াছে। শ্রীরঙ্গপত্তমের সন্ধির পর কর্ণওয়ালিস সমগ্র মহীশূর রাজ্য দখল করেন নাই বলিয়া ইংরাজ ঐতিহাসিকগণের মধ্যে অনেকে, যথা, মান্রো (Munro), থর্নটন (Thornton) প্রভৃতি বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের যুদ্ধ তখন আসন্ন-প্রায়। এমতাবস্থায় টিপুর সহিত ফরাসীদের মিত্রতাস্থাপনের যথেষ্ট আশঙ্কা ছিল। তদুপরি শান্তিস্থাপনের জন্য ডাইরেক্টর সভার পুনঃপুনঃ নির্দেশ, ইংরাজ সেনাবাহিনীর মধ্যে ব্যাপক অসুস্থতা প্রভৃতি কারণেও কর্ণওয়ালিস শান্তি-স্থাপনে বাধ্য হইয়াছিলেন। অব্যবস্থিতচিত্ত নিজাম এবং দুর্ধর্ষ মারাঠাদের মন হইতে মহীশূর রাজ্যের ভীতি সম্পূর্ণভাবে দূরীভূত হওয়া ইংরাজ স্বার্থের দিক দিয়াও বাঞ্ছনীয় ছিল না। ইহা ভিন্ন সমগ্র মহীশূর রাজ্য ইংরাজ অধিকারভুক্ত হইলে নিজাম ও মারাঠাগণের ঈর্ষা ও বিদ্বেষের

কর্ণওয়ালিসের মহীশূর-নীতির সমালোচনা

উদ্রেক হইত। সুতরাং ব্রিটিশ স্বার্থের দিক হইতে বিচার করিলেও শ্রীরঙ্গপত্তমের সন্ধিস্থাপনে কর্ণওয়ালিসের বিরুদ্ধে কোন সমালোচনা করা যাইতে পারে না।

সনন্দ বা চার্টার এ্যাক্ট, ১৭৯৩ (Charter Act, 1793) : ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে রেগুলেটিং এ্যাক্ট্ অনুসারে ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভারতবর্ষে আরও বিশ বৎসর বাণিজ্য করিবার একচেটিয়া অধিকার লাভ করিয়াছিল। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় কোম্পানিকে ভারতবর্ষে বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার দেওয়ার বিরুদ্ধে ইংলণ্ডে এক তীব্র আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। ভারতীয় বাণিজ্য সকল ইংরাজ বণিক এবং বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানের নিকট-ই সমভাবে উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া-ই ছিল এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য। লর্ড কর্ণওয়ালিস কোম্পানির একচেটিয়া অধিকার উঠাইয়া দিলে স্বার্থ-লোলুপ ইংরাজ বণিকদের পরস্পর প্রতি-যোগিতায় ইংলণ্ডে ভারতীয় বাণিজ্যের সর্বনাশ ঘটিবে এই যুক্তি প্রদর্শন করিয়া কোম্পানির একচেটিয়া অধিকার বজায় রাখিতে সমর্থ হইলেন। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে চার্টার এ্যাক্ট্ দ্বারা আরও বিশ বৎসরের জন্য ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে ভারতবর্ষে বাণিজ্য-পরিচালনার একচেটিয়া অধিকার ভোগ করিতে দেওয়া হইল। অবশ্য বৎসরে মোট তিন হাজার টন পণ্যদ্রব্যাদি সাধারণ বণিকগণের ভারতবর্ষ হইতে ক্রয় করিবার অতি নগণ্য অধিকারও ঐ চার্টার দ্বারা স্বীকৃত হইয়াছিল। কোম্পানির গঠন-তন্ত্র সম্পর্কিত কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এই চার্টারে করা হয় নাই।

ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক বিশ বৎসরের জন্য পুনরায় বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার লাভ

সার্ জন শোর, ১৭৯৩-৯৮ (Sir John Shore) : ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে লর্ড কর্ণওয়ালিস গবর্ণর-জেনারেল-পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিলে সার্ জন শোর গবর্ণর-জেনারেল-পদে উন্নীত হইলেন। সার জন শোর বাংলাদেশের রাজস্ব-ব্যবস্থা সম্পর্কে তৎকালীন ইংরাজ কর্মচারিগণের মধ্যে সর্বাধিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ছিলেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্বে লর্ড কর্ণওয়ালিসের সহিত তাঁহার আলোচনামূলক বিতর্কের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে।

সার্ জন শোর-এর পূর্ব-পরিচয়

শোর ছিলেন না-হস্তক্ষেপ বা নিরপেক্ষ-নীতির (non-intervention policy) সমর্থক। গবর্ণর-জেনারেল-পদে উন্নীত হইয়া-ই তিনি দেশীয়

শক্তিগুলির পরস্পর দ্বন্দ্ব হইতে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত থাকিতে কৃতসংকল্প হইলেন। জন শোর-এর এই 'নিরপেক্ষ-নীতি' বহু ঐতিহাসিক কর্তৃক কঠোরভাবে সমালোচিত হইয়াছে। সেই সময়ে ভারতে ব্রিটিশ শক্তির মর্যাদা ও প্রতিপত্তি হ্রাসের জন্য শোর-কে দায়া করা হইয়া থাকে। কিন্তু নিরপেক্ষ বিচারে শোর কর্তৃক নিরপেক্ষ নীতির যৌক্তিকতা পরিস্ফুট হইবে।

তাঁহার 'না-হস্তক্ষেপ' বা 'নিরপেক্ষ-নীতি' (Policy of non-intervention)

মারাঠাগণ ছিল ইংরাজদের সর্বাপেক্ষা দুর্ধর্ষ এবং শক্তিশালী শত্রু। সাময়িকভাবে মারাঠাদিগকে ইংরাজদের পক্ষে আনা সম্ভব হইলেও তাহাদের পক্ষে ইংরাজদের বিরুদ্ধে যাইতে অধিক বিলম্ব লাগিবে না, একথা জন শোর ভালভাবেই জানিতেন। মারাঠা-মহীশূর মৈত্রীর বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করিবার মতো শক্তি সেই সময়ে ইংরাজদের ছিল না। উপযুক্ত সেনা-নায়কের অভাব, ইংরাজ সেনাবাহিনীর মধ্যে ভারতীয়দের সংখ্যাধিক্য, সর্বোপরি তৃতীয় মারাঠা যুদ্ধের ফলে ঋণগ্রস্ততা সেই সময়ে ইংরাজদের দুর্বলতার কারণ ছিল। সার্ জন শোর মনে করিতেন যে, মারাঠাদিগকে যদি বহিরাক্রমণের ভীতি হইতে মুক্ত রাখা যায়, তাহা হইলে মারাঠাদের রাজ্যপঞ্চক—পেশওয়া, সিন্ধিয়া, হোলকার, ভোঁসলে, গাইকোয়াড়—আত্মকলহে লিপ্ত হইয়া নিজেদের সর্বনাশ ডাকিয়া আনিবে। অথচ ইংরাজদের সহিত শত্রুতার কোন কারণ ঘটিলে তাহারা ঐক্যবদ্ধ হইয়া ইংরাজদের বিরোধিতা করিবে। এবিষয়ে শোর কর্ণওয়ালিসের প্রদর্শিত পন্থা অনুসরণ করিতেছিলেন মাত্র। জন শোর-এর সপক্ষে একথাও বলা যাইতে পারে যে, ব্রিটিশ শক্তির প্রসার-সাধনের জন্য মাঝে মাঝে যুদ্ধ-বিরতিরও প্রয়োজন ছিল। জন শোর-এর শাসনকালে শান্তি-নীতি এই প্রয়োজনও কতকাংশে মিটাইয়াছিল, বলা বাহুল্য।

জন শোর-এর 'নিরপেক্ষ-নীতি'র সমালোচনা

জন শোর তাঁহার নিরপেক্ষ-নীতি অনুসরণ করিতে গিয়া ব্রিটিশদের পূর্ব-প্রতিশ্রুতি উপেক্ষা করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে মারাঠাগণ নিজামরাজ্য আক্রমণ করিলে নিজাম ইংরাজদের সহিত স্বাক্ষরিত চুক্তির শর্তানুসারে সামরিক সাহায্য চাহিলেন। কিন্তু জন শোর তাঁহার নিরপেক্ষতার নীতি অনুসরণ করিতে গিয়া কোন সাহায্য প্রেরণ করিলেন না। ফলে, খর্দা (Kharda)-এর যুদ্ধে মারাঠা-হস্তে নিজামের শোচনীয় পরাজয় ঘটিল

খর্দা-এর যুদ্ধ (১৭৯৫) : মারাঠা হস্তে নিজামের পরাজয়

(১৭৯৫)। ইংরাজদের প্রতিশ্রুতি-ভঙ্গে নিজাম স্বভাবতই ক্রুদ্ধ হইলেন। সুতরাং তিনি আত্মরক্ষার্থ ফরাসীদের সহায়তালাভের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত সার্ জন শোরকে নিরপেক্ষতার নীতি ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে নবাব আসফ্-উদ্-দৌলার মৃত্যু হইলে অযোধ্যায় এক উত্তরাধিকার-দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয়। অযোধ্যা কোম্পানির আশ্রিত রাজ্য, এই কারণে উত্তরাধিকার-দ্বন্দ্বে জন শোর হস্তক্ষেপ করিলেন। তিনি আসফ্-উদ্-দৌলার ভ্রাতা সাদাৎ আলি এবং আসফ্-উদ-দৌলার অবৈধ সন্তান ওয়াজীর আলির মধ্যে ওয়াজীর আলিকেই প্রথমে সমর্থন করিলেন। কিন্তু পরে ওয়াজীর আলির দাবি অবৈধ বিবেচনা করিয়া সাদাৎ আলিকে অযোধ্যার নবাব-পদে অধিষ্ঠিত করিলেন। বিনিময়ে তিনি এলাহাবাদ কোম্পানির রাজ্যভুক্ত করিলেন এবং বাৎসরিক ৭৬ লক্ষ টাকা অর্থসাহায্য কোম্পানিকে দেওয়া হইবে এই শর্তে অযোধ্যার নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন। অবশ্য জন শোর কর্তৃক নিরপেক্ষতার নীতি পরিত্যাগের পশ্চাতে কাবুল অধিপতি জামান শাহের ভারত আক্রমণের ভীতি অন্যতম কারণ ছিল একথা মনে করা অনুচিত হইবে না।

শোর-এর অযোধ্যা-নীতি

শোর-এর কার্যকালের শেষভাগে ইংরাজ কর্মচারিবর্গের মধ্যে এক প্রকাশ্য বিদ্রোহ দেখা দিলে তিনি বাধ্য হইয়া-ই তাহাদের কতকগুলি দাবি মানিয়া লইলেন। ইংরাজ কর্মচারিবর্গের কার্য-নীতি ও নিয়মানুবর্তিতা সম্পর্কে কর্ণওয়ালিস-প্রবর্তিত নিয়ম (Cornwallis Code)-এর বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হিসাবেই এই বিদ্রোহের সৃষ্টি হইয়াছিল। যাহা হউক, এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই জন শোরকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের আদেশ দেওয়া হইল। ইংলণ্ডে পৌঁছিবার পর তাঁহাকে লর্ড টেন্‌মাউথ (Lord Teignmouth) উপাধিতে ভূষিত করা হইয়াছিল।

ইংরাজ কর্মচারিগণের বিদ্রোহ ঃ শোর-এর প্রতি প্রত্যাবর্তনের আদেশ

ষষ্ঠ অধ্যায়

লর্ড ওয়েলেস্‌লী ঃ অধীনতা-মূলক মিত্রতা ঃ মহীশূর রাজ্যের পতন

(Lord Wellesley : Subsidiary Alliance : Fall of Mysore)

লর্ড ওয়েলেস্‌লীর নিয়োগ (১৭৯৮-১৮০৫) ঃ তাঁহার সমস্যা (Appointment of Lord Wellesley : His difficulties) : সার্‌ জন শোর্‌-এর পর লর্ড ওয়েলেস্‌লী, আর্ল অব্ মর্ণিংটন (Lord Wellesley, Earl of Mornington) গবর্ণর-জেনারেল-পদে নিযুক্ত হইয়া ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ভারতবর্ষে আসিয়া পৌঁছিলেন। কোম্পানির ইংলণ্ডস্থ বোর্ড-অব-কণ্ট্রোল (Board of Control)-এর কমিশনার হিসাবে লর্ড ওয়েলেস্‌লী কোম্পানির ভারতীয় রাজ্য সম্পর্কে অভিজ্ঞতালাভের যথেষ্ট সুযোগ পাইয়াছিলেন। বস্তুত একমাত্র লর্ড কার্জন ভিন্ন অপর কোন গবর্ণর-জেনারেল ভারতীয় শাসন-ব্যবস্থা বা কোম্পানির সমস্যা সম্পর্কে এতটা সুস্পষ্ট ধারণা লইয়া ভারতবর্ষে আসেন নাই। তিনি ছিলেন বিদ্বান, প্রতিভাবান ও অভিজাতসুলভ আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি। তিনি ছিলেন ঘোর সাম্রাজ্যবাদী। তিনি যখন ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন তখন তাঁহার সাম্রাজ্যবাদী নীতি কার্যকরী করিবার পক্ষে সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু এই সুযোগের আনুষঙ্গিক জটিলতারও সীমা ছিল না।

কোম্পানির রাজ্য সম্পর্কে ওয়েলেস্‌লীর পূর্ব অভিজ্ঞতা

সার্‌ জন শোর-এর নিরপেক্ষতার নীতির সুযোগ গ্রহণ করিয়া টিপু সুলতান শ্রীরঙ্গপত্তমের সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করিতেছিলেন। ফরাসী, তুর্কী প্রভৃতি জাতির সাহায্যলাভের জন্য টিপু তখন সচেষ্ট। খর্‌দা-এর যুদ্ধে ইংরাজদের প্রতিশ্রুত সাহায্য না পাওয়ায় নিজাম স্বভাবতই ইংরাজদের উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া ফরাসী সহায়তা গ্রহণে উদ্‌গ্রীব। এদিকে সিন্ধিয়ার শক্তিও ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়াছে। কাবুলের অধিপতি জামান শাহ্ ভারত আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন এই সংবাদও তখন ভীতির সঞ্চার

ওয়েলেস্‌লীর সমস্যা

করিয়াছে। সর্বোপরি ব্রিটিশ জাতির উপর পরোক্ষভাবে আঘাত হানিবার উদ্দেশ্যে নেপোলিয়ন বোনাপার্টি মিশরের মধ্য দিয়া ভারতবর্ষে পৌঁছিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। এইরূপ আভ্যন্তরীণ এবং বহিরাগত আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে যখন ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির রাজনৈতিক পরিস্থিতি সমস্যা-সংকুল হইয়া উঠিয়াছে তখন প্রয়োজন ছিল একজন বিচক্ষণ, দূরদর্শী ও নির্ভীক শাসকের। লর্ড ওয়েলেস্‌লীর নিয়োগ এই প্রয়োজন সম্পূর্ণভাবে মিটাইয়াছিল বলা বাহুল্য।

ওয়েলেস্‌লীর উদ্দেশ্য ও নীতি (Wellesley's Aims and Policy) : ওয়েলেস্‌লী চাহিয়াছিলেন ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শক্তিকে সর্বাত্মক করিয়া তুলিতে। ভারতীয় উপ-মহাদেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য একটি ক্ষুদ্র অংশ জুড়িয়া থাকুক ইহা তাঁহার উচ্চাকাঙ্ক্ষী মন কখনও সমর্থন করিত না। সুতরাং ভারতবর্ষকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে পরিণত করাই ছিল তাঁহার অন্তরের বাসনা। ইহা ভিন্ন ভারতবর্ষ হইতে ফরাসী প্রভাব দূর করিয়া ফরাসীদের পক্ষে সাম্রাজ্য গঠনের চেষ্টা বিফল করাও ছিল তাঁহার অন্যতম ইচ্ছা।

তাঁহার উদ্দেশ্য

উপরি-উক্ত উদ্দেশ্য সফল করিয়া তুলিবার জন্য স্বভাবতই সাম্রাজ্যবাদী নীতি অনুসরণ করার প্রয়োজন হইল। পরস্পর-বিবদমান ভারতীয় নৃপতিগণকে ইওরোপীয় সামরিক সাহায্য গ্রহণে উদ্‌গ্রীব দেখিয়া ওয়েলেস্‌লী তাঁহাদিগকে ব্রিটিশ সামরিক সাহায্যের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল করিয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এই নীতি ওয়েলেস্‌লীর পূর্বে লর্ড ক্লাইভ এবং বিশেষভাবে ওয়ারেন হেস্টিংস্ কর্তৃক অনুসৃত হইয়াছিল। ওয়েলেস্‌লী এই নীতিকে ব্যাপকভাবে এবং চরম নিপুণতার সহিত কার্যকরী করিয়াছিলেন। সামরিক অধীনতার ভিত্তিতে গঠিত বলিয়া ওয়েলেস্‌লী তাঁহার প্রবর্তিত নীতির নামকরণ করিলেন 'অধীনতামূলক মিত্রতা' (Subsidiary Alliance)

তাঁহার নীতি : 'অধীনতামূলক মিত্রতা

(১) যে-সকল দেশীয় নৃপতি অধীনতামূলক মিত্রতায় আবদ্ধ হইবেন তাঁহারা ইংরাজদের বিনা-অনুমতিতে অপর কোন রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে বা কোনপ্রকার আলাপ-আলোচনা চালাইতে পারিবেন না। (২) দেশীয় নৃপতিবর্গের মধ্যে

অধীনতামূলক মিত্রতার শর্তাদি

যাঁহারা শক্তিশালী তাঁহারা নিজ সেনাবাহিনী রাখিতে পারিবেন, কিন্তু সেই সেনাবাহিনীর সেনাপতি হিসাবে একজন ইংরাজকে নিযুক্ত করিতে হইবে। (৩) অধীনতামূলক মিত্রতার চুক্তিতে আবদ্ধ নৃপতিগণের রাজ্যের নিরাপত্তার দায়িত্ব কোম্পানি গ্রহণ করিবে, কিন্তু সেই জন্য যে সেনাবাহিনী পোষণ করিতে হইবে উহার ব্যয় সংকুলানের জন্য তাঁহাদিগকে নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজ্যাংশ ছাড়িয়া দিতে হইবে। সুতরাং ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, ব্রিটিশ প্রাধান্য এবং সাম্রাজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্য লইয়া ওয়েলেস্‌লী তাঁহার অধীনতামূলক মিত্রতা নীতির প্রবর্তন করিয়াছিলেন। এই নীতি সাফল্যের সহিত প্রয়োগ করিতে পারিলে ফরাসীদের পক্ষে ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তার করা সম্ভব হইবে না, ইহাও ওয়েলেস্‌লী উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

অধীনতামূলক মিত্ররাজ্যসমূহ :

তদানীন্তন ভারতের সর্বাপেক্ষা হীনচেতা, দুর্বলচিত্ত ও আত্মমর্যাদা-হীন হায়দরাবাদের নিজাম সর্বপ্রথমেই কোম্পানির সহিত অধীনতামূলক মিত্রতাবদ্ধ হইলেন। জন শোর নিজামকে ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে খর্‌দা-এর যুদ্ধের কালে সাহায্য না দেওয়ার ফলে নিজাম ব্রিটিশের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন।

হায়দরাবাদ

ওয়েলেস্‌লীর চেষ্টায় নিজাম পুনরায় ব্রিটিশের পক্ষে-ই শুধু আসিলেন না, ব্রিটিশের অধীন মিত্রে পরিণত হইলেন। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে নিজাম ব্রিটিশ সৈন্যের ব্যয় বাবদ নগদ অর্থের পরিবর্তে তুঙ্গভদ্রা ও কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণস্থ রাজ্যাংশ কোম্পানিকে ছাড়িয়া দিলেন।

ওয়ারেন হেস্টিংসের শাসনকাল হইতেই অযোধ্যার সামরিক নিরাপত্তার ভার প্রধানত কোম্পানির উপর ন্যস্ত ছিল। কোম্পানির সাহায্যের বিনিময়ে অযোধ্যার নবাবকে বাৎসরিক একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দিতে হইত। জন শোর-এর আমলে উহা বাৎসরিক ৭৬ লক্ষ টাকায় স্থিরীকৃত হইয়াছিল। ওয়েলেস্‌লী ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে অযোধ্যার নবাবের সহিত এক নূতন চুক্তি স্বাক্ষর করিলেন। এই চুক্তির দ্বারা পূর্বেকার বাৎসরিক অর্থ-দানের পরিবর্তে নবাব রোহিলখণ্ড, গোরক্ষপুর এবং দোয়াব-এর একাংশ* কোম্পানির নিকট হস্তান্তরিত করিলেন। এই চুক্তির

অযোধ্যা

* 'These were known as the Ceded Districts'; Vide Sinha & Banerjee, p. 538.

শর্তানুসারে অযোধ্যার নবাব নিজের শৃঙ্খলাহীন সামরিক কার্যে অনিপুণ সেনাবাহিনী ভাঙ্গিয়া দিলেন। উহার পরিবর্তে অধিক সংখ্যক কোম্পানির সৈন্য অযোধ্যায় মোতায়েন করা হইল। এইভাবে অযোধ্যা রাজ্যও অধীনতামূলক মিত্ররাজ্যে পরিণত হইল।

মারাঠা-নেতা নানা ফড়নবীশ যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন মারাঠা রাষ্ট্র-সংঘের (Maratha Confederacy) কেহই ইংরাজদের অধীনতামূলক কোন শর্ত গ্রহণ করিয়া মিত্রতা স্থাপনের কথা কল্পনাও করে নাই। কিন্তু ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে নানা ফড়নবীশের মৃত্যু হইলে সুযোগ্য নেতার অভাবহেতু মারাঠা-রাজ্যপঞ্চকের মধ্যে আর একতা বলিয়া কিছু রহিল না। তাহাদের মধ্যে আত্মকলহ দেখা দিলে পেশওয়া দ্বিতীয় বাজীরাও-এর রাজ্য যশোবন্ত রাও হোলকার কর্তৃক আক্রান্ত হইল। যশোবন্ত রাও পেশওয়া ও সিন্ধিয়ার যুগ্মবাহিনীকে পুনার সন্নিকটে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করিলেন। দ্বিতীয় বাজীরাও পলাইয়া গিয়া ব্রিটিশের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং তাহাদের সহিত অধীনতামূলক মিত্রতাবদ্ধ হইলেন (১৮০২)। পেশওয়া কর্তৃক ব্রিটিশের অধীনতা-স্বীকার মারাঠা-রাষ্ট্রসংঘের একতার মূলে চরম আঘাত হানিল। ইহার পর বিভিন্ন ঘটনা পরম্পরায় ভোঁসলে ও সিন্ধিয়াও অধীনতামূলক মিত্রতার চুক্তি স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হইলেন।

মারাঠারাজ্য : পেশওয়া, ভোঁসলে ও সিন্ধিয়া

ইতিমধ্যে (১৭৯৯) তাঞ্জোর রাজ্যে এক উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত দ্বন্দ্ব দেখা দিলে ওয়েলেস্‌লী তাঞ্জোর-এর রাজাকে ব্রিটিশ অধীনতা-মূলক মিত্রতা গ্রহণে রাজী করাইয়াছিলেন। এই চুক্তির শর্তানুসারে বাৎসরিক নির্দিষ্ট পরিমাণ ভাতা প্রাপ্তির বিনিময়ে তাঞ্জোরের রাজা নিজ রাজ্যের শাসনভার ইংরাজগণের নিকট ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। অনুরূপ পরিস্থিতির সুযোগ লইয়া ওয়েলেস্‌লী সুরাট রাজ্যটি বৃটিশ অধিকারভুক্ত করিয়াছিলেন। সুরাটের নবাব অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তাঁহার ভ্রাতার দাবি অস্বীকার করিয়া ওয়েলেস্‌লী সুরাট অধিকার করিয়া লইলেন। নবাবের ভ্রাতাকে অবশ্য সামান্য ভাতা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। বলা বাহুল্য ভারতে ব্রিটিশ ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির

অধিকৃত রাজ্যসমূহ : তাঞ্জোর সুরাট

আফগানিস্তান
তিব্বত
পাঞ্জাব
দিল্লী
রাজপুতানা
সিন্ধু
সিন্ধিয়া
এলাহাবাদ
রা
ঠা
নর্মদা নং
বেরার
বোম্বাই
নিজাম-রাজ্য
আরব
সাগর
গোয়া
বঙ্গোপসাগর
উত্তর সরকার
কলিকাতা
মহীশূর
মাদ্রাজ
শ্রীরঙ্গপত্তম
ত্রিবাঙ্কুর
সিংহল
ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ক্রম-বিস্তার
(লর্ড ওয়েলেস্‌লীর কালে)
১৮০১ খ্রীষ্টাব্দ
১৮০২ –৪ খ্রীঃ
অধীনতামূলক মিত্র-রাজ্য

বাণিজ্য-সম্পর্কের প্রারম্ভকাল হইতেই সুরাটে ইংরাজ প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছিল।

কর্ণাটের দ্বিতীয় যুদ্ধের পর ব্রিটিশ সাহায্যে মোহম্মদ আলি নবাব-পদ লাভ করিয়াছিলেন। সেই সময় হইতে কর্ণাটের শাসনব্যবস্থায় ইংরাজদের প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছিল। কর্ণাটেও একপ্রকার দ্বৈত-শাসন প্রচলিত ছিল এবং উহার ফলে কর্ণাটে এক ব্যাপক অব্যবস্থা স্বভাবতই দেখা দিয়াছিল। ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে মোহম্মদ আলির মৃত্যু ঘটিলে তাঁহার পুত্র উম্‌দাত-উল্‌-উম্‌রা কর্ণাটের নবাব হইলেন। মোহম্মদ আলি এবং তাঁহার পুত্র উম্‌দাত টিপু সুলতানের সহিত মিত্রতা স্থাপনের উদ্দেশ্যে গোপনে পত্রালাপ করিতেছিলেন এইরূপ প্রমাণ পাওয়া গেলে ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে উম্‌দাত-এর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ওয়েলেস্‌লী কর্ণাট রাজ্য ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত করিলেন। ইহা ভিন্ন উম্‌দাত-এর পুত্রের দাবি উপেক্ষা করিয়া অপর একজনকে তিনি নবাব-পদে স্থাপন করিয়াছিলেন।

কর্ণাট

চতুর্থ ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ, ১৭৯৯ (The Fourth Anglo-Mysore War): শ্রীরঙ্গপত্তমের সন্ধির (১৭৯২) পর কর্ণওয়ালিসের মনে এই ধারণা জন্মিয়াছিল যে, টিপু সুলতান আর কোনদিন ইংরাজদের বিরোধিতা করিতে অগ্রসর হইবেন না। কিন্তু টিপুর ন্যায় স্বাধীনচেতা দেশপ্রেমিক সুলতানের পক্ষে শ্রীরঙ্গপত্তমের সন্ধির অপমানজনক শর্ত মানিয়া চলা সম্ভব ছিল না। তিনি ফ্রান্স, মরিশাস, কাবুল, আরব, তুরস্ক প্রভৃতি দেশে দূত পাঠাইয়া সামরিক সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধে মহীশূরের যে সকল দুর্গ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল, তিনি সেগুলির সংস্কারসাধন করিলেন। দেশের কৃষি-ব্যবস্থার উন্নয়ন, সেনাবাহিনীর সংখ্যাবৃদ্ধি এবং উহাকে উন্নত ধরণের সামরিক শিক্ষাদান করিয়া টিপু নিজরাজ্যকে পুনরায় সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী করিয়া তুলিলেন।

টিপু সুলতানের যুদ্ধ-প্রস্তুতি

টিপু ফরাসী বিপ্লবীদল 'জেকোবিন ক্লাব' (Jacobin Club)-এর সদস্য হইলেন। ব্রিটিশ শক্তির উচ্ছেদে টিপুকে সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে কয়েকজন ফরাসী স্বেচ্ছাসেবকও ম্যাঙ্গালোর-এ আসিয়া উপস্থিত হইল (১৭৯৮)। ওয়েলেস্‌লী ভারতবর্ষে পৌঁছিয়াই টিপুর সামরিক প্রস্তুতির উদ্দেশ্য

উপলব্ধি করিলেন এবং অনতিবিলম্বে টিপুর সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। তিনি ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে ইঙ্গ-মারাঠা-নিজাম মৈত্রী (Triple Alliance) পুনঃসঞ্জীবিত করিতে সচেষ্ট হইলেন। নিজামকে স্বপক্ষে আনিতে ওয়েলেস্‌লীকে বেগ পাইতে হইল না। কিন্তু মারাঠাগণ ব্রিটিশ পক্ষে যোগদান করিল না। কেবল ব্রিটিশ স্বার্থের উদ্দেশ্যেই ওয়েলেস্‌লী টিপুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতেছেন না, এইরূপ ধারণা সৃষ্টির জন্য ওয়েলেস্‌লী জয়লাভের পর টিপুর রাজ্যের একাংশ মারাঠাদিগকে অর্পণ করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

ফরাসী সাহায্যলাভ

অতঃপর ওয়েলেস্‌লী টিপুর নিকট তাঁহার ফরাসী মৈত্রী সম্পর্কে কৈফিয়ৎ চাহিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু টিপুর জবাব সন্তোষজনক নহে বিবেচনা করিয়া ওয়েলেস্‌লী তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। অল্পকালের মধ্যেই টিপু ব্রিটিশ সেনাপতি স্টুয়ার্টের (Stuart) হস্তে সদাশির-এর যুদ্ধে পরাজিত হইলেন। ইহার পর সেনাপতি হ্যারিস (Harris)-এর নিকট মলভেলী (Malvelly)-এর যুদ্ধে তিনি পুনরায় পরাজিত হইলেন। টিপু নিজ রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তম রক্ষার উদ্দেশ্যে তথায় সৈন্যাপসারণ করিলেন। শ্রীরঙ্গপত্তম রক্ষার্থে যুদ্ধ করিবার কালে দুঃসাহসী বীর টিপু প্রাণ হারাইলেন। তাঁহার মৃত্যুতে ইংরাজগণ স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল।

সদাশিব, মলভেলী ও শ্রীরঙ্গপত্তমের যুদ্ধ

টিপুর মৃত্যু

টিপুর পরাজয় ও মৃত্যুর পর ওয়েলেস্‌লী মহীশূর রাজ্যের অধিকাংশ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করিলেন। নিজামকেও এক ক্ষুদ্রাংশ দেওয়া হইল। মারাঠা-গণকে কতকগুলি শর্তাধীনে পূর্বপ্রতিশ্রুতি রক্ষার্থে একাংশ দেওয়া হইলে তাহারা উহা গ্রহণে অস্বীকৃত হইল। এইভাবে ব্যবচ্ছেদের পর মহীশূর রাজ্যের যে ক্ষুদ্র অংশ রহিল, উহা হায়দর আলি কর্তৃক যে হিন্দুরাজবংশ সিংহাসনচ্যুত হইয়াছিল সেই বংশের জনৈক উত্তরাধিকারীকে দেওয়া হইল। বলা বাহুল্য এই রাজবংশ ব্রিটিশের সম্পূর্ণ কর্তৃত্বাধীন রহিল। টিপুর দুই পুত্র ও পরিবার-পরিজনদের প্রথমে ভেলোর-এ বন্দী করিয়া রাখা হইল। ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাদিগকে কলিকাতায় স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল। মহীশূর রাজ্যের পতনে ভারতে

মহীশূর রাজ্য-ব্যবচ্ছেদ

ইংরাজ-বিদ্বেষী সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তির বিলোপ ঘটিয়াছিল। ইহা ভিন্ন ফরাসী-প্রভাব বিস্তারের পথও সেই সঙ্গে বন্ধ হইয়াছিল।

দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ, ১৮০৩-৫ (The Second Anglo-Maratha War) : লর্ড ওয়েলেস্‌লী যখন গবর্ণর-জেনারেল-পদে নিযুক্ত হইয়া ভারতবর্ষে আসিলেন তখন মারাঠাজাতির ইতিহাসে এক ভীষণ দুর্দিন দেখা দিয়াছে। নিয়তির পরিহাসে-ই যেন মারাঠাজাতির নেতৃবৃন্দ প্রায় একই সময়ে কালের করাল গ্রাসে পতিত হইলেন। মাহ্‌দজী সিন্ধিয়া, অহল্যা বাঈ, নানা ফড়নবিশ সকলেই একে একে মৃত্যুমুখে পতিত হইলে মারাঠাদের মধ্যে এক অতি সংকীর্ণ স্বার্থপরতার দ্বন্দ্ব শুরু হইল। পেশওয়া দ্বিতীয় বাজীরাও, দৌলতরাও সিন্ধিয়া ও যশোবন্ত রাও হোল্‌কার প্রভৃতি এক আত্মঘাতী দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হইলেন। বাজীরাও সিন্ধিয়ার সাহায্য গ্রহণ করিয়া হোল্‌কার যশোবন্ত রাও-এর পুণা অধিকারের চেষ্টা প্রতিহত করিতে গিয়া শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইলেন (১৮০২)। বাজীরাও আত্মরক্ষার্থ পলাইয়া গিয়া ইংরাজদের সহিত অধীনতামূলক মিত্রতাবদ্ধ হইলেন। এই মিত্রতা-চুক্তি ব্যাসিন (Bassein)-এর সন্ধি নামে পরিচিত। এদিকে যশোবন্ত রাও বাজীরাওকে পরাজিত করিবার পর তাঁহার স্থলে তাঁহার ভ্রাতা অমৃতরাওকে পেশওয়া বলিয়া ঘোষণা করিলেন। কিন্তু ব্যাসিনের সন্ধির শর্তানুসারে ইংরাজ সৈন্য দ্বিতীয় বাজীরাওকে পুনরায় পেশওয়া-পদে স্থাপন করিল। ইংরাজ-সহায়তায় বাজীরাও পেশওয়া-পদে পুনরায় অধিষ্ঠিত হওয়ার ফলে পেশওয়াতন্ত্র তথা সমগ্র মারাঠা রাষ্ট্রসংঘের মর্যাদা ধূলায় লুণ্ঠিত হইল। পেশওয়া দ্বিতীয় বাজীরাও ব্রিটিশের তাঁবেদারে পরিণত হইলেন, স্বাধীনতা বলিয়া তাঁহার কিছু আর রহিল না।

দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের কারণ

ব্যাসিনের সন্ধি

ভোঁসলে এবং সিন্ধিয়া ব্যাসিনের সন্ধির অপমানজনক শর্তের কথা জানিতে পারিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। নামেমাত্র হইলেও মারাঠা রাষ্ট্রসংঘের প্রধান নেতা পেশওয়ার এইরূপ আত্মবিক্রয়ে মারাঠাজাতির অপমান তাঁহারা সহ্য করিতে প্রস্তুত হইলেন না। তাঁহারা পেশওয়া কর্তৃক স্বাক্ষরিত ব্যাসিনের সন্ধি অগ্রাহ্য করিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

ভোঁসলে, সিন্ধিয়া প্রভৃতি কর্তৃক প্রতিকারের চেষ্টা

অব্যবস্থিতচিত্ত পেশওয়া বাজীরাও গোপনে মারাঠা নেতৃবর্গকে সমর্থন করিলেন। বরোদার গাইকোয়াড় অবশ্য এই ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ রহিলেন। মারাঠা বাহিনী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া নিজামের রাজ্যের সীমান্তদেশে উপস্থিত হইলে ইংরাজগণ প্রমাদ গণিল। মারাঠা সেনাবাহিনীকে অপসারণের জন্য তাহারা মারাঠা নেতৃবর্গকে জানাইল। কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না দেখিয়া ইংরাজগণ যুদ্ধ ঘোষণা করিল (১৮০৩)।

যুদ্ধ ঘোষণা (১৮০৩)

লর্ড ওয়েলেস্‌লীর ভ্রাতা সার আর্থার ওয়েলেস্‌লী (পরবর্তী কালে নেপোলিয়ন-বিজেতা ডিউক-অব্-ওয়েলিংটন) এবং সেনাপতি লেক্ (General Lake) ব্রিটিশ সৈন্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্যে সার্ আর্থার ওয়েলেস্‌লী আহ্‌ম্মদনগর অধিকার করিলেন এবং অসই (Assaye)-এর যুদ্ধে সিন্ধিয়া ও ভোঁসলের যুগ্মবাহিনীকে শোচনীয়ভাব পরাজিত করিলেন (১৮০৩)। এই যুদ্ধে পরাজিত হইয়া সিন্ধিয়া যুদ্ধ হইতে বিরত রহিলেন। ভোঁসলের সেনাবাহিনী তখনও প্রাণপণ যুদ্ধ করিয়া চলিল। অরগাঁও (Argãon)-এর যুদ্ধে ভোঁসলের সেনাবাহিনী চূড়ান্তভাবে পরাজিত হইলে ভোঁসলে ইংরাজদের সহিত দেওগাঁও (Deogãon)-এর সন্ধি স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হইলেন। তিনিও ইংরাজদের সহিত অধীনতামূলক মিত্রতাবদ্ধ হইয়া ওয়ারূদা নদীর পশ্চিম তীরস্থ রাজ্যাংশ, কটক, বালেশ্বর প্রভৃতি স্থান ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন।

আর্থার ওয়েলেস্‌লী ও সেনাপতি লেক্

অসই-এর যুদ্ধ

অরগাঁও-এর যুদ্ধ : দেওগাঁও-এর সন্ধি

এদিকে সেনাপতি লেক্ আগ্রা ও দিল্লী অধিকার করিয়া সম্রাট শাহ্ আলমকে মারাঠাদের অধীনতা-মুক্ত করিয়া ব্রিটিশের রক্ষণাধীনে আনিলেন। অতঃপর সিন্ধিয়াকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। লস্ওয়ারী (Laswari)-এর যুদ্ধে সিন্ধিয়া লেক্ কর্তৃক শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইয়া সুরূজী-অর্জুনগাঁও (Surji-Arjangaõn)-এর সন্ধি স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হইলেন। এই সন্ধির শর্তানুসারে সিন্ধিয়াকে গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী অঞ্চল, আহ্‌ম্মদনগর, ভারুচ, অজন্তা

লস্ওয়ারী-এর যুদ্ধ : সুরূজী-অর্জুনগাঁও-এর সন্ধি

পাহাড়ের পশ্চিমস্থ যাবতীয় স্থান, জয়পুর, যোধপুর ও গোয়াড়-এর উত্তরে সিন্ধিয়ার অধিকারভুক্ত যাবতীয় স্থান ও দুর্গাদি ইংরাজদের নিকট ছাড়িয়া দিতে হইল। ইহা ভিন্ন মোগল সম্রাটের উপর সিন্ধিয়ার কোনপ্রকার প্রভাব থাকিবে না এবং সিন্ধিয়ার রাজধানীতে একজন ব্রিটিশ রেসিডেন্ট্ (Resident) উপস্থিত থাকিবেন এই সকল শর্তও সিন্ধিয়াকে মানিয়া লইতে হইল। একটি পৃথক চুক্তি দ্বারা (২৭শে ফেব্রুয়ারি, ১৮০৪) সিন্ধিয়া ব্রিটিশের সহিত অধীনতামূলক মিত্রতাবদ্ধ হইলেন।

দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের ফলে একদিকে যেমন মারাঠা শক্তি চিরতরে বিচ্ছিন্ন ও দুর্বলীকৃত হইল, তেমনি অপর দিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সীমাও যথেষ্ট বিস্তারলাভ করিল। ইহা ভিন্ন এই যুদ্ধের ফলে মাদ্রাজ ও বাংলাদেশে ব্রিটিশ অধিকৃত স্থান সংযোজিত হইল। দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের ফলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য জয়পুর, যোধপুর প্রভৃতি রাজপুত রাজ্যগুলি উত্তর দিকে বিস্তার লাভ করিয়াছিল। ফলে, এই সকল রাজ্যের সহিত ব্রিটিশের মিত্রতা স্থাপনের সুযোগ বৃদ্ধি পাইয়াছিল, কারণ এই সকল রাজ্য নিজ নিজ নিরাপত্তার জন্যও ব্রিটিশের সহিত মিত্রতাবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন তখন উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিল। ভরতপুর, বুন্দী, যোধপুর, জয়পুর প্রভৃতি রাজ্য স্বভাবতই ব্রিটিশের সহিত মিত্রতাবদ্ধ হইয়াছিল।

দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের ফলাফল

হোল্‌কার ও ওয়েলেস্‌লী (Holker & Wellesley): দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে ওয়েলেস্‌লীকে পুনরায় যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে হইল। ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধে হোল্‌কার সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত ছিলেন। কিন্তু এইবার তিনি ব্রিটিশ শক্তির বিরোধিতা শুরু করিলেন। ব্রিটিশের মিত্রতাবদ্ধ রাজপুত রাজ্যগুলি আক্রমণ করিয়া তিনি চৌথ আদায়ের চেষ্টা করিলে ওয়েলেস্‌লী হোল্‌কারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। যুদ্ধে প্রথমে হোল্‌কারেরই জয় হইল। তিনি কর্ণেল মন্‌সন্‌কে মুকুন্দ্ দারা-এর যুদ্ধে পরাজিত করিলেন। হোল্‌কারের সাফল্যে ভরতপুরের রাজা ইংরাজপক্ষ পরিত্যাগ করিয়া হোল্‌কারের পক্ষ গ্রহণ করিলেন। কিন্তু উভয়ে দিল্লী অধিকার করিতে গিয়া অকৃতকার্য হইলেন।

ব্রিটিশ পরাজয়

ইহার পর 'দীগ' নামক স্থানে হোল্‌কার ও ইংরাজদের মধ্যে এক যুদ্ধ হইল। কিন্তু কোন পক্ষই সম্পূর্ণ জয়লাভ করিতে পারিল না। এদিকে সেনাপতি লেক্‌ ভরতপুর পর পর চারিবার আক্রমণ করিয়াও অকৃতকার্য হইলেন। যাহা হউক, ভরতপুরের রাজা আর ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যুঝিতে চাহিলেন না। তিনি ২০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়া ব্রিটিশের সহিত সন্ধি স্থাপন করিলেন। হোল্‌কারের বিরুদ্ধে ইংরাজগণ যুদ্ধে পুনরায় অগ্রসর হইবার পূর্বেই ওয়েলেস্‌লীকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের আদেশ দেওয়া হইল। এই কারণে হোল্‌কার আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা পাইলেন।

টিপু সুলতান, ১৭৮২-৯৯ (Tipu Sultan) : হায়দর আলির পুত্র টিপু পিতার সুযোগ্য পুত্র ছিলেন। পিতার ন্যায় তিনিও ইংরাজদের এক দুর্দমনীয় শত্রু ছিলেন। ভারত-ইতিহাসে টিপু তাঁহার ব্যক্তিত্ব ও কৃতিত্বের বলে এক গৌরবোজ্জ্বল স্থান অধিকার করিয়াছেন। টিপুর চরিত্র-বর্ণনায় ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ কটূক্তি করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। পি. ই. রবার্টস (P. E. Roberts) টিপুকে 'নিষ্ঠুর বর্বর' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। গবর্ণর-জেনারেল কর্ণওয়ালিস তাঁহাকে 'অসভ্য উন্মাদ' আখ্যা দিয়াছিলেন। সার্‌ আলফ্রেড্‌ লায়েল (Sir Alfred Lyall) টিপুকে 'দুর্ধর্ষ, ধনোন্মত্ত, অশিক্ষিত মুসলমান' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু এই সকল মন্তব্য কেবল পক্ষপাত দোষে দুষ্ট নহে, সংকীর্ণ অনুদার মনোবৃত্তিরও পরিচায়ক। বস্তুতঃপক্ষে টিপু যথেষ্ট শিক্ষিত, ধর্মভীরু ও দেশপ্রেমিক সুলতান ছিলেন। ফার্‌সী, উর্দু, কানাড়ী প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় তাঁহার যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল। তাঁহার একটি বিরাট গ্রন্থাগার ছিল। সমসাময়িক

টিপুর চরিত্র—ইংরাজ ঐতিহাসিকদের পক্ষপাতিত্ব

কলুষতা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। রাজনীতিক হিসাবেও তিনি দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছিলেন। ইওরোপীয় মহাদেশে ইঙ্গ-ফরাসী সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি তাঁহার ব্রিটিশ-বিরোধী পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। সমসাময়িক দেশীয় নৃপতিগণের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ দেশপ্রেমিক। হায়দরের ন্যায় তিনিও বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ইংরাজগণই ছিল মহীশূর তথা অপরাপর ভারতীয় রাজ্যগুলির একমাত্র শত্রু। এই কারণে তিনি কোন অবস্থায়ই ইংরাজগণের সাহায্যপ্রার্থী হন নাই। নিজাম ও মারাঠাদের

সহিত দ্বন্দ্বে টিপু ব্রিটিশ সাহায্য গ্রহণের কথা কল্পনায়ও আনেন নাই।* কূটকৌশলেও টিপু কম বিচক্ষণ ছিলেন না। তিনি ফ্রান্স, তুরস্ক, মরিশাস, কাবুল, আরব প্রভৃতি দেশে দূত প্রেরণ করিয়া ইংরাজ বিতাড়নের জন্য সাহায্য-সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। টিপু ধর্মান্ধ, অত্যাচারী শাসক ছিলেন এই অভিযোগ যে সত্য নহে, তাহা সমসাময়িক ইংরাজ লেখকদের বর্ণনা হইতে প্রমাণিত হইবে। এড্ওয়ার্ড মোর (Edward More), মেজর ডিরোম (Major Dirom) প্রমুখ সমসাময়িক লেখকগণ টিপুর শাসনের জনপ্রিয়তার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। সার্ জন শোর টিপুর রাজ্যে কৃষক ও শ্রমিক-উন্নয়ন প্রচেষ্টার প্রশংসা করিয়াছেন। ঐতিহাসিক উইল্‌ক্‌স্ টিপুকে ধর্মান্ধ হিন্দু-বিদ্বেষী বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, কিন্তু আধুনিক গবেষণার ফলে টিপুর যে সকল চিঠিপত্র পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে উইল্‌ক্‌সের মত যে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত এ কথা প্রমাণিত হইয়াছে। শাসনকার্যে টিপু স্বমত-পোষক ও স্বৈরাচারী ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার বিরুদ্ধে ধর্মান্ধতার বা অত্যাচারী শাসনের অপবাদ ইংরাজ ঐতিহাসিকদের সংকীর্ণতা-প্রসূত একথা বলা যাইতে পারে।

টিপুর কার্যকলাপ (His Career and Achievements): টিপু তাঁহার পিতা হায়দর আলির সহিত দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ব্রিটিশ সেনাপতি ব্রেইথ্ওয়েট্ (Braithwaite)-কে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করিয়াছিলেন (১৭৮২)। হায়দর আলির মৃত্যুর পর টিপু তাঁহার অসমাপ্ত কার্য সমাপনে অগ্রসর হইলেন। তিনিও হায়দর আলির ন্যায় দাক্ষিণাত্য হইতে ব্রিটিশ বিতাড়নের নীতি গ্রহণ করিলেন। টিপুর হস্তে পরাজয়ের ফলে বাধ্য হইয়াই ইংরাজগণকে ম্যাঙ্গালোর-এর সন্ধি স্বাক্ষর করিতে হইয়াছিল (১৭৮৪)। এই সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করিয়া লর্ড কর্ণওয়ালিস নিজামের নিকট এক শক্তিসংঘ গঠনের প্রস্তাব করেন। ইহাতে টিপুকে গ্রহণের কোন

দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ: ম্যাঙ্গালোর-এর সন্ধি (১৭৮৪)

* "He, like his father, understood that Great Britain rather than any native power was the enemy, and he never leagued himself with her (Great Britain) against his neighbours." Roberts, p. 247.

উদ্দেশ্য ছিল না। ইংরাজ পক্ষের এইরূপ আচরণে টিপু ক্রুদ্ধ হইলেন। ফলে, তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের সূত্রপাত হইল। এই যুদ্ধে অবশ্য তিনি সাফল্যলাভে সমর্থ হইলেন না। পুনঃপুনঃ পরাজিত হইয়া টিপু শ্রীরঙ্গপত্তমের সন্ধি দ্বারা নিজ রাজ্যের অধিকাংশ ইংরাজদের নিকট ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন (১৭৯২)। কিন্তু টিপু শ্রীরঙ্গপত্তমের সন্ধির অপমান ভুলিলেন না। তিনি দাক্ষিণাত্য হইতে বৃটিশ শক্তি নির্মূল করিবার উদ্দেশ্যে মরিশাস, ফ্রান্স, তুরস্ক, আরব, কাবুল প্রভৃতি দেশে সাহায্য চাহিয়া দূত প্রেরণ করিলেন। সেই সময়ে ইওরোপে ফরাসী বিপ্লব-প্রসূত যুদ্ধ চলিতেছিল। টিপুর সাহায্যার্থে কয়েকজন ফরাসী স্বেচ্ছাসেবকও আসিয়া উপস্থিত হইল। ওয়েলেস্‌লী গবর্ণর-জেনারেল হিসাবে ভারতবর্ষে পৌঁছিয়াই টিপুর যুদ্ধ-প্রস্তুতির উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দিহান হইয়া উঠিলেন। এবিষয়ে তিনি টিপুর সহিত পত্রালাপ করিলেন, কিন্তু টিপুর জবাব অসন্তোষজনক এই অজুহাতে তিনি যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। ঘোর সাম্রাজ্যবাদী ওয়েলেস্‌লী ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য প্রথম হইতেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। টিপুর জবাবের যৌক্তিকতা বিচার না করিয়াই তিনি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। এইভাবে চতুর্থ ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ শুরু হইল। সদাশির, মলভেলী ও শ্রীরঙ্গপত্তমের যুদ্ধে টিপু পরাজিত হইলেন। শেষোক্ত যুদ্ধে টিপু যুদ্ধ করিয়া প্রাণ হারাইলেন (১৭৯৯)। চতুর্থ ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধে টিপু নিহত হইলে ভারতীয় নৃপতিদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ব্রিটিশ-বিদ্বেষী রাজ্যের পতন ঘটিল। ইংরাজগণ স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। টিপুর রাজ্যের একাংশ হায়দর আলির উত্থানের পূর্বে যে হিন্দু রাজবংশ মহীশূরে রাজত্ব করিত সেই বংশের জনৈক উত্তরাধিকারীকে দেওয়া হইল। অবশিষ্টাংশ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হইল। নিজাম ইংরাজপক্ষে ছিলেন। সেইজন্য তিনিও মহীশূর রাজ্যের এক ক্ষুদ্র অংশ লাভ করিলেন।

তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ —শ্রীরঙ্গপত্তমের সন্ধি (১৭৯২)

চতুর্থ ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ— টিপুর পরাজয় ও মৃত্যু (১৭৯৯)

[প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের বিশদ বিবরণ ক্রমান্বয়ে ৮৪, ৮৬, ১৩৬, ১৪৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।]

টিপুর পতনের কারণ (Causes of the fall of Tipu) : মহীশূর রাজ্যে অদ্যাপি একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, হায়দর-এর গঠিত রাজ্য

তাঁহার পুত্র টিপুর হস্তে বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু প্রথমেই একথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, টিপুর পতন বা বিফলতাকে 'মহান পতন' বা *Magnificent failure* বলিয়া বর্ণনা করা অনুচিত হইবে না। তাঁহার পতনের পশ্চাতে কয়েকটি বিভিন্ন কারণ বিদ্যমান ছিল। প্রথমত, টিপু হায়দর আলির নীতি অনুসরণ করিয়া কেবলমাত্র শ্রীরঙ্গপত্তমের নিরাপত্তার উপরই অধিক জোর দিয়াছিলেন। ইংরাজদের সহিত বিরোধিতা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এবং নিজাম ও মারাঠাগণ ইংরাজদের পক্ষে চলিয়া যাইবার ফলে দাক্ষিণাত্যের রাজনীতিতে যে পরিবর্তন ঘটিয়াছিল, উহার পরিপ্রেক্ষিতে মহীশূর রাজ্যের নিরাপত্তার জন্য ব্যাপক ব্যবস্থা তিনি করেন নাই। হায়দর আলির জীবদ্দশায় শ্রীরঙ্গপত্তম শত্রুর অবরোধ প্রতিহত করিতে সক্ষম হইয়াছিল। টিপুও শ্রীরঙ্গপত্তমের নিরাপত্তার উপরই অত্যধিক জোর দিয়াছিলেন। রাজ্যের অপরাপর অংশের প্রতিরক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা না করিয়া তিনি ভুল করিয়াছিলেন।

'মহান পতন' (Magnificent failure)

কারণ: (১) রাজ্যের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি

দ্বিতীয়ত, টিপুর শাসনব্যবস্থা ছিল সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ধরণের স্বৈরাচার (personal and autocratic)। তিনি সামরিক ও শাসন-সংক্রান্ত কার্যে যাবতীয় খুঁটিনাটি বিষয়ের উপরও দৃষ্টি রাখিতেন বটে, কিন্তু সমগ্রভাবে সামরিক বা শাসন-ব্যবস্থা কতদূর কার্যকরী হইতেছিল সে বিষয়ে তিনি তেমন অবহিত ছিলেন না।

(২) ব্যক্তিগত ও স্বৈরাচারী শাসনের ত্রুটি

তৃতীয়ত, টিপু সংস্কারের প্রয়োজন উপলব্ধি করিতেন বটে, কিন্তু সংস্কার-কার্যের ক্ষিপ্রতা তাঁহার সংস্কারগুলির বিফলতা ডাকিয়া আনিয়াছিল। তাঁহার সংস্কারকার্যাদি এই কারণে জন-সাধারণের মঙ্গলসাধনে সমর্থ হয় নাই।

(৩) জনকল্যাণকর সংস্কারের অভাব

চতুর্থত, টিপুর আমলে হায়দর আলির গঠিত অশ্বারোহী বাহিনীর দক্ষতা বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছিল। টিপু অশ্বারোহী সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধির বা তাহাদের দক্ষতার দিকে তেমন মনোযোগী ছিলেন না।

(৪) অশ্বারোহী সেনা বাহিনীর সংখ্যা ও দক্ষতা হ্রাস

পঞ্চমত, টিপু দেশীয় নৃপতিগণের সহায়তালাভে সমর্থ হন নাই। মারাঠাগণ ও টিপু সম্মিলিতভাবে ইংরাজদের বিরোধিতা করিলে দাক্ষিণাত্যে

ব্রিটিশ প্রাধান্য বিলুপ্ত হইত সন্দেহ নাই। ইহা ভিন্ন বিভিন্ন দেশে দূত প্রেরণ করিয়া টিপু কেবলমাত্র মৌখিক সহানুভূতিই লাভ করিয়াছিলেন। প্রকৃতক্ষেত্রে কেহই তাঁহাকে সাহায্য-দানে অগ্রসর হয় নাই। অল্পসংখ্যক ফরাসী স্বেচ্ছাসেবক টিপুকে সাহায্য করিতে আসিয়া তাঁহার প্রতি ওয়েলেস্‌লীর সন্দেহ ও বিদ্বেষ বৃদ্ধি করিয়াছিল মাত্র।

(৫) বহিরাগত সাহায্যের অভাব

তাঁহার কৃতিত্ব (His Estimate) : ভারত-ইতিহাসে বিদেশী আক্রমণ প্রতিহত করিয়া স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার্থে যাঁহারা আমরণ চেষ্টা করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে টিপু অন্যতম। তিনি ছিলেন স্বাধীনচেতা, দেশপ্রেমিক, বীর যোদ্ধা। আত্মমর্যাদা ক্ষুণ্ণ করিয়া ইংরাজদের সহিত মিত্রতা স্থাপনের কথা তাঁহার অন্তরে স্থান পায় নাই। ব্রিটিশদের সহিত অধীনতামূলক মিত্রতাবদ্ধ হইয়া টিপু অনায়াসেই নিজ রাজ্য ভোগ করিতে পারিতেন, কিন্তু তাঁহার স্বদেশপ্রীতি, তাঁহার আত্মমর্যাদাবোধ তাঁহাকে এই অধীনতামূলক মিত্রতা প্রত্যাখ্যানে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। কূটনীতিক্ষেত্রেও টিপু বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়াছিলেন। বহিরাগত সাহায্যে ব্রিটিশ শক্তি নাশ করিবার চেষ্টা তিনি করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু প্রয়োজনীয় সাহায্য তিনি পান নাই। তথাপি পরাধীনতা অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিয়াই তিনি শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ শক্তির সহিত এককভাবে যুদ্ধ করিয়া চলিয়াছিলেন। শ্রীরঙ্গপত্তমের যুদ্ধে শত্রুহস্তে তাঁহার মৃত্যু তাঁহার অপরিসীম স্বদেশপ্রীতি ও স্বাধীনচিত্ততার সাক্ষ্য বহন করিবে সন্দেহ নাই।

টিপুর স্বদেশপ্রীতি ও স্বাধীনচিত্ততা

ওয়েলেস্‌লীর কৃতিত্ব বিচার (Critical Estimate of Lord Wellesley) : ভারতে ব্রিটিশ-সাম্রাজ্য গঠনে যে সকল গবর্ণর-জেনারেল অনন্যসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন, ওয়েলেস্‌লী ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম। (১) কোম্পানির ইতিহাসের এক সমস্যা-সংকুল মুহূর্তে ওয়েলেস্‌লী গবর্ণর-জেনারেল পদে নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছিলেন এবং একে একে সেই সকল সমস্যার সমাধান করিয়া কোম্পানির সাম্রাজ্যে দৃঢ়তা আনিয়াছিলেন এবং কোম্পানির সাম্রাজ্য-

কোম্পানির সাম্রাজ্যের দৃঢ়তা

সীমা বিস্তৃত করিয়াছিলেন। (২) ভারতীয় নৃপতিদের মধ্যে সর্বাধিক দৃঢ়চেতা ব্রিটিশ-বিরোধী টিপু সুলতানকে তিনি যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করিয়া দাক্ষিণাত্যে ব্রিটিশ শক্তিকে অপ্রতিহত করিয়া তুলিয়াছিলেন। ওয়েলেস্‌লীর অন্যতম কীর্তি হইল মারাঠা শক্তির ধ্বংস-সাধন। (৩) পেশওয়া, সিন্ধিয়া, ভেঁাসলে প্রভৃতিকে তিনি ব্রিটিশ শক্তির উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল করিয়া তুলিয়াছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম সমগ্র ভারতবর্ষকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে পরিণত করিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন এবং তাঁহার অনুসৃত নীতিই পরবর্তী কালে লর্ড ডালহৌসী অনুসরণ করিয়াছিলেন। (৪) ওয়েলেস্‌লী যখন ভারতের গবর্ণর-জেনারেল পদে নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছিলেন, তখন দাক্ষিণাত্যে ফরাসী প্রভাব দ্রুত বিস্তার লাভ করিতেছিল। হায়দরাবাদ ও মহীশূর রাজ্যে ফরাসী প্রভাব যথেষ্ট বিস্তার লাভ করিয়াছে দেখিয়া তিনি তাঁহার 'অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি' দ্বারা নিজামকে সম্পূর্ণভাবে ব্রিটিশ শক্তির উপর নির্ভরশীল করিয়া তুলিয়াছিলেন। মহীশূর রাজ্যের পতন, অধীনতামূলক মিত্রতাবদ্ধ রাজ্যগুলি হইতে ফরাসীদের বিতাড়ন প্রভৃতির ফলে ভারতবর্ষে ফরাসী-প্রভাব বিস্তারের পথ রুদ্ধ হইয়াছিল। (৫) ভারতবর্ষ হইতে ফরাসীদের বিতাড়িত করিবার পরোক্ষ উপায় হিসাবে ওয়েলেস্‌লী ফরাসী বাণিজ্য-ঘাঁটি মরিশাস আক্রমণের সংকল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের অভাবে তিনি উহা কার্যকরী করিতে পারেন নাই। সিংহল ও বাটাভিয়া হইতে ফরাসী মিত্রপক্ষ ওলন্দাজগণকে বিতাড়নের পরিকল্পনাও কর্তৃপক্ষের অনুমতির অভাবে তিনি কার্যকরী করিতে পারেন নাই। (৬) নেপোলিয়ন বোনাপার্টি মিশরের মধ্য দিয়া ভারতে পৌঁছিবার উদ্দেশ্যে মিশরে যুদ্ধ শুরু করিলে ওয়েলেস্‌লী মিশরের সাহায্যে একদল সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। অবশ্য এই সৈন্যদলকে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিতে হয় নাই, কারণ ইতিপূর্বেই নেপোলিয়ন মিশর পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। (৭) পারস্যে ফরাসী প্রভাব-প্রতিপত্তি বিনাশের উদ্দেশ্যে এবং বিশেষভাবে পারস্যের দিকে রাশিয়ার অগ্রগতিতে বাধাদানের জন্য ওয়েলেস্‌লী জন

মহীশূর রাজ্যের পতন

মারাঠা-শক্তি বিনাশ

ফরাসী প্রভাব দূরীকরণ

মরিশাস, সিংহল ও বাটাভিয়া আক্রমণের পরিকল্পনা

মিশরে সামরিক সাহায্য প্রেরণ

ম্যাল্‌কম্ (John Malcolm)-এর নেতৃত্বে পারস্যের রাজসভায় একটি মিশন (Mission) প্রেরণ করেন। এই মিশন পারস্যদেশে ব্রিটিশের পক্ষে রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক উভয় প্রকার সুযোগ-সুবিধা আদায় করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

ম্যাল্‌কম্ মিশন

(৮) ওয়েলেস্‌লী ছিলেন ঘোর সাম্রাজ্যবাদী। অযোধ্যা, সুরাট, কর্ণাট প্রভৃতি রাজ্যের প্রতি তাঁহার আচরণ ত্রুটিপূর্ণ হইলেও ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-বিস্তার নীতি যে তাঁহার আমলে যথেষ্ট সাফল্য লাভ করিয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এইজন্য তাঁহাকে একজন 'Stout annexationist' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়া থাকে। অবশ্য তাঁহার অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি দেশীয় রাজ্যগুলিকে ব্রিটিশ সামরিক শক্তির উপর নির্ভরশীল করিয়া তুলিয়া দেশীয় নৃপতিগণের স্বেচ্ছাচারিতার পথ প্রস্তুত করিয়াছিল।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-বিস্তৃতি

(৯) ডক্টর স্মিথ্ প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ, ওয়েলেস্‌লী আভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন। কিন্তু ওয়েলেস্‌লী সুদৃঢ় আভ্যন্তরীণ শাসনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতেন না, একথা বলা যুক্তিযুক্ত নহে। বিচারব্যবস্থা, রাজস্ব-নীতি প্রভৃতি যথাযথ পরিচালনার উপরই শাসনব্যবস্থার দক্ষতা ও দৃঢ়তা নির্ভরশীল, একথা তিনি নিজে একাধিকবার উল্লেখ করিয়াছিলেন।

শাসনব্যবস্থা উন্নয়নের চেষ্টা

(১০) ইংলণ্ড হইতে নবাগত ইংরাজ কর্মচারিবর্গের ভারতীয় শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে তিনি ফোর্ট উইলিয়ামে একটি কলেজ স্থাপন করেন। ডাইরেক্টর সভা অবশ্য ওয়েলেস্‌লীর এই পরিকল্পনা অনুমোদন করেন নাই। তাঁহারা এই কলেজটিকে ভারতীয় ভাষা শিক্ষার বিদ্যালয়ে পরিণত করিয়াছিলেন।

ফোর্ট উইলিয়ামে কলেজ স্থাপন

(১১) ব্যক্তি-চরিত্র বুঝিবার মতো অন্তর্দৃষ্টি তাঁহার ছিল। মেট্‌কাফ্ (Metcalf), মান্‌রো (Munro), এল্‌ফিন্‌স্টোন্ (Elphinstone), ম্যালকম্ (Malcolm), প্রভৃতি সুদক্ষ ও ক্ষমতাবান শাসকবৃন্দকে ওয়েলেস্‌লীই গড়িয়া তুলিয়াছিলেন।

তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি

(১২) ওয়েলেস্‌লীর রাজ্যবিস্তার নীতি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির

কর্তৃপক্ষের ভীতির সঞ্চার করিয়াছিল। বিশেষত তাঁহার যুদ্ধ-নীতির ফলে কোম্পানির ঋণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এইরূপ ঋণগ্রস্ততা স্বভাবতই বিরক্তির কারণ হইয়া উঠিল। এমন সময়ে হোল্‌কারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে গিয়া কর্ণেল মন্‌সন্ শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইলে ওয়েলেস্‌লীকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের আদেশ দেওয়া হইল। তথাপি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ যে ওয়েলেস্‌লীর নিকট ঋণী ছিল একথা অনস্বীকার্য।

তাঁহার উপর প্রত্যাবর্তনের আদেশ

সপ্তম অধ্যায়

ভারতে ব্রিটিশ প্রাধান্যের পরিপূর্ণতা ঃ মারাঠা শক্তির পতন

(Completion of British Ascendancy in India : Downfall of the Marathas)

নিরপেক্ষ নীতি বা না-হস্তক্ষেপ নীতি (Policy of Non-intervention) ঃ লর্ড কর্ণওয়ালিস (দ্বিতীয়বার), ১৮০৫ (Lord Cornwallis Again) ঃ লর্ড ওয়েলেস্‌লীর অগ্রসর-নীতি কোম্পানির কর্তৃপক্ষের মনে ভীতির সঞ্চার করিয়াছিল, একথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। সুতরাং ওয়েলেস্‌লীকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের আদেশ দিয়া তাঁহার স্থলে পূর্ব অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন শান্তি-নীতির সমর্থক লর্ড কর্ণওয়ালিসকে পুনরায় গবর্ণর-জেনারেল পদে নিযুক্ত করিয়া প্রেরণ করা হইল। ভারতে পৌঁছিয়াই তিনি সিন্ধিয়া ও হোল্‌কারের সহিত শান্তিস্থাপনে সচেষ্ট হইলেন। এজন্য তিনি সিন্ধিয়াকে গোয়ালিয়র, গোয়াড়, আগ্রা ব্যতীত যমুনা নদীর পশ্চিমতীরস্থ যাবতীয় স্থান ফিরাইয়া দিতে রাজী হইলেন। এমন কি দিল্লীও তাঁহাকে ফিরাইয়া দিতে তিনি প্রস্তুত হইলেন। হোল্‌কারের সহিতও তিনি বলিতে গেলে যে

লর্ড কর্ণওয়ালিসের দ্বিতীয়বার নিয়োগ (১৮০৫)

কোন শর্তে মিটমাট করিয়া লইতে প্রস্তুত ছিলেন। সেনাপতি লেক্-কে এবিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বলা হইলে তিনি লর্ড কর্ণওয়ালিসের এই দুর্বল-নীতির বিরোধিতা করেন। কিন্তু এবিষয়ে কোন কিছু সম্পন্ন হওয়ার পূর্বেই, ভারতে দ্বিতীয়বার গবর্ণর-জেনারেল হইয়া আসিবার মাত্র তিন মাসের মধ্যে লর্ড কর্ণওয়ালিসের মৃত্যু ঘটে।

সার্ জর্জ বার্লো, ১৮০৫-৭ (Sir George Barlow): লর্ড কর্ণওয়ালিসের আকস্মিক মৃত্যুতে কলিকাতা কাউন্সিলের সদস্য সার জর্জ বার্লো অস্থায়ী গবর্ণর-জেনারেল নিযুক্ত হইলেন। তিনিও লর্ড কর্ণওয়ালিসের না-হস্তক্ষেপ নীতি অনুসরণ করিয়া চলিলেন। ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সিন্ধিয়ার সহিত এক নূতন চুক্তি স্বাক্ষর করিলেন। ইহা দ্বারা সুর্জী-অর্জুনগাঁও-এর সন্ধির শর্তাবলীর কতক পরিবর্তন সাধিত হইল। চম্বল নদী ব্রিটিশ এবং সিন্ধিয়ার রাজ্যের মধ্যবর্তী সীমারেখা বলিয়া স্বীকৃত হইল। ব্রিটিশ ও সিন্ধিয়ার মধ্যে পরস্পর সামরিক সাহায্যের শর্ত নাকচ করা হইল এবং রাজপুতনার আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ব্রিটিশ সরকারের হস্তক্ষেপ না করিবার প্রতিশ্রুতি দান করা হইল। ইতিমধ্যে সেনাপতি লেক্ হোল্কারকে পরাজিত করিয়া পাঞ্জাবে পলায়ন করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। বার্লো ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে হোল্কারকে তাঁহার হৃতরাজ্য ফিরাইয়া দিলেন এবং তাঁহার সহিত মিটমাট করিয়া লইলেন। বার্লো জয়পুরের রাজার সহিত কোম্পানির মৈত্রী-চুক্তি নাকচ করিলেন, কারণ জয়পুর-রাজ ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে শর্তাবলী লঙ্ঘন করিয়াছিলেন। না-হস্তক্ষেপ নীতির (Policy of non-intervention) সমর্থক হইলেও হায়দরাবাদের নিজাম যখন অধীনতামূলক মিত্রতা চুক্তির শর্তাবলী লঙ্ঘন করিতে সচেষ্ট হইলেন তখন তাঁহাকে বাধা দানে তিনি ত্রুটি করিলেন না। এমন কি, ডাইরেক্টর সভার নির্দেশ সত্ত্বেও পেশওয়ার সহিত কৃত ব্যাসিনের সন্ধির শর্তাবলী নাকচ করিতে তিনি রাজী হইলেন না। কারণ, দেশীয় নৃপতিগণের অন্তর্দ্বন্দ্বের সুযোগ গ্রহণ করিতে পারিলেই ব্রিটিশ শক্তি অপ্রতিহত হইয়া উঠিতে পারিবে, একথা তিনিও বিশ্বাস করিতেন। জর্জ বার্লো-এর সামান্য

না-হস্তক্ষেপ নীতি : সিন্ধিয়া ও হোল্কারের সহিত সন্ধি

নিজাম ও পেশওয়ার সম্পর্কে না-হস্তক্ষেপ নীতির ব্যতিক্রম

কোম্পানির ঘাট্‌তি উদ্‌বৃত্তে পরিণত

দুই বৎসরের শাসনকালে ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির আর্থিক ঘাটতি উদ্বৃত্তে পরিণত হইয়াছিল।

জর্জ বার্লো-এর শাসনকালে ভেলোর নামক স্থানে এক সিপাহী বিদ্রোহ দেখা দিয়াছিল। ভেলোরের সেনানায়ক সার্ জন ক্র্যাডক্ (Sir John Cradock) মাদ্রাজের গবর্ণর লর্ড বেণ্টিঙ্ক (Lord William Bentinck)-এর অনুমতিক্রমে সেনাবাহিনীর পোশাক সম্পর্কে কতকগুলি পরিবর্তনের আদেশ দিয়াছিলেন। এই আদেশ অনুসারে সেনাবাহিনীকে একপ্রকার নূতন পাগড়ী (turban) ব্যবহার করিতে বলা হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন তাহাদের সকলকেই দাড়ি কামাইয়া ফেলিতে এবং কপালে তিলক না কাটিতে বা অপর কোনপ্রকার ধর্ম-সংক্রান্ত চিহ্ন ধারণ না করিতে আদেশ দেওয়া হইয়াছিল। সিপাহীদের মনে স্বভাবতই ধারণা জন্মিল যে, ইংরাজগণ তাহাদিগকে খ্রীষ্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত করিবার ফন্দি করিয়াছে। সেই সময়ে টিপুর পরিবার-পরিজনও ভেলোরে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারাও সেনাবাহিনীর অসন্তোষ বৃদ্ধির সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া অনুমান করা হইয়া থাকে। যাহা হউক সিপাহীরা ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই জুলাই আকস্মিকভাবে বিদ্রোহ ঘোষণা করিল এবং মোট ১১৩ জন ব্রিটিশ সৈন্য ও দুইজন অফিসার বা উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মচারীকে হত্যা করিল। ইহার পর আর্কটের সৈন্যের সাহায্যে অমানুষিক অত্যাচার দ্বারা এই বিদ্রোহ দমন করা হইল এবং মাদ্রাজের গবর্ণর উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক ও সেনাপতি ক্র্যাডক্-কে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের আদেশ দেওয়া হইল।

ভেলোর-এর সিপাহী বিদ্রোহ

বিদ্রোহ দমন : বেণ্টিঙ্ক ও ক্র্যাডক্‌কে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের আদেশ দান

লর্ড মিণ্টো, ১৮০৭-১৩ (Lord Minto) : ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড মিণ্টো গবর্ণর-জেনারেল নিযুক্ত হইয়া আসিলেন। ইতিপূর্বে বোর্ড-অব-কণ্ট্রোল (Board of Control)-এর সদস্য হিসাবে কোম্পানির আভ্যন্তরীণ বিষয়াদি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সুযোগ তিনি লাভ করিয়াছিলেন। পার্লামেণ্টের সদস্য হিসাবেও তাঁহার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছিল। তিনি ওয়ারেন হেস্টিংস্ ও

লর্ড মিণ্টোর পূর্ব-অভিজ্ঞতা

সার্ এলিজা ইম্পের ইম্পীচ্মেণ্ট-এর সময়ে কমন্স সভার প্রতিনিধি বা 'ম্যানেজার' (Manager) হিসাবে কাজ করিয়াছিলেন।

লর্ড মিণ্টো হস্তক্ষেপ না করিবার নীতি অনুসরণ করিয়া চলিলেন বটে, কিন্তু প্রয়োজনবোধে উহা ত্যাগ করিতেও তিনি দ্বিধাবোধ করিলেন না। বস্তুতপক্ষে প্রকৃত শাসনকার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াই তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, কোম্পানি সেই সময়ে ভারতবর্ষে যে পরিস্থিতিতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে তাহাতে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা অবলম্বন করা চলিবে না।

হস্তক্ষেপ না করিবার নীতি অনুসরণ—প্রয়োজনবোধে উহার ব্যতিক্রম

লর্ড মিণ্টো যখন ভারতে গবর্ণর-জেনারেল ছিলেন তখন ইওরোপে নেপোলিয়ন বোনাপার্টি ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে চরম আঘাত হানিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। পৃথিবীর সর্বত্র ইংরাজ-বিরোধী কার্যাদির প্রশ্রয় দেওয়া-ই ছিল নেপোলিয়নের উদ্দেশ্য। ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পারস্যে দূত প্রেরণ করিয়া সেখানে ব্রিটিশ প্রভাব নাশের চেষ্টা করিলেন। লর্ড মিণ্টোও ব্রিটিশ স্বার্থ বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে ম্যাল্কম্কে পারস্যে প্রেরণ করিলেন। অবশ্য সেই সময়ে ইংলণ্ডের রাজা তৃতীয় জর্জের নিকট হইতে সার্ হারফোর্ড জোন্স্ (Sir Harford Jones)-কে পারস্যে প্রেরণ করা হইয়াছিল। হারফোর্ড জোন্স্ পারস্য সম্রাটের সহিত একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তি অবশ্য গবর্ণর-জেনারেলকে মানিয়া লইতে হইয়াছিল। এই চুক্তির শর্তানুসারে পারস্য সম্রাট নিজ রাজসভা হইতে ফরাসী দূতকে বিতাড়িত করিতে এবং পারস্যের মধ্য দিয়া কোন ফরাসী সৈন্যকে ভারতবর্ষের দিকে অগ্রসর হইতে না-দিতে স্বীকৃত হইলেন। মিণ্টো এল্ফিন্স্টোন্ (Elphinstone)-কে কাবুলের আমীর শাহ্ সুজার রাজসভায় দূত হিসাবে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ঠিক সেই সময়ে শাহ্ সুজা নিজরাজ্য হইতে বিতাড়িত হওয়ার ফলে এল্ফিন্স্টোন্ কাবুল পর্যন্ত অগ্রসর হইলেন না।

পারস্যে ম্যাল্কম্ মিশন

কাবুলে এল্ফিন্স্টোন্ মিশনের অসাফল্য

লর্ড মিণ্টো সিন্ধুর মুসলমান আমীরগণের সহিত মৈত্রী স্থাপন করিয়া সিন্ধুদেশে ফরাসীগণ যাহাতে কোনপ্রকার স্থান না পাইতে পারে সেই

ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড মিণ্টো চার্লস্ মেট্‌কাফ্‌ (Charles Metcalfe)-কে রঞ্জিৎ সিংহের রাজসভায় দূত হিসাবে প্রেরণ করিলেন। মেট্‌কাফ্‌ রঞ্জিৎ সিংহের সহিত একটি চুক্তি-সম্পাদনে সমর্থ হইলেন। এই চুক্তির শর্তানুসারে শতদ্রু নদী ব্রিটিশ ও শিখ রাজ্যের মধ্যবর্তী সীমারেখা বলিয়া বিবেচিত হইল। ফলে, ব্রিটিশ অধিকার শতদ্রু নদী পর্যন্ত বিস্তার লাভ করিল।

সিন্ধুদেশের আমীরগণ ও পাঞ্জাবের রঞ্জিৎ সিংহের সহিত মৈত্রী

টিল্‌জিট্‌ (Tilsit)-এর সন্ধি দ্বারা ফ্রান্স ও রাশিয়ার মধ্যে মৈত্রী স্থাপিত হইলে স্বভাবতই ভারতবর্ষে ইংরাজগণের মনে ফ্রান্স ও রাশিয়ার যুগ্ম আক্রমণের ভীতির সঞ্চার হইল। কিন্তু ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্স ও রাশিয়ার মৈত্রী বিনষ্ট হইলে এই ভয় দূরীভূত হইল। ইহার পর লর্ড মিণ্টো ভারত মহাসাগরে অবস্থিত ফরাসী-অধিকৃত বুর্‌বোঁ, মরিশাস্ প্রভৃতি দখল করিয়া লইলেন। নেপোলিয়ন কর্তৃক পোর্তুগাল অধিকৃত হইবার পর ভারতে পোর্তুগীজ-অধিকৃত স্থানগুলির প্রধান কেন্দ্র গোয়া ইংরাজগণ কর্তৃক অধিকৃত হইল। হল্যাণ্ড নেপোলিয়ন কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল, এই কারণে লর্ড মিণ্টো ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে জাভা দখল করিলেন। এইভাবে ভারত মহাসাগর অঞ্চলে অল্পকালের জন্য হইলেও ফরাসী প্রাধান্যের কোন অস্তিত্ব রহিল না। লর্ড মিণ্টোর পররাষ্ট্র-নীতির প্রধান গুরুত্বই ছিল এই যে, উহা এশিয়ায় ফরাসী প্রভাব সম্পূর্ণভাবে দমন করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

রুশ-ফরাসী আক্রমণের ভীতি

ভারত মহাসাগর অঞ্চলের ফরাসী-অধিকৃত স্থান দখল

লর্ড মিণ্টোর শাসনকালে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে এক বিদ্রোহ দেখা দেয়। ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের শাসনব্যবস্থায় ব্রিটিশ রেসিডেণ্টের অত্যধিক হস্তক্ষেপ করিবার ফলে এক ব্যাপক অব্যবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল। অবশেষে অতিষ্ঠ হইয়া ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের দেওয়ান রেসিডেণ্টের বাসস্থান আক্রমণ করেন। তিনি ত্রিবাঙ্কুরের জনসাধারণকে বিধর্মী ব্রিটিশদের হাত হইতে জাতি ও ধর্ম রক্ষা করিতে আহ্বান জানাইলে রাজ্যের জনসাধারণ ব্রিটিশ সৈন্য ও কর্মচারিবর্গকে আক্রমণ করিয়া তাহাদের কয়েকজনকে হত্যা করিল। অবশেষে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর সাহায্যে যথেচ্ছ

ত্রিবাঙ্কুরে বিদ্রোহ

অত্যাচার করিয়া এই বিদ্রোহ দমন করা হইল। বিদ্রোহী দেওয়ান ভেলু তাম্পী (Velu Tampi) আত্মহত্যা করিলেন।

মাদ্রাজের সৈনিক বিদ্রোহ

এই বিদ্রোহ ভিন্ন মাদ্রাজের সেনাবাহিনীর কতকগুলি আর্থিক সুযোগ-সুবিধা উঠাইয়া দিলে তাহারা বিদ্রোহী হইয়া উঠে। অবশ্য এই বিদ্রোহ সম্পূর্ণভাবে সংগঠিত হইবার পূর্বেই দমিত হয়।

ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির ভারতীয় বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার বিলুপ্ত

সনন্দ বা চার্টার এ্যাক্ট, ১৮১৩ (Charter Act of 1813): ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের চার্টার এ্যাক্ট্-এর মেয়াদ শেষ হইলে নূতন চার্টার এ্যাক্ট্ পাস করা প্রয়োজন হইল। সেই সময়ে নেপোলিয়ন বোনাপার্টি ইওরোপের বাণিজ্য বন্দরগুলিতে ইংরাজ বণিকদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। ফলে, ইংরাজ বণিকদের মধ্যে ভারতীয় বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ করিবার এক ব্যাপক আগ্রহ দেখা দিয়াছিল। ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া অধিকারের বিরোধিতা পার্লামেণ্টের অভ্যন্তরে এবং বাহিরে তীব্র আকার ধারণ করিলে, কতকগুলি শর্তাধীনে ভারতীয় বাণিজ্য অপরাপর বণিক ও বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানের নিকটও উন্মুক্ত করা হইল। ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানি স্বভাবতই এক তীব্র প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইল। লর্ড গ্রেন্‌ভিল্ (Lord Grenville) ভারতবর্ষে কোম্পানির শাসন-ব্যবস্থার স্থলে ব্রিটিশ সরকারের শাসন প্রবর্তনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দ্বারা ভারতীয় সাম্রাজ্য শাসনের জন্য উপযুক্ত কর্মচারী (Civil Servants) নিয়োগের প্রস্তাবও তিনি করিয়াছিলেন। তাঁহার কোন প্রস্তাব-ই তখন পার্লামেণ্ট কর্তৃক গৃহীত হইল না। ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানি আরও বিশ বৎসরের জন্য কেবলমাত্র চীন দেশীয় বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার লাভ করিয়াছিল। এই চার্টার-এ সর্বপ্রথম ভারতীয় সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের উৎসাহ-দান এবং ভারতীয়দের মধ্যে বিজ্ঞান-সংক্রান্ত শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট এক লক্ষ টাকা (তখনকার দশ হাজার

লর্ড গ্রেন্‌ভিল্-এর প্রস্তাব

ভারতীয়দের শিক্ষা ও সাহিত্যে উৎসাহদান

পাউণ্ড অপেক্ষা সামান্য অধিক) ব্যয়-বরাদ্দ করিলেন। কলিকাতায় একজন বিশপ (Bishop) এবং তিনজন আর্ক-ডেকন্ (Arch-deacon) অর্থাৎ বিশপের নিম্নপর্যায়ের যাজক নিযুক্ত করিবার এবং কোম্পানির সামরিক ও বেসামরিক কর্মচারিবর্গকে উপযুক্ত শিক্ষা দিবার ব্যবস্থাও এই চার্টার-এ করা হইল।

কলিকাতায় বিশপ নিয়োগ

লর্ড ময়রা বা লর্ড হেস্টিংস্, ১৮১৩-২৩ (Lord Moira or Lord Hastings): লর্ড মিণ্টোর পর লর্ড ময়রা গবর্ণর-জেনারেল-পদে নিযুক্ত হইলেন। উনষাট বৎসর বয়সে লর্ড ময়রা যখন ভারতবর্ষে গবর্ণর-জেনারেল হইয়া আসিলেন তখন অনেকের মনেই এই সন্দেহ জাগিয়াছিল যে, তিনি হয়ত এই গুরুদায়িত্ব-পালনে সক্ষম হইবেন না। বস্তুত সেই সময়ে কোম্পানির সম্মুখীন সমস্যাগুলিও যেমন ছিল জটিল তেমনি ছিল বিভিন্ন ধরণের।

লর্ড ময়রার নিয়োগ

লর্ড ময়রা ও নেপাল (Lord Moira & Nepal): ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে অযোধ্যার নবাব গোরক্ষপুর অঞ্চলটি কোম্পানিকে ছাড়িয়া দিলে কোম্পানির রাজ্যসীমা নেপালের সীমা পর্যন্ত বিস্তারলাভ করিয়াছিল। নেওয়ারী বংশের রাজাকে পরাজিত করিয়া গুর্খা-নেতা পৃথ্বীনারায়ণ সমগ্র নেপাল দখল করিয়াছিলেন (১৭৬৮)। পার্বত্য অঞ্চলে স্বভাবতই সুনির্দিষ্ট সীমারেখা বলিয়া কিছু ছিল না। ফলে, গুর্খা ও ব্রিটিশের মধ্যে সীমান্তরেখা-সংক্রান্ত সংঘর্ষের সৃষ্টি হইল। এই ব্যাপারে শেষ পর্যন্ত ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে নেপালের সহিত ইংরাজদের যুদ্ধ ঘটে। লর্ড ময়রা জেনারেল অক্টারলনী (General Octerlony)-কে নেপালের সহিত যুদ্ধে সেনাপতি-পদে নিযুক্ত করিলেন। যুদ্ধের প্রথমদিকে পরাজয় স্বীকার করিলেও শেষ পর্যন্ত অক্টারলনী নেপালের সেনাপতি অমর সিংহকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইলেন। ইহার পরও কিছুকাল যুদ্ধ চলিল। শেষ পর্যন্ত সগৌলি (Sagauli)-এর সন্ধি (১৮১৬) দ্বারা উভয়পক্ষের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হইল। নেপালের রাজা কাঠমণ্ডুতে একজন ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট (Resident) রাখিতে স্বীকৃত হইলেন। ইহা ভিন্ন সিম্‌লা, মুসৌরা, আল্‌মোড়া, রাণীক্ষেত, নৈনিতাল ও ল্যাণ্ডোর প্রভৃতি স্থানও

গুর্খা যুদ্ধ (১৭১৪-১৬)

সগৌলির সন্ধি

ইংরাজদের অধিকারভুক্ত হইল। নেপালের রাজা সিকিম হইতে সৈন্য অপসারণে বাধ্য হইলেন। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ময়রা সিকিম (Sikim)-এর সহিত মিত্রতা চুক্তিতে আবদ্ধ হইলেন। এই চুক্তি দ্বারা নেপাল হইতে সগৌলির সন্ধির দ্বারা প্রাপ্ত স্থানগুলির ক্ষুদ্র একাংশ সিকিম রাজ্যকে দেওয়া হইয়াছিল। গুর্খাদের সহিত যুদ্ধে সাফল্যলাভের পুরস্কারস্বরূপ লর্ড ময়রাকে 'মার্কুয়েস্-অব-হেস্টিংস্' (Marquess of Hastings) উপাধিতে ভূষিত করা হইয়াছিল (১৮১৭)।

সিকিম রাজ্যের সহিত সন্ধি

লর্ড ময়রার 'লর্ড হেস্টিংস্' উপাধি লাভ

পিণ্ডারি দমন (Suppression of the Pindaries): উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে পিণ্ডারি নামে এক দুর্ধর্ষ লুণ্ঠনকারী দল মালব, মেবার, মাড়বার, বেরার এবং ক্রমে নিজাম ও পেশওয়ার রাজ্যে হানা দিতে আরম্ভ করে। ইহারা প্রথমে মারাঠা বাহিনীতে যোদ্ধা হিসাবেই কাজ গ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু মারাঠা শক্তি বিচ্ছিন্ন ও দুর্বল হইয়া পড়িলে পিণ্ডারিগণ নিজেরা-ই দলবদ্ধ হইয়া ভারতের বিভিন্ন অংশে লুঠতরাজ শুরু করে। সামরিক বাহিনী হইতে কর্মচ্যুত সৈনিক, অবলম্বনহীন বেকার প্রভৃতি যাবতীয় সামাজিক বন্ধনহীন লোকের পক্ষে পিণ্ডারিদলভুক্ত হইবার অপূর্ব সুযোগ ছিল। মুসলমান সম্প্রদায় হইতেই এই প্রকারের লোক অধিক সংখ্যায় পিণ্ডারিদলভুক্ত হইত। ম্যাল্কম্ (Malcolm)-এর বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, পিণ্ডারিদের মধ্যে যাহারা মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল তাহাদের স্ত্রীলোকেরা হিন্দু স্ত্রীলোকের মতো হিন্দু আচার-আচরণ মানিয়া চলিত। বস্তুত পিণ্ডারিদের মধ্যে ধর্মের কোন ভেদাভেদ ছিল না। হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকও পিণ্ডারিদলভুক্ত ছিল। লুঠতরাজ, হত্যাকাণ্ড, স্ত্রীলোকদের উপর অত্যাচার প্রভৃতিতে পিণ্ডারিগণ ছিল সিদ্ধহস্ত।

পিণ্ডারিদের প্রকৃতি ও কার্যপদ্ধতি

কোম্পানির রাজ্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়া পিণ্ডারিগণ লুঠতরাজ আরম্ভ না করা পর্যন্ত ইংরাজগণ পিণ্ডারিদের অত্যাচার নিরোধকল্পে কোন ব্যবস্থা করা প্রয়োজন মনে করে নাই। কিন্তু ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে পিণ্ডারিগণ কোম্পানির রাজ্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দক্ষিণ-বিহার ও মির্জাপুর শ্মশানে পরিণত করে। ইহার পর ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে পিণ্ডারিগণ উত্তর-সরকার (Northern Sircars)

কোম্পানির রাজ্যে পিণ্ডারি আক্রমণ (১৮১২), (১৮১৬)

আক্রমণ করিয়া বহু-সংখ্যক গ্রাম লুণ্ঠন করে এবং ১৮২ জন গ্রামবাসীকে হত্যা করে। তখন কলিকাতা কাউন্সিল ও ডাইরেক্টর সভা পিণ্ডারি দমনের প্রয়োজনীয়তা স্বভাবতই উপলব্ধি করিলেন। লর্ড হেস্টিংস্ পিণ্ডারি দস্যুদের দমন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। ইতিমধ্যে ডাইরেক্টর সভার নিকট হইতেও পিণ্ডারি দমনের নির্দেশ আসিয়া পেঁাছিল। এক বৎসরেরও অল্প সময়ের মধ্যেই পিণ্ডারি-নেতা করিম খাঁ ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর নিকট আত্ম-সমর্পণ করিতে বাধ্য হইল। তাহার ভরণপোষণের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা কোম্পানি হইতে করিয়া দেওয়া হইল। পিণ্ডারিদলের প্রধান নেতা আমীর খাঁ ব্রিটিশের সহিত কোনপ্রকার সংঘর্ষের পূর্বেই এক চুক্তিবদ্ধ হইয়া রাজপুতনার টঙ্ক নামক স্থানে জায়গীর প্রাপ্ত হইয়াছিল। অপরাপর পিণ্ডারি নেতার মধ্যে চিতু আত্মরক্ষার্থে অসীরগড়ের অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলে সেখানে ব্যাঘ্র কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া প্রাণ হারাইল এবং ওয়াসিল মোহম্মদ আত্মহত্যা করিয়া ব্রিটিশ কবল হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। লর্ড হেস্টিংসের আমলে এইভাবে পিণ্ডারি দস্যুদলকে দমন করা হইয়াছিল।

লর্ড হেস্টিংস্ কর্তৃক পিণ্ডারি দমন

লর্ড হেস্টিংস্ ও মারাঠাগণ: তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ (Lord Hastings and the Marathas: The Third Anglo-Maratha War): ব্যাসিনের সন্ধির পর হইতেই পেশওয়া দ্বিতীয় বাজীরাও ইংরাজদের প্রভাবমুক্ত হইতে সচেষ্ট ছিলেন। ইংরাজ প্রাধান্য দিন দিনই তাঁহার নিকট অধিক হইতে অধিকতর অসহনীয় হইয়া উঠিতেছিল। রাজ্যের অভ্যন্তরে জায়গীর-দারগণের স্ব স্ব প্রাধান্য দমন করিয়া বাজীরাও শক্তি-সঞ্চয় করিতে সমর্থ হইলে স্বভাবতই ব্রিটিশ প্রাধান্য নাশের ইচ্ছা তাঁহার আরও বৃদ্ধি পাইল। ত্রিম্বকজী দাংলিয়া নামক জনৈক কূটকৌশলী ব্যক্তিকে তিনি তাঁহার প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করিলেন। ত্রিম্বকজী যেমন ছিলেন নীতিজ্ঞানহীন তেমনি ছিলেন ষড়যন্ত্রপ্রিয়। কিন্তু ব্রিটিশ প্রাধান্য নাশ করিয়া পেশওয়াকে পুনরায় স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিবার মতো দেশাত্মবোধও তাঁহার ছিল। ত্রিম্বকজীর প্রেরণায় বাজীরাও ব্রিটিশ বিতাড়নের উদ্দেশ্যে হোল্‌কার, সিন্ধিয়া, ভোঁসলে এবং পাঠান নেতা আমীর খাঁ ও পিণ্ডারিদের সহিত গোপনে আলাপ-আলোচনা চালাইতে লাগিলেন।

পেশওয়া দ্বিতীয় বাজীরাও-এর ইংরাজ-বিদ্বেষ

বরোদা রাজ্যের উপর পেশওয়ার দাবি-সংক্রান্ত হিসাবের মীমাংসার জন্য ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে গাইকোয়াড়-এর দেওয়ান গঙ্গাধর শাস্ত্রী ব্রিটিশ নিরাপত্তাধীনে পুণায় আসিলে ত্রিম্বকজী তাঁহাকে গোপনে হত্যা করিলেন। এজন্য পুণার ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট্ এল্‌ফিন্‌স্টোন্ পেশোয়ার নিকট ত্রিম্বকজীর সমর্পণ দাবি করিলেন। পেশওয়া এই দাবি অস্বীকার করায় এল্‌ফিন্‌স্টোন্ ত্রিম্বকজীকে বন্দী করিলে পেশওয়া বাজীরাও-এর পরোক্ষ সাহায্যে ত্রিম্বকজী বন্দি-দশা হইতে পলায়ন করিতে সক্ষম হইলেন। ইহার পর পেশওয়ার অর্থসাহায্যে তিনি ব্রিটিশ-বিরোধী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইলেন। পেশওয়া বাজীরাও নিজেও যুদ্ধের জন্য গোপনে প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। পুণার রেসিডেণ্ট্ এল্‌ফিন্‌স্টোন্ পেশওয়ার এই সকল ব্রিটিশ-বিরোধী ষড়যন্ত্র ও সামরিক প্রস্তুতির প্রমাণ পাইয়া তাঁহাকে কতকগুলি অপমানজনক শর্তে চুক্তিবদ্ধ হইতে বাধ্য করিলেন (জুন, ১৮১৭)। ইহা পুণা চুক্তি (Poona Pact) নামে পরিচিত। এই চুক্তির শর্তানুসারে বাজীরাও পেশওয়া মারাঠা রাষ্ট্রসঙ্ঘ (Maratha Confederacy)-এর নেতৃত্ব ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। ব্রিটিশ রেসিডেণ্টের অজ্ঞাতে তিনি অপর কোন দেশীয় বা বিদেশীয় শক্তির সহিত কোনপ্রকার যোগাযোগ স্থাপন করিতে পারিবেন না এই শর্তও তাঁহাকে মানিয়া লইতে হইল। ব্রিটিশ সামরিক সাহায্যের বিনিময়ে অর্থদানের পরিবর্তে মালব, বুন্দেলখণ্ড প্রভৃতি অঞ্চল তিনি কোম্পানিকে ছাড়িয়া দিলেন। এই সকল স্থানের বাৎসরিক আয় ছিল ৩৪ লক্ষ টাকা। গাইকোয়াড়-এর নিকট হইতে বাৎসরিক চারি লক্ষ টাকা পাইবার শর্তে বরোদা রাজ্যের উপর তাঁহার যাবতীয় দাবি তিনি ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন।

ইংরাজ প্রাধান্য বিলোপের জন্য সামরিক প্রস্তুতি

পেশওয়া বাজীরাও-এর সহিত নূতন চুক্তি (জুন, ১৮১৭)

চুক্তির শর্তাদি

দ্বিতীয় বাজীরাও ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের চুক্তির শর্তাদি কেবলমাত্র পরিস্থিতির চাপেই মানিয়া লইয়াছিলেন। ইহাতে ইংরাজদের প্রতি বিদ্বেষ তাঁহার বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। পিণ্ডারি দমনে যখন ব্রিটিশ সেনাবাহিনী ব্যস্ত তখন সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে মনে করিয়া পেশওয়ার নব-নিযুক্ত প্রধানমন্ত্রী গোকুলা তাঁহাকে

পেশওয়ার মন্ত্রী গোক্‌লার ইংরাজ-বিদ্বেষ

ইংরাজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে উৎসাহিত করিলেন। সেই বৎসর-ই (১৮১৭) নভেম্বর মাসে পেশওয়া পুণা হইতে ব্রিটিশ সৈন্য অপসারণের দাবি জানাইলেন।

এদিকে রঘুজী ভোঁসলের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে (১৮১৬) তাঁহার রাজ্যে এক অব্যবস্থা দেখা দিয়াছিল। রঘুজীর পুত্র পার্শ্বজী ছিলেন দুর্বলচিত্ত এবং অকর্মণ্য। তাঁহার আমলে আপ্পা সাহেব শাসনকার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন। ভোঁসলে রাজ্যের এই অব্যবস্থার সুযোগে ইংরাজগণ আপ্পা সাহেবকে ব্রিটিশের সহিত অধীনতামূলক মিত্রতাবদ্ধ হইতে বাধ্য করিল (১৮১৬)। এইভাবে নাগপুরেও ব্রিটিশ প্রাধান্য স্থাপিত হইল। এই চুক্তি আপ্পা সাহেব অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

নাগপুর অধীনতামূলক মিত্রতাবদ্ধ : আপ্পা সাহেব

পর বৎসর (১৮১৭) পিণ্ডারি দমন করিবার পূর্বে লর্ড হেস্টিংস্ একথা উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, মারাঠাদের রাজ্যে প্রবেশ করিয়া পিণ্ডারিদের আক্রমণ করিলে ইংরাজদের সহিত মারাঠাদের সংঘর্ষ উপস্থিত হইতে পারে। এজন্য তিনি দৌলত রাও-এর সহিত ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে এক চুক্তি স্বাক্ষর করিলেন। এই চুক্তির শর্তানুসারে দৌলত রাও সিন্ধিয়া কোম্পানিকে পিণ্ডারি দমনের এবং রাজপুত রাজ্যগুলির সহিত চুক্তি সম্পাদনের অধিকার দান করিয়াছিলেন।

সিন্ধিয়ার সহিত কোম্পানির চুক্তি (১৮১৭)

কিন্তু পেশওয়া বাজীরাও এবং তাঁহার মন্ত্রী গোক্‌লার চেষ্টায় হোলকার ভোঁসলে এবং সিন্ধিয়া—সকলেই মারাঠা জাতির লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধারকল্পে সংঘবদ্ধ হইলেন। পেশওয়া বাজীরাও সর্বপ্রথম ব্রিটিশ-বিরোধিতায় অবতীর্ণ হইয়া পুণার ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট্-এর আবাস-গৃহে আগুন লাগাইবার ব্যবস্থা করিলেন। এল্‌ফিন্‌স্টোন্ কোনক্রমে প্রাণ লইয়া কির্‌কিতে পলাইয়া আসিলেন। কির্‌কিতে সেই সময়ে একটি ব্রিটিশ সামরিক ঘাঁটি ছিল। পেশওয়া পর পর দুইবার কির্‌কি আক্রমণ করিয়া বিফল হইলেন এবং পুণা ত্যাগ করিয়া পলাইয়া গেলেন। পুণা ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী কর্তৃক অধিকৃত হইল। আপ্পা সাহেব সীতাবল্‌দী ও নাগপুর-এর যুদ্ধে পরাজিত হইলেন।

গোক্‌লার চেষ্টায় ইংরাজ বিরোধিতা : তৃতীয় মারাঠা যুদ্ধ

তিনিও আত্মরক্ষার্থে পলাইয়া যোধপুরে আশ্রয় লইলেন। মল্‌হর রাও হোল্‌কার-এর সেনাবাহিনীও ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে আঁটিয়া উঠিতে পারিল না। মাহিদপুর-এর যুদ্ধে তাহারা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইল (১৮১৭, ডিসেম্বর)। পেশওয়া বাজীরাও-এর সেনাবাহিনী পুণা রক্ষা করিতে না পারিলেও তাঁহার মন্ত্রী গোক্‌লার নেতৃত্বে যুদ্ধ করিয়া চলিল। কোরগাঁও এবং অশ্‌তির (Koregaon and Ashti) যুদ্ধে ব্রিটিশ হস্তে পরাজিত হইলে পেশওয়ার আত্মসমর্পণ ভিন্ন গত্যন্তর রহিল না। পেশওয়ার অনুগত মন্ত্রী গোক্‌লা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যুদ্ধ করিয়া প্রাণ হারাইলেন। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে অনন্যোপায় হইয়া বাজীরাও সার্‌ জন ম্যাল্‌কম্‌-এর নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন।

কোরগাঁও ও অশ্‌তির যুদ্ধে বাজীরাও-এর পরাজয়

লর্ড হেস্টিংস্‌ পেশওয়া-পরিবার হইতে ভবিষ্যতে যাহাতে আর কোন বিপদ আসিতে না পারে সেই ব্যবস্থা করিতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। বাজী-রাওকে বাৎসরিক আট লক্ষ টাকা ভাতা দানের ব্যবস্থা করিয়া তাঁহাকে কানপুরের নিকট বিঠুর নামক স্থানে ব্রিটিশ প্রহরাধীনে রাখা হইল। বাজী-রাও-এর ভূতপূর্ব মন্ত্রী ত্রিম্বকজীকে যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ করিয়া রাখা হইল। লর্ড হেস্টিংস্‌ দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাজনীতিক ছিলেন। তিনি পেশওয়ার রাজ্যের একাংশ শিবাজীর জনৈক বংশধর প্রতাপ সিংহকে অর্পণ করিয়া মারাঠা জাতির সন্তুষ্টি বিধান করিয়াছিলেন। প্রতাপ সিংহ সাতারায় তাঁহার রাজধানী স্থাপন করিয়া রাজত্ব করিতে লাগিলেন। পেশওয়ার রাজ্যের অবশিষ্টাংশ ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত হইল। এল্‌ফিন্‌স্টোন্‌ ও গ্রান্ট ডাফ্‌ এই নব-অধিকৃত রাজ্যের শাসনব্যবস্থা সংগঠনের কাজ করিয়াছিলেন। উভয়েই ঐতিহাসিক হিসাবে যথেষ্ট প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন।

পেশওয়া-তন্ত্রের অবসান

আপ্পা সাহেবের বিরোধিতার শাস্তিস্বরূপ ভোঁসলে রাজ্যের একাংশ ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত করা হইল এবং অপরাংশ ব্রিটিশের এক তাঁবেদার রাজার অধীনে স্থাপন করা হইল।

আপ্পা সাহেবের পরাজয়

১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে নাবালক হোল্‌কারের মন্ত্রী তাঁতিয়া জোগ (Tantia Jog)-

এর সহিত ইংরাজদের সন্ধি স্থাপিত হইল। এই সন্ধির দ্বারা হোল্‌কার রাজপুত রাজ্যগুলি এবং আমীর খাঁর রাজ্যের উপর সর্বপ্রকার দাবি ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। ইহা ভিন্ন নিজ খরচে একদল ব্রিটিশ সৈন্য পোষণ করিতে এবং ব্রিটিশ রেসিডেণ্টের অজ্ঞাতে অপর কোন রাজ্যের সহিত কোনপ্রকার সংযোগ স্থাপন না-করিতে স্বীকৃত হইলেন।

হোল্‌কারের সহিত সন্ধি স্থাপন

লর্ড হেস্টিংস্ ও রাজপুত রাজ্যসমূহ (Lord Hastings and the Rajput States): একদা-শক্তিশালী রাজপুত জাতি উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ক্রমাগত মারাঠা আক্রমণের ফলে বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত ও দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। কোম্পানির কর্মকর্তাগণ রাজপুত রাজ্যগুলিকে উপেক্ষা করিয়াই চলিয়াছিলেন। একমাত্র লর্ড ওয়েলেস্‌লী জয়পুর ও যোধপুর রাজ্যের সহিত মিত্রতাবদ্ধ হইয়াছিলেন। ইংরাজদের সহায়তালাভ করিতে পারিলে রাজপুত জাতি হয়ত মারাঠা হানাদারদের প্রতিহত করিতে সক্ষম হইত। পিণ্ডারি আক্রমণেও রাজপুত রাজ্যগুলি শ্মশানভূমিতে পরিণত হইতে চলিয়াছিল। দৌলত রাও সিন্ধিয়া এবং পিণ্ডারি-নেতা আমীর খাঁ রাজপুতনাকে তাঁহাদের অধিকারভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। এই সময়ে লর্ড হেস্টিংস্ ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে সিন্ধিয়ার সহিত যে চুক্তি স্বাক্ষর করিয়াছিলেন উহার শর্তানুযায়ী কোম্পানির পক্ষে রাজপুত রাজ্যগুলির সহিত সরাসরি সম্পর্ক স্থাপনের আর কোন বাধা রহিল না। ইহারপর লর্ড হেস্টিংস্ বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন চুক্তি দ্বারা রাজপুতনার বৃহৎ এবং ক্ষুদ্র—সকল রাজ্যকেই কোম্পানির অধীনতামূলক মিত্রতায় আবদ্ধ করিলেন। রাজপুত রাজন্যবর্গ ব্রিটিশ রেসিডেণ্টের অজ্ঞাতে অপর কোন তৃতীয় পক্ষের সহিত আলাপ-আলোচনা করিবেন না—এই শর্ত মানিয়া লইলেন এবং কোম্পানির সামরিক সাহায্যের জন্য বাৎসরিক কর দানে স্বীকৃত হইলেন। এইভাবে লর্ড হেস্টিংসের আমলে কোম্পানির রাজ্যসীমা, প্রাধান্য ও প্রতিপত্তি বহুগুণে বৃদ্ধি পাইল।

রাজপুত রাজ্যগুলির কোম্পানির অধীন মিত্ররাজ্যে পরিণত

মারাঠা শক্তির পতন (The Fall of the Maratha Power): সলবই-এর সন্ধির পর মারাঠা রাষ্ট্রসংঘের (Maratha

Confederacy) মধ্যে আভ্যন্তরীণ বিবাদ-বিসম্বাদ ও স্বার্থ-দ্বন্দ্ব শুরু হয়। কিন্তু এইরূপ পরিস্থিতিতেও নানা ফড়নবিশ, মাহ্‌দজী সিন্ধিয়া, অহল্যা বাঈ প্রভৃতি কয়েকজন শক্তিশালী শাসকের উদ্ভব ঘটিয়াছিল।

মারাঠা রাষ্ট্রসংঘের দুর্বলতা

হোল্‌কার রাজ্য (ইন্দোর) (Holkers of Indore) : ইন্দোর-এর অহল্যা বাঈ শাসনকার্যে অনন্যসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। মারাঠা ইতিহাস-বিশারদ সার্ জন ম্যাল্‌কম্ (Sir John Malcolm) অহল্যা বাঈ-এর শাসনব্যবস্থা ও ব্যক্তিগত চরিত্রের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। অহল্যা বাঈ-এর মৃত্যুর পর (১৭৯৫) তুকোজী হোল্‌কার ইন্দোরের শাসনভার প্রাপ্ত হইলেন। মাত্র দুই বৎসরের মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু ঘটিলে হোল্‌কার রাজ্যে এক ব্যাপক অরাজকতা দেখা দেয়। তুকোজীর পুত্র যশোবন্ত রাও হোল্‌কার-এর আমলে মারাঠা রাষ্ট্রসংঘের মধ্যে আত্মকলহ দেখা দিলে স্বভাবতই মারাঠা জাতীয় স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইল। ইংরাজগণ কর্তৃক অনুসৃত না-হস্তক্ষেপ নীতির সুযোগ গ্রহণ করা মারাঠাদের পক্ষে সম্ভব হইল না। ফলে, নানা ফড়নবিশের মৃত্যুর পর যশোবন্ত রাও হোল্‌কার ও দৌলত রাও সিন্ধিয়া পুণায় পেশওয়া-পদ দখলের জন্য এক আত্মঘাতী অন্তর্দ্বন্দ্বে লিপ্ত হইলেন। পেশওয়া দ্বিতীয় বাজীরাও অবশ্য দৌলত রাও সিন্ধিয়াকে স্বপক্ষে আনিতে সক্ষম হইলেন। কিন্তু যশোবন্ত রাও-এর হস্তে পেশওয়া ও সিন্ধিয়ার যুগ্মবাহিনী সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হইল। যশোবন্ত রাও হোল্‌কার রাঘোবার জনৈক বংশধর বিনায়ক রাওকে পেশওয়া-পদে স্থাপন করিয়া নিজেই প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী রহিলেন। বাজীরাও এই সময়েই (১৮০২) ব্যাসিনের সন্ধি দ্বারা পেশওয়া-তন্ত্রের স্বাধীনতা ব্রিটিশ সামরিক সাহায্যের বিনিময়ে বিক্রয় করিয়া দিলেন এবং ব্রিটিশ সাহায্যে তিনি নিজরাজ্যে পুনঃস্থাপিত হইলেন। অপরাপর মারাঠা নেতৃবর্গ পেশওয়ার এইরূপ আত্মবিক্রয় জাতীয় অপমান বলিয়া মনে করিলেন। সিন্ধিয়া ও ভোঁসলে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য যুগ্মভাবে সচেষ্ট হইলেন। কিন্তু হোল্‌কার এই জাতীয় বিপদেও তাঁহাদের সহিত যোগ দিলেন না। দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধে সিন্ধিয়া ও ভোঁসলে

অহল্যা বাঈ

যশোবন্ত রাও হোল্‌কার

পরাজিত হইয়া ব্রিটিশকে নিজ নিজ রাজ্যের একাংশ ছাড়িয়া দিতে এবং ব্রিটিশের অধীনতামূলক মিত্রতা গ্রহণে বাধ্য হইলেন।

[দ্বিতীয় মারাঠা যুদ্ধের বিশদ বিবরণ ১৪৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।]

১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে অবশ্য হোল্‌কার এককভাবে ব্রিটিশের সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন এবং ব্রিটিশ সেনাপতি কর্ণেল মন্‌সন্‌কে মুকুন্দরা গিরিসঙ্কটের নিকট সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করিলেন। ভরতপুরের রাজাও হোল্‌কারের সহিত যুগ্মভাবে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। জেনারেল লেক্‌ ভরতপুর আক্রমণ করিয়া অকৃতকার্য হইলেও ভরতপুরের রাজা ব্রিটিশের সহিত সন্ধি স্থাপন করিলেন। ইতিমধ্যে হোল্‌কার দিল্লী অবরোধ করিতে গিয়া অকৃতকার্য হইয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন জেনারেল লেক্‌-এর হস্তেও তাঁহার পরাজয় ঘটিয়াছিল। ঠিক সেই সময়ে ওয়েলেস্‌লীকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের আদেশ দেওয়া হইলে হোল্‌কার রক্ষা পাইলেন। ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ব্রিটিশের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিলেন।

ব্রিটিশের সহিত সংঘর্ষ : সন্ধি (১৮০৬)

[১৫০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।]

পেশওয়া (পুণা): নানা ফড়নবিশ (The Peshwas of Poona : Nana Fadnavish): রাঘোবা বা রঘুনাথ রাও-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া পেশওয়া মাধব রাও নারায়ণকে পেশওয়া-পদে স্থাপনের জন্য নানা ফড়নবিশের অক্লান্ত চেষ্টার কথা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। (৮৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। পেশওয়া মাধব রাও নারায়ণের আমলে মারাঠা প্রধান-মন্ত্রী নানা ফড়নবিশ-ই প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া মারাঠা-শক্তির পতন পর্যন্ত মারাঠা-ইতিহাসের অন্যতম দূরদর্শী ক্ষমতাবান শাসক ছিলেন নানা ফড়নবিশ। তাঁহার অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব, বিচক্ষণতা এবং মৌলিক প্রতিভার ভূয়সী প্রশংসা সমসাময়িক ইওরোপীয়দের রচনায়ও পাওয়া যায়।

নানা ফড়নবিশ মারাঠা প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত

নানা ফড়নবিশ কেবল রাঘোবার বিরুদ্ধে মাধব রাও নারায়ণকে জয়যুক্ত করিতে সাহায্য করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না। তিনি টিপু কর্তৃক অধিকৃত নর্মদা

নদীর দক্ষিণতীরস্থ মারাঠা রাজ্য পুনরুদ্ধার করিবার উদ্দেশ্যে হায়দরাবাদের নিজামের সহিত সংঘবদ্ধ হইলেন। টিপু মারাঠা-নিজাম আক্রমণ প্রতিহত করিবার বৃথা চেষ্টা করিয়া ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ৪৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ এবং বাদামী, কিট্টুর ও নারগুন্দ্ মারাঠাদের ফিরাইয়া দিলেন। ইহার কিছুকাল পরেই টিপু ও মারাঠাদের মধ্যে পুনরায় সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে মারাঠা, নিজাম ও ব্রিটিশের মধ্যে এক 'ত্রয়ী-শক্তি-চুক্তি' (Triple Alliance) সম্পাদিত হইল। কিন্তু এই চুক্তি কেবলমাত্র টিপুর ক্ষমতা খর্ব করিবার উদ্দেশ্যেই স্বাক্ষরিত হইয়াছিল।

তাঁহার কার্যকলাপ—টিপুর সহিত যুদ্ধ

বস্তুত মারাঠাগণ নিজাম অথবা ব্রিটিশের সহিত আন্তরিক মিত্রতা স্থাপনের পক্ষপাতী ছিল না। মারাঠা নেতৃবর্গ এইবার নিজামের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করিলেন। ইংরাজদের পূর্ব-প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও নিজাম কোন সাহায্য পাইলেন না। ফলে খর্দা (Kharda)-এর যুদ্ধে নিজাম মারাঠাবাহিনী কর্তৃক শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইলেন (১৭৯৫)।

খর্দার যুদ্ধে নিজামের পরাজয় (১৭৯৫)

খর্দার যুদ্ধে জয়লাভের ফলে মারাঠা সাম্রাজ্যের সীমা এবং প্রতিপত্তি উভয়ই বৃদ্ধি পাইল। নানা ফড়নবিশ পুণা তথা সমগ্র মারাঠা রাষ্ট্রসংঘে এক অভূতপূর্ব মর্যাদা লাভ করিলেন। সেই বৎসরই পেশওয়া মাধব রাও নারায়ণ নানা ফড়নবিশের প্রভুত্ব হইতে মুক্ত হইবার কোন আশা নাই দেখিয়া আত্মহত্যা করিলেন। ফলে, দ্বিতীয় বাজীরাও পেশওয়া-পদে অধিষ্ঠিত হইলেন। বাজীরাও এবং নানা ফড়নবিশের মধ্যে ব্যক্তিগত শত্রুতা ছিল, এই কারণে নানা ফড়নবিশ বাজীরাও-এর পেশওয়া-পদ লাভের পক্ষপাতী ছিলেন না। এই সূত্রে পুণায় রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে স্বভাবতই মারাঠা ঐক্য ব্যাহত হইল। সুযোগ বুঝিয়া নিজাম খর্দার যুদ্ধের ফলে যে-সকল স্থান হারাইয়াছিলেন সেগুলি পুনর্দখল করিতে সমর্থ হইলেন। বাজীরাও-এর আমলে মারাঠা ঐক্য বিনাশপ্রাপ্ত হইল। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে নানা ফড়নবিশের মৃত্যু ঘটিলে বাজীরাও-এর আত্মঘাতী নীতি অনুসরণের কোন বাধা রহিল না। নানা ফড়নবিশের মৃত্যুর পর মারাঠা রাষ্ট্রসংঘের ঐক্য বজায় রাখিবার মত ক্ষমতা ও বিচক্ষণতা অপর আর কাহারও ছিল না। ইংরাজদের বিরুদ্ধে মারাঠা

দ্বিতীয় বাজীরাও এবং নানা ফড়নবিশের বিবাদ—মারাঠা শক্তির দুর্বলতা

শক্তিকে দৃঢ়তর করিবার উপায় হিসাবে ফরাসী সাহায্য ও সহানুভূতি-লাভের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিবার দূরদৃষ্টি নানা ফড়নবিশের ছিল। এজন্য ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে লাব্‌লিন (Chavalier de Lublin) নামে জনৈক ফরাসী ভাগ্যান্বেষীকে তিনি নানাপ্রকার বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা দানে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। রাজনৈতিক দূরদর্শিতা, দেশাত্মবোধ, মারাঠা জাতীয় ঐক্য বজায় রাখিবার ঐকান্তিকতা—প্রভৃতি গুণের জন্য নানা ফড়নবিশ ম্যাল্‌কম, গ্রাণ্ট্ ডাফ্ প্রভৃতি সমসাময়িক ইংরাজ পদস্থ কর্মচারি ও ঐতিহাসিকদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ করিয়াছেন। তাঁহার জীবদ্দশায় পুণা ব্রিটিশের অধীনতামূলক মিত্রতা প্রত্যাখ্যান করিয়া চলিয়াছিল। তাঁহার কূটকৌশলের প্রশংসা করিতে গিয়া ব্রিটিশ লেখকগণ তাঁহাকে মেকিয়াভেলি (Machiavelli)-এর সহিত তুলনা করিয়াছেন। আধুনিক ঐতিহাসিকদের কেহ কেহ নানা ফড়নবিশ উত্তর-ভারতের দিকে মারাঠা শক্তিবিস্তারের কোন চেষ্টা করেন নাই বলিয়া অভিযোগ করিয়াছেন বটে, কিন্তু এই অভিযোগের যৌক্তিকতা স্বীকার করিলেও মারাঠা-ইতিহাসে নানা ফড়নবিশের অবদান শ্রদ্ধার সহিত স্মরণীয় একথা স্বীকার করিতেই হইবে।

ফড়নবিশের চরিত্র

সিন্ধিয়া (গোয়ালিওর): মাহদ্‌জী সিন্ধিয়া (Sindhias of Gwalior : Mahadji Sindhia) : রণজী সিন্ধিয়া ছিলেন গোয়ালিওর-এর সিন্ধিয়া বংশের প্রতিষ্ঠাতা। রণজী ছিলেন পেশওয়া প্রথম বাজারাও-এর বিশ্বস্ত অনুচর। সিন্ধিয়া বংশের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী এবং বিচক্ষণ শাসক ছিলেন মাহদ্‌জী সিন্ধিয়া। তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগের মারাঠা-ইতিহাসের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য নেতৃবর্গের অন্যতম ছিলেন।

মাহদ্‌জী সিন্ধিয়া বংশের শ্রেষ্ঠ শাসক

পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে মাহদ্‌জী অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং যুদ্ধে আহত হইয়া তিনি খঞ্জ হইয়া পড়িয়াছিলেন। পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের (১৭৬১) পর অতি অল্পকালের মধ্যে মারাঠাশক্তির আশ্চর্যজনক পুনরুজ্জীবনের পশ্চাতে মাহদ্‌জী সিন্ধিয়ার কৃতিত্ব ছিল সর্বাধিক। ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে মাহদ্‌জী সিন্ধিয়া সম্রাট শাহ আলমকে কারা ও এলাহাবাদ হইতে দিল্লীতে লইয়া গিয়াছিলেন

এবং তাঁহাকে নিজের হাতের পুতুলে পরিণত করিয়াছিলেন। এইভাবে সিন্ধিয়া মারাঠাদের প্রতিপত্তি ও মর্যাদা বহুগুণে বৃদ্ধি করিয়া ইংরাজদের মনে এক দারুণ ভীতির সৃষ্টি করিয়াছিলেন। প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধে তিনি ব্রিটিশের হস্তে পরাজিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মিত্রতা লাভের গুরুত্ব ইংরাজগণ উপলব্ধি করিয়াছিল। ইহা ভিন্ন মাহদ্‌জী সিন্ধিয়া মারাঠা রাষ্ট্রসংঘের নেতা হইবার আকাঙ্ক্ষাও পোষণ করিতেন। এজন্য ইংরাজদের সাহায্যলাভ করিবার ইচ্ছাও তাঁহার ছিল। সুতরাং তিনি ইংরাজদের সহিত আলাপ-আলোচনা শুরু করিলেন এবং মারাঠা রাষ্ট্রসংঘ এবং ইংরাজদের মধ্যে সন্ধিস্থাপনের ব্যবস্থা করিয়া দিতে স্বীকৃত হইলেন। তাঁহার চেষ্টায়ই সল্‌বই-এর সন্ধি স্বাক্ষরিত হইয়াছিল।

পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের পর মারাঠাশক্তি পুনরুজ্জীবনের ইতিহাসে মাহদ্‌জীর দান

মাহদ্‌জী সিন্ধিয়া মারাঠা রাষ্ট্রসংঘের নেতা পেশওয়ার আনুগত্য স্বীকার করিয়া চলিতেন। তিনি নিজ করতলগত সম্রাট শাহ্‌ আলমকে তাঁহার 'ভকিল-ই-মুল্‌তুক' (*Vakil-i-Multuk*) বা প্রতিনিধি হিসাবে পেশওয়াকে নিযুক্ত করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। পেশওয়ার সহকারীপদ অবশ্য তিনি স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছিলেন। শুধু তাহাই নহে, তিনি সম্রাটের সেনাবাহিনীর অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়া সেই সেনাবাহিনী-পোষণের ব্যয়-সংকুলান বাবদ দিল্লী ও আগ্রা নিজ অধিকারভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। এইভাবে মাহদ্‌জী সিন্ধিয়া আগ্রা হইতে শতদ্রু নদী পর্যন্ত সমগ্র ভূখণ্ডে এক অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী হইয়া উঠিয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্য ও মালবদেশেও তাঁহার রাজ্য বিস্তারলাভ করিয়াছিল। মাহদ্‌জী ইওরোপীয় পদ্ধতিতে নিজ সেনাবাহিনীকে গঠন করিয়া তুলিবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এজন্য তিনি ডি বোয়েন (De Boigne) নামে জনৈক স্যাভয়বাসীর উপর তাঁহার সেনাবাহিনীর শিক্ষার ভার অর্পণ করিয়াছিলেন।

দিল্লীর সম্রাটের উপর তাঁহার প্রভাব

মাহদ্‌জী সিন্ধিয়া রাজপুত রাজন্যবর্গের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু রাজপুত নেতৃবর্গের সম্মিলিত শক্তির নিকট তাঁহাকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইলেও (১৭৮৬) রাজপুতনায় তাঁহার প্রতিপত্তি বিস্তারলাভ

করিয়াছিল। তিনি গুলাম কাদের নামক রোহিলা-নেতা কর্তৃক দিল্লী হইতে সাময়িকভাবে ক্ষমতাচ্যুত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই পুনরায় দিল্লী অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

তাঁহার দূরদর্শিতা

দূরদর্শী মাহদ্‌জী সিন্ধিয়া টিপুর সহিত সম্মিলিতভাবে ক্রমবর্ধমান ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া পেশওয়ার সহিত এবিষয়ে আলাপ-আলোচনা চালাইয়াছিলেন। সেই সময়ে আকস্মিকভাবে তাঁহার মৃত্যু ঘটিলে মারাঠা জাতি তাহাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দূরদর্শী রাজনীতিক এবং এক অনন্যসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন নেতা হারাইয়াছিল। তাঁহার আকস্মিক মৃত্যুতে মারাঠা-ইতিহাসের এক অপূরণীয় ক্ষতি হইয়াছিল। মাহদ্‌জীর পর দৌলত রাও সিন্ধিয়া-পদ লাভ করিলেন।

[দৌলত রাও-এর কার্যাবলী তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের বিবরণে দ্রষ্টব্য, ১৬৮ পৃষ্ঠা]।

গাইকোয়াড় (বরোদা): ভোঁসলে (নাগপুর) (The Gaikawad of Baroda: Bhonsle of Nagpur): বরোদার গাইকোয়াড় অথবা নাগপুরের ভোঁসলে বংশ হইতে নানা ফড়নবিশ বা মাহদ্‌জী সিন্ধিয়া প্রভৃতির ন্যায় ক্ষমতাবান ব্যক্তির উদ্ভব ঘটে নাই। গাইকোয়াড় ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশের অধীনতামূলক মিত্রতা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

গাইকোয়াড়-এর ব্রিটিশের অধীনতামূলক মিত্রতা গ্রহণ

ইহার পর তিনি এই সন্ধি লঙ্ঘন করেন নাই। ভোঁসলে অবশ্য তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধে যোগদান করিয়া পরাজিত হইয়াছিলেন এবং ভোঁসলে রাজ্যের অধিকাংশই ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। এইভাবে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগেই মারাঠা শক্তির পতন ঘটিয়াছিল।

ভোঁসলের পরাজয়

মারাঠাদের পতনের কারণ (Causes of the Downfall of the Marathas): মোগল সাম্রাজ্যের পতনের পর সেই-স্থলে নূতন সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিবার শক্তি ও সামর্থ্য একমাত্র মারাঠাদেরই ছিল। কিন্তু মারাঠাগণ সেই সুযোগ-গ্রহণে সক্ষম না হওয়াতে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠিবার

মোগল সাম্রাজ্যের পতনের পর মারাঠা সাম্রাজ্য গঠনের সুযোগ

পূর্ণ সুযোগ ঘটিল এবং ক্রমে মারাঠা শক্তি বিস্মৃতির অন্তরালে অন্তর্হিত হইল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত মারাঠা শক্তি ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছিল। কিন্তু পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের (১৭৬১) পর হইতেই তাহাদের পতন শুরু হয়। সাময়িকভাবে মারাঠা শক্তি পুনরুজ্জীবিত হইলেও সেই সময় হইতেই মারাঠা শক্তির পতনের ইতিহাস অনুধাবন করা উচিত হইবে। পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে মারাঠা শক্তির সংহতি যেমন বিনষ্ট হইয়াছিল, পেশওয়ার মর্যাদাও তেমনি বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছিল। অবশ্য পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের কয়েক বৎসরের মধ্যেই মারাঠাগণ পুনরায় শক্তি সঞ্চয় করিয়া উত্তর-ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল, তথাপি তাহাদের এই পুনরুজ্জীবন স্থায়িত্বলাভ করিতে পারে নাই। ফলে, মারাঠাগণ শুধু সাম্রাজ্য-গঠনেই অকৃতকার্য হইয়াছিল এমন নহে, তাহারা আত্মরক্ষার ক্ষমতাও শেষ পর্যন্ত হারাইয়াছিল। মারাঠাদের পতনের তথা ভারতে স্থায়ী মারাঠা সাম্রাজ্য-গঠনের অসামর্থ্যের পশ্চাতে নানাবিধ কারণ বিদ্যমান ছিল।

পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ : মারাঠা শক্তির সংহতি বিনষ্ট

মারাঠা শক্তি পুনঃসঞ্জীবিত

(১) সর্বপ্রথমেই ইহা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মারাঠা সাম্রাজ্যের কাঠামো শিবাজীর ব্যক্তিগত প্রতিভাকে আশ্রয় করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছিল। আবার পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের পরও মাধব রাও-এর ব্যক্তিত্ব এবং প্রতিভাবলে পতনোন্মুখ মারাঠা শক্তি পুনরুজ্জীবিত হইয়াছিল। কোন সুচিন্তিত পরিকল্পনা বা নীতির উপর গঠিত ছিল না বলিয়াই পরবর্তী কালে ব্যক্তিগত প্রতিভার অভাবে মারাঠা সাম্রাজ্যের কাঠামো ধসিয়া পড়িয়াছিল। জাতীয় ঐক্য, একই প্রকারের শিক্ষা অথবা কোনপ্রকার উদার এবং সর্বজনীন মঙ্গল-সাধনের নীতির উপর ভিত্তি করিয়া মারাঠা সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠে নাই বলিয়াই মারাঠা শক্তি ইংরাজদের আক্রমণের বিরুদ্ধে টিকিতে পারে নাই। সার্ যদুনাথ বলিয়াছেন : 'মারাঠাদের ঐক্য ছিল যেমন কৃত্রিম তেমনি আকস্মিক এবং সেই কারণেই

(১) মারাঠা শক্তি ব্যক্তিগত ক্ষমতা ও প্রতিভা-আশ্রয়ী : মারাঠা-ঐক্য কৃত্রিম ও আকস্মিক

অনিশ্চিত।' এই মৌলিক ত্রুটির জন্যই মারাঠা শক্তি প্রকৃত শক্তি সঞ্চয় করিতে সমর্থ হয় নাই।

(২) মারাঠা রাজ্যের অর্থ নৈতিক কাঠামো স্থায়ী রাষ্ট্রগঠনের প্রতিকূল

(২) মারাঠাদেশ পর্বতসংকুল। কৃষি, শিল্প বা বাণিজ্য গড়িয়া তুলিবার সুযোগ স্বভাবতই সেখানে ছিল না। এই কারণে মারাঠা রাষ্ট্রকে চৌথ, সরদেশমুখী প্রভৃতি অনিশ্চিত আয়ের উপর নির্ভর করিতে হইত। স্থায়ী রাষ্ট্রগঠনের পক্ষে এইরূপ জবরদস্তিমূলক ও অনিশ্চিত আয় মোটেই সহায়ক ছিল না, একথা বলা বাহুল্য। রাষ্ট্রের অর্থ নৈতিক কাঠামো বলিতে যাহা বুঝা যায়, তাহা মারাঠা রাষ্ট্রে মোটেই ছিল না।

(৩) জায়গীর প্রথার পুনঃপ্রবর্তন

(৩) শিবাজীর পরবর্তী কালে মারাঠা রাজ্যে জায়গীর প্রথা পুনঃ-প্রবর্তিত হওয়ার ফলে রাষ্ট্রের সংহতি বিনষ্ট হইয়াছিল। জায়গীরদারগণের স্বার্থপরতা রাষ্ট্রের স্বার্থ-বিরোধী ছিল। তাহাদের পরস্পর বিবাদ-বিসম্বাদ ক্রমেই মারাঠা ঐক্য বিনষ্ট করিয়া রাষ্ট্রের ভিত্তি দুর্বল করিয়া দিয়াছিল।

(৪) মারাঠাদের আত্ম-কলহ-প্রসূত দুর্বলতা

(৪) প্রথম মাধব রাও-এর মৃত্যুর পর মারাঠাদের মধ্যে যে আত্মকলহ ও ষড়যন্ত্রপ্রিয়তা দেখা দিয়াছিল তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবেই মারাঠাগণ ইংরাজদের মত প্রবল শত্রুর সহিত যুঝিবার প্রয়োজনীয় ঐক্যবোধ, দৃঢ়তা ও মর্যাদাবোধ হারাইয়াছিল। ব্রিটিশ শক্তির সহিত ঐক্যবদ্ধভাবে যুঝিবার প্রয়োজন উপলব্ধি না করিয়া তাহারা আত্মকলহে নিজেদের দুর্বলতা বাড়াইয়া তুলিয়াছিল।

(৫) পরবর্তী কালে সুযোগ্য নেতার অভাব

(৫) মারাঠা রাষ্ট্রে ব্যক্তিগত ক্ষমতা ও প্রতিভা-আশ্রয়ী শিবাজী, বাজীরাও, মাধব রাও, মাহদ্‌জী সিন্ধিয়া, নানা ফড়নবিশ—এই কয়েকজন নেতা ভিন্ন অপর কোন সুযোগ্য নেতার উদ্ভব ঘটে নাই। পরবর্তী কালের নেতৃবর্গের রাজনৈতিক দূরদর্শিতার অভাব হেতু তাঁহাদের প্রধান শত্রু ইংরাজদের সহিত কূটকৌশলে তাঁহারা আঁটিয়া উঠিতে পারেন নাই। সাম্রাজ্য-গঠনের পক্ষে প্রয়োজনীয় একতা, জাতীয়তাবোধ, আদর্শে পৌঁছিবার একনিষ্ঠ চেষ্টা, সমরকুশলতা—প্রভৃতি পরবর্তী মারাঠা নেতৃবর্গের মধ্যে ছিল না। ফলে, উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে

ইংরাজগণ যখন না-হস্তক্ষেপ নীতি (Policy of non-intervention) অনুসরণ করিতেছিল তখনও মারাঠাগণ উহার সম্পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিতে পারে নাই। মারাঠাদের রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা হ্রাসপ্রাপ্ত হওয়ায় মারাঠা রাষ্ট্রসংঘের সর্বত্র অব্যবস্থা এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা ব্যাপকভাবে দেখা দিয়াছিল।

হিন্দুপাদ-পাদশাহী আদর্শ ত্যাগ

(৬) মারাঠাদের 'হিন্দুপাদ পাদশাহী' আদর্শ ত্যাগ এবং মুসলমান সৈন্য নিয়োগ তাহাদের জাতীয়তাবোধ হ্রাস করিয়াছিল। অপরাপর জাতির লোক হইতে ভাড়া-করা সৈন্য নিয়োগের রীতি মারাঠাদের সামরিক দুর্বলতার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ইহাও তাহাদের পতনের অন্যতম কারণ হিসাবে উল্লেখযোগ্য।

(৭) মারাঠা শাসন-নীতি পরসম্পদ হরণ ও অত্যাচারে পর্যবসিত

(৭) মারাঠা শাসনব্যবস্থা ছিল স্বৈরাচারী। জনসাধারণের স্বাভাবিক আনুগত্য উহার পশ্চাতে ছিল না। শিবাজী বা বাজীরাও-এর ন্যায় নেতৃবর্গের ব্যক্তিত্বই ছিল মারাঠা শাসনের মূল শক্তি। সাম্রাজ্য-গঠনের পক্ষে প্রয়োজনীয় উন্মাদনা সৃষ্টি করিবার মতো আদর্শ এবং জনসাধারণের অকপট আনুগত্য ক্রমেই যখন হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছিল, তখন মারাঠা রাষ্ট্রের তথা মারাঠা শাসনের মূলনীতি বলপূর্বক অপরের সম্পত্তি দখল এবং অত্যাচারের দ্বারা অর্থ আদায়ে পর্যবসিত হইয়াছিল।

(৮) 'গরিলা-যুদ্ধ'-পদ্ধতি পরিত্যাগ

(৮) ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক হইতে মারাঠাগণ তাহাদের চিরাচরিত 'গরিলা-যুদ্ধ'-পদ্ধতি ত্যাগ করিয়া ভীষণ ভুল করিয়াছিল। যে গরিলা-যুদ্ধ-পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া মারাঠাগণ দুর্ধর্ষ মোগল বাহিনীর মনে ভীতির সঞ্চার করিয়াছিল সেই যুদ্ধকৌশল ত্যাগ করিয়া তাহারা পরাজয়ের পথ প্রশস্ত করিয়াছিল। পাশ্চাত্ত্য সামরিক পদ্ধতি সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিবার দূরদর্শিতা নানা ফড়নবিশ বা মাহদ্‌জী সিন্ধিয়াও প্রদর্শন করেন নাই।

(৯) আধুনিক যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত ব্রিটিশ বাহিনীর সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব

(৯) সর্বশেষে, একথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আধুনিক যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত ও ইওরোপীয় যুদ্ধক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন-ব্রিটিশ সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করা মারাঠাদের পক্ষে স্বভাবতই সম্ভব ছিল না।

উপরি-উক্ত কারণে মারাঠাগণ মোগল সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের উপর মারাঠা সাম্রাজ্য-গঠনের সুযোগ গ্রহণে সক্ষম হয় নাই ; সেই সুযোগ গ্রহণ করিয়াছিল ইংরাজ বণিক সম্প্রদায়।

উপসংহার

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইঙ্গ-মারাঠা সম্পর্ক (Anglo-Maratha Relations during the last half of the 18th and early years of the 19th Centuries) : পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে (১৭৬১) পরাজয়ের ফলে মারাঠা শক্তি এমনভাবে পর্যুদস্ত হইয়াছিল যে, ভবিষ্যতে উহা আর পুনঃসঞ্জীবিত হইতে পারিবে সেই আশা কেহ করে নাই। কিন্তু মারাঠাগণ অতি আশ্চর্যজনক দ্রুতগতিতে তাহাদের শক্তি পুনর্গঠিত করিয়া উত্তর এবং দক্ষিণ-ভারতে এক অদম্য শক্তি লইয়া আত্মপ্রকাশ করিল।

পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের পর মারাঠা শক্তির দ্রুত পুনঃসঞ্জীবন

তাহারা সম্রাট দ্বিতীয় শাহ্ আলমকে কারা ও এলাহাবাদ হইতে দিল্লীতে লইয়া গিয়া সিংহাসনে স্থাপন করিল। সম্রাট মারাঠাদের হাতের পুতুলে পরিণত হইলেন।

(১) ওয়ারেন হেস্টিংস্ ও মারাঠাগণ (Warren Hastings and the Marathas) : ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংস্ গবর্ণর হইয়া আসিয়া মারাঠাদের শক্তিবৃদ্ধিতে ব্রিটিশ নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হইতে চলিয়াছে উপলব্ধি করিয়া অযোধ্যার নবাবের সহিত মিত্রতাবদ্ধ হইলেন। মারাঠাদের করতলগত সম্রাটের প্রাপ্য বাৎসরিক ২৬ লক্ষ টাকা মারাঠাদেরই হস্তে পড়িবে আশঙ্কা করিয়া হেস্টিংস্ বাংলার দেওয়ানীর জন্য তাঁহাকে বাৎসরিক কর দেওয়া বন্ধ করিলেন। এদিকে পেশওয়া মাধব রাও-এর মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা নারায়ণ রাও পেশওয়া-পদে অধিষ্ঠিত হইলে রাঘোবা পেশওয়া-পদ দখলের জন্য নানাপ্রকার ষড়যন্ত্র শুরু করিলেন। দুর্বল-চিত্ত, অনভিজ্ঞ নারায়ণ রাও রাঘোবা রঘুনাথ রাও-এর চক্রান্তের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হইলেন না। তাঁহার সেনাবাহিনীর মধ্যে অসন্তোষের সুযোগ লইয়া রাঘোবা নারায়ণ রাওকে হত্যা করাইলেন এবং স্বয়ং পেশওয়া-

মারাঠাদের সম্ভাব্য আক্রমণের বিরুদ্ধে হেস্টিংসের ব্যবস্থা অবলম্বন

পদে অধিষ্ঠিত হইলেন, কিন্তু তাঁহার পেশওয়াপদলাভ স্থায়ী হইল না। নানা ফড়নবিশ নামে জনৈক ব্রাহ্মণ যুবক নারায়ণ রাও-এর শিশুপুত্র মাধব রাও নারায়ণকে পেশওয়া বলিয়া ঘোষণা করিলেন। অপরাপর মারাঠা নেতৃবর্গ এই শিশুকে পেশওয়া বলিয়া গ্রহণ করিলে রাঘোবা পুণা ত্যাগ করিয়া ইংরাজদের সাহায্য-প্রার্থী হইলেন। সুরাটের সন্ধি দ্বারা (১৭৭৫) বোম্বাই কাউন্সিল রাঘোবাকে সাহায্যদানে স্বীকৃত হইলেন। ব্রিটিশ সৈন্যসাহায্যের বিনিময়ে রাঘোবা ব্যাসিন, সল্‌সেট্ এবং বরোচ ও সুরাটের রাজস্বের একাংশ কোম্পানিকে দান করিতে স্বীকৃত হইলেন। আড়াই হাজার ব্রিটিশ সৈন্য রাঘোবার সাহায্যার্থে দেওয়া হইবে স্থির হইল। এই চুক্তির শর্তানুসারে রাঘোবা কোন তৃতীয় শক্তির সহিত কোনপ্রকার আদান-প্রদান বা আলাপ-আলোচনা করিবেন না বলিয়া স্বীকৃত হইলেন। চুক্তি স্বাক্ষরের পরই ব্রিটিশ সৈন্য মারাঠাগণকে আরাস-এর যুদ্ধে পরাজিত করিল এবং সল্‌সেট্ দখল করিয়া লইল। এদিকে কলিকাতা কাউন্সিল বোম্বাই কাউন্সিল স্বাক্ষরিত সুরাটের সন্ধি অনুমোদন করিলেন না। ব্যক্তিগতভাবে গবর্ণর-জেনারেল হেস্টিংস্ অবশ্য বোম্বাই কাউন্সিলের প্রতিশ্রুতি রক্ষার-ই পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু কলিকাতা কাউন্সিলের মত তাঁহার পক্ষে উপেক্ষা করা সম্ভব হইল না। সুতরাং কলিকাতা কাউন্সিলের নির্দেশ অনুযায়ী বোম্বাই কাউন্সিল রঘুনাথ রাও-এর পক্ষ ত্যাগ করিয়া পুণা সরকার অর্থাৎ পেশওয়ার সহিত পুরন্দরের চুক্তি স্বাক্ষর করিলেন। এই চুক্তির শর্তানুসারে ইংরাজগণ মাধব রাও নারায়ণকে পেশওয়া বলিয়া স্বীকার করিয়া লইল। অবশ্য সল্‌সেট্ তাহাদের অধিকারেই রহিয়া গেল। তদুপরি বরোচ-এর রাজস্ব আদায়ের অধিকার ইংরাজদের দেওয়া হইল। ইতিমধ্যে বিলাতের ডাইরেক্টর সভা কর্তৃক সুরাটের সন্ধি অনুমোদিত হইলে বোম্বাই কাউন্সিল পুরন্দরের সন্ধি উপেক্ষা করিয়া পুনরায় রঘুনাথের পক্ষ গ্রহণ করিলেন এবং মারাঠাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। কিন্তু তেলেগাঁও-এর যুদ্ধে ইংরাজগণ শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইয়া ওয়াড়গাঁও-এর সন্ধি স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হইল। এই সন্ধির

পেশওয়া-পদের জন্য উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত দ্বন্দ্ব

সুরাটের সন্ধি

পুরন্দরের সন্ধি

ওয়াড়গাঁও-এর সন্ধি

শর্তানুসারে ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে ইংরাজগণ দাক্ষিণাত্যের যে-সকল স্থান অধিকার করিয়াছিল সেগুলি ফিরাইয়া দিতে বাধ্য হইল। বরোচের রাজস্বের একাংশ সিন্ধিয়াকে দেওয়া হইবে—ইহাও স্থির হইল। কিন্তু কলিকাতা কাউন্সিল এই সন্ধির শর্তাদি মানিতে রাজী হইলেন না।

কলিকাতা কাউন্সিল ওয়াড়গাঁও-এর সন্ধি অনুমোদন করিলেন না। ফলে পুনরায় যুদ্ধ শুরু হইল। মারাঠাগণ যুদ্ধে পরাজিত হইয়া সল্‌বই-এর সন্ধি (১৭৮২) স্বাক্ষর করিতে স্বীকৃত হইল। এই সন্ধির দ্বারা ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের পূর্ববর্তী অবস্থার পুনঃস্থাপন হইয়াছিল মাত্র। কিন্তু এই সন্ধির প্রধান গুরুত্ব ছিল এই যে, ইহার ফলে ইংরাজ ও মারাঠাদের মধ্যে দীর্ঘ কুড়ি বৎসরকাল শান্তি বজায় থাকিবার ফলে ইংরাজগণ টিপুকে পরাজিত করিবার এবং দাক্ষিণাত্য হইতে ফরাসী প্রভাব দূর করিবার সুযোগ পাইয়াছিল। এই সময়ে মারাঠাদের সহিত শান্তির সুযোগ লইয়া ইংরাজগণ নিজাম ও অযোধ্যার নবাবকে ব্রিটিশের অধীনতামূলক মিত্রতা গ্রহণে বাধ্য করিতে সক্ষম হইয়াছিল। ভারতে ব্রিটিশ প্রাধান্য-স্থাপনের ইতিহাসে সল্‌বই-সন্ধির গুরুত্ব অত্যধিক ইহা অনস্বীকার্য।

সল্‌বই-এর সন্ধি

(২) **লর্ড কর্ণওয়ালিস ও মারাঠাগণ (Lord Cornwallis & the Marathas):** লর্ড কর্ণওয়ালিস মারাঠাগণকে স্বপক্ষে আনিয়া টিপু সুলতানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি অবশ্য নিজামের বিরুদ্ধে মারাঠাদের যুদ্ধে কোনপ্রকার হস্তক্ষেপ করেন নাই। কিন্তু অযোধ্যা রাজ্যে সিন্ধিয়াকে কোনরূপ গোলযোগ সৃষ্টি করিবার সুযোগও তিনি দেন নাই।

না-হস্তক্ষেপ নীতি

(৩) **সার্ জন শোর ও মারাঠাগণ (Sir John Shore & the Marathas):** সার্ জন শোর না-হস্তক্ষেপ নীতি অনুসরণ করিয়া মারাঠা শক্তিকে অধিকতর দুর্ধর্ষ হইয়া উঠিতে সাহায্য করিয়াছিলেন। ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে খর্দা-এর যুদ্ধে তিনি নিজামকে কোনপ্রকার সাহায্য প্রেরণ না করিয়া মারাঠাদের জয়ের পথ সহজ করিয়া দিয়াছিলেন। এই যুদ্ধে জয়লাভের ফলে মারাঠাদের শক্তি ও মর্যাদা উভয়ই বৃদ্ধি পাইয়াছিল। মারাঠাদের মধ্যে স্বার্থজনিত আত্মকলহ শুরু না হইলে সেই সময়ে ব্রিটিশ-অনুসৃত না-হস্তক্ষেপ নীতির

না-হস্তক্ষেপ নীতি—
খর্দা-এর যুদ্ধ

সম্পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ তাহাদের পক্ষে সম্ভব হইত। কিন্তু তাহাদের আত্মঘাতী অন্তর্দ্বন্দ্ব সেই আশা বিনষ্ট করিয়াছিল। অবশ্য একথা স্বীকার্য যে, জন শোর-এর না-হস্তক্ষেপ নীতি মারাঠাগণকে নিজেদের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদে প্রবৃত্ত হইবার সুযোগ দান করিয়াছিল। ব্রিটিশ হস্তক্ষেপের ভীতি থাকিলে সেই সময়ে মারাঠাগণ একতাবদ্ধ থাকিত। এদিক দিয়া জন শোর-এর নীতি সমর্থনযোগ্য।

(৪) লর্ড ওয়েলেস্‌লী ও মারাঠাগণ (Lord Wellesley & the Marathas) : মারাঠাদের আত্মকলহের সুযোগে লর্ড ওয়েলেস্‌লী তাহাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবার সম্পূর্ণ সুযোগ লাভ করিলেন। তিনি পেশওয়া দ্বিতীয় বাজীরাওকে ব্রিটিশের অধীনতামূলক মিত্রতা (Subsidiary Alliance) গ্রহণে স্বীকৃত করাইয়াছিলেন। এই সূত্রে সিন্ধিয়া ও ভোঁসলে এবং পরে হোল্‌কার ইংরাজদের সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলে তাঁহারা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন এবং ব্রিটিশের অধীনতামূলক মিত্রতাবদ্ধ হইতে বাধ্য হন। এইভাবে মারাঠা শক্তি পতনের দিকে দ্রুত ধাবিত হইতেছিল।

অধীনতামূলক মিত্রতা-নীতি

(৫) সার্ জর্জ বার্লো, লর্ড মিণ্টো, লর্ড ময়রা (হেস্টিংস্) ও মারাঠাগণ (Sir George Barlow, Lord Minto, Lord Moira [Hastings] & the Marathas) : সার্ জর্জ বার্লোর শাসনকালে ইংরাজগণ মারাঠাদের সহিত না-হস্তক্ষেপ নীতি অনুসরণ করিয়াছিল। সিন্ধিয়া ও হোল্‌কারের সহিত জর্জ বার্লো মিত্রতা রক্ষা করিয়া চলিয়াছিলেন। এই শান্তিরক্ষা করিয়া চলিবার নীতি পরবর্তী শাসক লর্ড মিণ্টোর আমলেও অনুসৃত হইয়াছিল। অবশ্য বেরারের রাজা পাঠান-নেতা আমীর খাঁ কর্তৃক আক্রান্ত হইলে লর্ড মিণ্টো সাহায্য দান করিয়াছিলেন। মারাঠাদের সন্তুষ্টিবিধান করিয়া চলা-ই ছিল তাঁহার নীতি। এজন্য তিনি আমীর খাঁকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করিতে বা পিণ্ডারি-দমন করিতে অগ্রসর হন নাই, কারণ এই সূত্রে মারাঠাদের সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত হওয়ার আশঙ্কা ছিল।

বার্লো এবং মিণ্টোর না-হস্তক্ষেপ নীতি

লর্ড হেস্টিংসের আমলে মারাঠা শক্তি চিরতরে খর্ব হইয়াছিল। তিনি পিণ্ডারি-দমনের জন্য সিন্ধিয়াকে ইংরাজপক্ষে যোগদান করিতে রাজী

করাইয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন পেশওয়া দ্বিতীয় বাজীরাও, হোল্‌কার ও আপ্পা সাহেবকে পরাজিত করিয়া তিনি মারাঠা শক্তির সম্পূর্ণ পতন ঘটাইয়াছিলেন। সেই সময়েই পেশওয়া-পদ উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং শিবাজীর জনৈক বংশধরকে পেশওয়া রাজ্যের এক ক্ষুদ্র অংশে—সাতারার সিংহাসনে স্থাপন করা হইয়াছিল। হোল্‌কার ও ভোঁসলেও ইংরাজদের অধীনতা স্বীকার করিয়া চলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। লর্ড হেস্টিংসের আমলেই মারাঠাগণ ভারতীয় রাজনীতিক্ষেত্র হইতে চির-বিদায় গ্রহণ করিয়াছিল।

মারাঠা শক্তির পতন

অষ্টম অধ্যায়

ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-বিস্তার : শিখশক্তির উত্থান ও পতন

(Expansion of the British Empire in India : Rise & Fall of the Sikhs)

লর্ড আমহার্স্ট ১৮২৩-২৮ (Lord Amherst): লর্ড হেস্টিংসের শাসনকালে ভারতের অধিকাংশ স্থানেই ব্রিটিশ প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু পূর্ব এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত হইতে তখনও ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ করিবার মত শক্তি বিদ্যমান ছিল। উত্তর-পশ্চিমে শিখ, সিন্ধী, বেলুচ, পাঠান ও আফগান জাতি এবং পূর্বসীমান্তে আসাম ও ব্রহ্মদেশবাসীদের তখনও যথেষ্ট শক্তি ও প্রতিপত্তি ছিল। ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা-বিধান করিবার পক্ষে এই সকল জাতির সহিত সংঘর্ষ অনিবার্য হইয়া উঠিল।

পূর্ব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত সমস্যা

লর্ড হেস্টিংস্-এর ভারত পরিত্যাগ এবং লর্ড আম্‌হার্স্ট-এর ভারতে আসিয়া পৌঁছিবার অন্তর্বর্তী কালে জন এ্যাডাম্ নামে কলিকাতা কাউন্সিলের জনৈক সদস্য অস্থায়ী গবর্ণর-জেনারেলের কাজ চালাইলেন। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে লর্ড আম্‌হার্স্ট শাসনভার গ্রহণ করিবার অল্পকালের মধ্যেই ব্রহ্মদেশের বিরুদ্ধে তাঁহাকে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে হইল।

লর্ড আম্‌হার্স্টের নিয়োগ

প্রথম ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধ, ১৮২৪-২৬ (The First Anglo-Burmese War) : সপ্তদশ শতাব্দী হইতে ব্রহ্মদেশের সহিত ইংরাজদের বাণিজ্য-সম্পর্ক ছিল। সেই সূত্রে তখনও ব্রহ্মদেশের সহিত ইংরাজদের রাজনৈতিক সংঘর্ষের কোন প্রশ্ন-ই ছিল না, কারণ সেই সময়ে ইংরাজগণ ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-গঠনেই সর্বশক্তি নিয়োগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। কিন্তু ব্রহ্মদেশের রাজা বোদোপয়া (Bodowpaya) (১৭৭৯-১৮১৯) এবং তাঁহার পুত্র পগিদোয়া (Hpagydoa)-এর আমলে ব্রহ্মরাজ্যের সীমা বিস্তারলাভ করিলে ব্রিটিশ রাজ্যসীমা ও ব্রহ্মদেশের সীমা পরস্পর সংলগ্ন হইয়া পড়ায় দুই পক্ষে সংঘর্ষ অনিবার্য হইয়া উঠে। বোদোপয়া ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে আরাকান অধিকার করেন এবং কয়েক বৎসরের মধ্যেই (১৮১৩) তিনি মণিপুর দখল করেন। ব্রহ্মদেশের সহিত সংঘর্ষ এড়াইবার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ পক্ষ ১৭৯৫ হইতে ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ছয়বার তথায় দূত প্রেরণ করেন। ক্যাপ্টেন সাইমস্ (Capt. Symes), ক্যাপ্টেন কক্স্ (Capt.Cox) এবং ক্যাপ্টেন ক্যানিং (Capt. Canning)—দূত হিসাবে প্রেরিত হইয়াছিলেন।* লর্ড হেস্টিংস্ যখন পিণ্ডারি-দমনের কাজ শেষ করিয়াছেন সেই সময়ে বোদোপয়া, মধ্যযুগের আরাকান-রাজ্য চট্টগ্রাম, ঢাকা, কাশিমবাজার প্রভৃতি স্থান হইতে কর আদায় করিতেন এই অজুহাতে এই সকল স্থান দাবি করিয়া এক পত্র প্রেরণ করিলেন। তাঁহার এই দাবির পশ্চাতে মূল যুক্তি ছিল এই যে, তিনি তখন আরাকান-রাজ্য জয় করিয়া আরাকান-রাজ্যের যাবতীয় অধিকারের উত্তরাধিকারী হইয়াছেন। এই পত্রের কোন ফল হইল না, বলা বাহুল্য। এদিকে বোদোপয়ার পুত্র পগিদোয়া

প্রথম ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধের কারণ

---

* Capt. Symes, 1795, 1802, Capt. Cox, 1797, Capt. Canning, 1803, 1809, 1811, vide *An Advanced History of India*, p. 731.

রাজা হইলেন। তাঁহার সেনাবাহিনী ১৮২১-২২ খ্রীষ্টাব্দে আসাম অধিকার করিতে সমর্থ হইল। লর্ড আম্‌হার্স্ট ভারতে পৌঁছিবার অব্যবহিত পরে পগিদোয়ার সেনাপতি চট্টগ্রামের সন্নিকটে ব্রিটিশ-অধিকৃত শাহ্‌পুরী (Shahpuri) দ্বীপটি দখল করিলেন এবং বাংলাদেশ আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। লর্ড আম্‌হার্স্ট ব্রহ্ম সরকারের সহিত বিনাযুদ্ধে এবিষয়ের মীমাংসা করিবার যখন চেষ্টা করিতেছিলেন, সেই সময়ে দুইজন ব্রিটিশ কর্মচারীকে ব্রহ্ম সরকারের কর্মচারিগণ বলপূর্বক ধরিয়া লইয়া গেলে লর্ড আম্‌হার্স্ট ব্রহ্মদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে বাধ্য হইলেন (ফেব্রুয়ারি, ১৮২৪)। সমুদ্রপথে রেঙ্গুন আক্রমণ করিবার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ সরকার অর্চিবল্ড ক্যাম্প্‌বেল (Sir Archibald Campbell) ও ক্যাপ্টেন ম্যারিয়ট (Capt. Marryat)-এর নেতৃত্বে এক নৌবাহিনী প্রেরণ করিলেন। এদিকে আসামের সীমান্ত হইতে ব্রহ্মদেশীয় সৈনিকগণ ব্রিটিশ-অধিকারভুক্ত গ্রাম আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। এই সূত্রে ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্বেই সিলেট বা শ্রীহট্টের নিকটে ইংরাজ ও ব্রহ্মদেশীয় সৈনিকদের মধ্যে এক খণ্ডযুদ্ধ হইয়াছিল। সুতরাং প্রথম ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে আসামের দিকেও যুদ্ধ শুরু হইল। ইহা ভিন্ন আরাকান এবং ব্রহ্মদেশেও যুদ্ধ চলিল। আসাম অঞ্চলে ব্রিটিশ সৈন্য সাফল্যলাভ করিলেও বর্মী সেনাপতি বান্দুলা (Bandula) চট্টগ্রামের সন্নিকটে এক ব্রিটিশ বাহিনীকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করিলেন। সার্ ক্যাম্প্‌বেল এদিকে রেঙ্গুন দখল করিতে সমর্থ হইলেন। এমতাবস্থায় সেনাপতি বান্দুলা স্বদেশরক্ষার্থে বাংলাদেশে যুদ্ধ বন্ধ করিয়া সসৈন্যে রেঙ্গুন পুনর্দখলের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু রেঙ্গুনের সন্নিকটে ব্রিটিশ বাহিনীর হস্তে তাঁহার শোচনীয় পরাজয় ঘটিল। ইহার পর তিনি ডোনাবিউ (Donabew) নামক স্থান রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করিতে গিয়া প্রাণ হারাইলেন। বান্দুলার ন্যায় সুদক্ষ সেনাপতির আকস্মিক মৃত্যু বর্মী সেনাবাহিনীকে হীনবল করিয়া ফেলিল। এদিকে তখন সার্ ক্যাম্প্‌বেল প্রোম দখল করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এইভাবে পরাজিত হইয়া ব্রহ্মরাজ ব্রিটিশের সহিত সন্ধিবদ্ধ হইতে বাধ্য হইলেন। যান্দাবু (Yandaboo)-এর সন্ধি (১৮২৬) দ্বারা ব্রহ্মদেশের রাজা

আসাম, আরাকান ও ব্রহ্মদেশে যুদ্ধের বিস্তৃতি

যান্দাবু-এর সন্ধি (১৮২৬)

টেনাসেরিম ও আরাকান প্রদেশ দুইটি ব্রিটিশদের ছাড়িয়া দিতে এবং এক কোটি মুদ্রা ক্ষতিপূরণ হিসাবে দিতে বাধ্য হইলেন। ইহা ভিন্ন তিনি আসাম, জন্তিয়া, কাছাড় প্রভৃতি অঞ্চলে ভবিষ্যতে হস্তক্ষেপ না করিতে এবং মণিপুর রাজ্যের স্বাধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। দুইপক্ষের মধ্যে একটি বাণিজ্য চুক্তিও সম্পাদিত হইল। কিন্তু ব্রহ্মরাজ তাঁহার রাজ্যে ব্রিটিশ রেসিডেন্ট্ নিয়োগে সম্মত হইলেন না। অবশ্য কয়েক বৎসর পর (১৮৩০) এই শর্তও তাঁহাকে মানিয়া লইতে হইয়াছিল। প্রথম ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধের ফলে আসাম, জন্তিয়া, কাছাড় ও মণিপুর ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত না হইলেও ব্রিটিশ প্রাধান্যাধীন হইয়া পড়িয়াছিল।

ভরতপুর অধিকার (Occupation of Bharatpur): ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে ভরতপুর আক্রমণ করিতে গিয়া ব্রিটিশ বাহিনীর যে শোচনীয় পরাজয় ঘটিয়াছিল, সেকথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে ভরতপুরের রাজার নাবালক পুত্রকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া দুর্জন সাল নামে তাঁহারই জনৈক ভ্রাতুষ্পুত্র সিংহাসন অধিকার করিয়া লইলেন। দিল্লীর তদানীন্তন রেসিডেন্ট্ ডেভিড্ অক্টারলোনি নাবালক রাজার পক্ষ অবলম্বন করিলে লর্ড আম্‌হার্স্ট তাঁহার এই হস্তক্ষেপ নীতির তীব্র নিন্দা করিলেন। ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া অক্টারলোনি পদত্যাগ করিলে সেই স্থলে সার্ চার্লস্ মেটকাফ্‌কে নিযুক্ত করা হইল। সার্ চার্লস্ মেটকাফ্ অবশ্য ডেভিড্ অক্টারলোনি-অনুসৃত নীতি গ্রহণের যৌক্তিকতা প্রদর্শন করিয়া লর্ড আম্‌হার্স্টের মত পরিবর্তন করাইতে সমর্থ হইলেন। লর্ড কোম্‌বারমিয়ার (Lord Combermere)-এর নেতৃত্বে এক সেনাবাহিনী দুর্জন সালের বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হইল (১৮২৬)। লর্ড কোম্‌বারমিয়ার সহজেই ভরতপুর দখল করিয়া নাবালক রাজাকে সিংহাসনে স্থাপন করিতে সমর্থ হইলেন। ভরতপুর রাজ্য ব্রিটিশ সরকারের সম্পূর্ণ আশ্রিত রাজ্যে পরিণত হইল।

ভরতপুর আক্রমণ ও অধিকার

১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে বারাকপুরে সিপাহী বিদ্রোহ (Barrackpore Sepoy Mutiny, 1824): বারাকপুরের সিপাহীদিগকে ব্রহ্মদেশে যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইবার আদেশ দেওয়া হইলে

তাহাদের মধ্যে এক বিক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছিল। তদুপরি তাহাদের বেতনও ছিল খুবই কম। প্রধানত এই দুই কারণের জন্যই সিপাহীদের মধ্যে অসন্তোষ বৃদ্ধি পাইলে তাহারা কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতিকার দাবি করিয়া আবেদন জানাইল। কিন্তু কর্তৃপক্ষ এই আবেদন অগ্রাহ্য করিলে সিপাহীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। ব্রিটিশ গোলন্দাজ বাহিনীর অমানুষিক বর্বরতার সাহায্যে বহুসংখ্যক সিপাহীর প্রাণনাশ করিয়া এই বিদ্রোহ দমন করা সম্ভব হইয়াছিল।

কঠোরহস্তে বারাকপুরের সিপাহী বিদ্রোহ দমন

লর্ড আম্‌হার্স্ট গবর্ণর-জেনারেল-পদের দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনীয় বিচক্ষণতা-সম্পন্ন ছিলেন না। তাঁহার শাসনকালের বিভিন্ন কার্যকলাপ ডাইরেক্টর সভার মনঃপূত হইল না। যাহা হউক, ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করিয়া স্বদেশে যাত্রা করিলে তাঁহার স্থলে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক গবর্ণর-জেনারেল নিযুক্ত হইয়া আসিলেন।

লর্ড আম্‌হার্স্ট-এর পদত্যাগ

লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক, ১৮২৮-১৮৩৫ (Lord William Bentinck): লর্ড উইলিয়াম ক্যাভেণ্ডিশ বেন্টিঙ্ক প্রথম জীবনে মাদ্রাজের গবর্ণর নিযুক্ত হইয়া ভারতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার শাসনকালে (১৮০৩-৭) ভেলোরে সিপাহী-বিদ্রোহ (১৬০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) দেখা দিলে তাঁহাকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের আদেশ দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের আদেশ দিয়া কর্তৃপক্ষ তাঁহার প্রতি অবিচার করিয়াছিলেন এই ছিল তাঁহার ব্যক্তিগত ধারণা। এবিষয়ে তিনি কর্তৃপক্ষের সহিত বোঝাপড়া করিতেও ত্রুটি করেন নাই। বস্তুত, এই কারণেই ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে বেন্টিঙ্ককে গবর্ণর-জেনারেল-পদে নিযুক্ত করিয়া পাঠান হইয়াছিল।

মাদ্রাজের গবর্ণর হিসাবে বেন্টিঙ্ক (১৮০৩-১৮০৭)

গবর্ণর-জেনারেল হিসাবে উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের শাসনকাল যুদ্ধ-বিগ্রহ বা কূটকৌশলের সাফল্য প্রভৃতি আক্রমণাত্মক রাজনীতির জন্য বিখ্যাত নহে। শান্তি ও সংস্কারের জন্যই তাঁহার শাসনকাল ভারত-ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জল অধ্যায় বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে।

বেন্টিঙ্কের শাসনকাল শান্তি ও সংস্কারের যুগ

বেন্টিঙ্ক যৌবনে নেপোলিয়ন-বিজেতা ডিউক-অব-ওয়েলিংটনের অধীনে সৈনিক হিসাবে কাজ করিয়াছিলেন। কিন্তু সামরিক কূটচাল বা অপর কোন প্রকার উল্লেখযোগ্য সামরিক প্রতিভার পরিচয় তিনি দিতে পারেন নাই। লর্ড ম্যাকলে বেন্টিঙ্কের চরিত্রে দয়াপ্রবণতা, বিচক্ষণতা, আনুগত্য ও জনকল্যাণের ইচ্ছা প্রভৃতি গুণাবলীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন। বেন্টিঙ্কের সুহৃদ হিসাবে ম্যাকলে তাঁহার চরিত্র-বর্ণনায় হয়ত কতক পরিমাণে অতিশয়োক্তি করিয়া থাকিবেন, কিন্তু মূলতঃ তাঁহার বর্ণনার সত্যতা অনস্বীকার্য।

তাঁহার চরিত্র—ম্যাকলের বর্ণনা

তাঁহার সংস্কার-কার্যাদি (His Reforms): উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের সংস্কার-কার্যাদি প্রধানত অর্থনৈতিক, শাসন-সংক্রান্ত এবং সামাজিক এই তিনভাগে ভাগ করিয়া আলোচনা করা যুক্তিযুক্ত হইবে।

তিন প্রকার সংস্কার : অর্থনৈতিক, শাসন-সংক্রান্ত ও সামাজিক

ব্রহ্মযুদ্ধে ব্যয়বাহুল্যের ফলে সেই সময়ে কোম্পানির আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং বেন্টিঙ্ক সর্বপ্রথমেই কোম্পানিকে সেই আর্থিক দুর্দশা হইতে রক্ষা করিবার জন্য সচেষ্ট হইলেন। সামরিক ও বেসামরিক ব্যয়সংকোচ করিবার উদ্দেশ্যে তিনি কয়েকটি ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন। ডাইরেক্টর সভা হইতেও তাঁহার উপর এইরূপ নির্দেশই ছিল। তিনি সেনাবাহিনীর 'অর্ধেক ভাতা' (half batta) উঠাইয়া দিলেন। সামরিক কর্মচারিগণ শান্তির কালেও 'অর্ধেক ভাতা' পাইতেন। বেন্টিঙ্ক উহা উঠাইয়া দিলে সামরিক কর্মচারীদের মধ্যে এক দারুণ বিক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু বেন্টিঙ্ক দমিবার পাত্র ছিলেন না। ইহার পরই তিনি বেসামরিক ব্যয় হ্রাস করিবার উদ্দেশ্যে উচ্চশ্রেণীর বেসামরিক কর্মচারিবর্গের বেতন হ্রাস করিয়াছিলেন। কোম্পানির কর্মচারিবর্গের দক্ষতা ও কার্যকলাপ সম্পর্কে ঊর্ধ্বতন কর্মচারীদের নিকট হইতে গোপনে রিপোর্ট (confidential report) গ্রহণের নিয়মও তিনি প্রবর্তন করিয়াছিলেন। এই সকল কারণে স্বভাবতই তিনি সামরিক ও বেসামরিক কর্মচারীদের নিকট অপ্রিয় হইয়া উঠিলেন।

অর্থনৈতিক সংস্কার

সামরিক ও বেসামরিক ব্যয়সংকোচ

কর্মচারিবর্গের কাজ সম্পর্কে গোপনে রিপোর্ট গ্রহণের ব্যবস্থা

যে সকল জমি অবৈধভাবে নিষ্কর বলিয়া দেখান হইয়াছিল সেগুলির উপযুক্ত রাজস্ব তিনি ধার্য করিলেন। আগ্রা অঞ্চলে জমিবণ্টন-ব্যবস্থার পরিবর্তন করিয়া তিনি নূতন হারে রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা করিলেন। ইহা ভিন্ন অপরাপর নানাদিক দিয়া বেন্টিঙ্ক ব্যয়সংকোচ ও রাজস্ববৃদ্ধির চেষ্টা করিয়াছিলেন। এগুলির মধ্যে আফিং-এর একচেটিয়া কারবারের উন্নততর ব্যবস্থা-অবলম্বন বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সকল ব্যবস্থার ফলে তাঁহার গবর্ণর-জেনারেল-পদ গ্রহণকালে বাৎসরিক যে দশ লক্ষ টাকা ঘাট্‌তি ছিল উহা পূরণ হইয়া বাৎসরিক আয় পনর লক্ষ টাকা উদ্‌বৃত্তে পরিণত হইল।

রাজস্ব-বৃদ্ধির ব্যবস্থা

আফিং-এর একচেটিয়া ব্যবসায়ের উন্নতিসাধন

শাসন-সংক্রান্ত সংস্কারে হস্তক্ষেপ করিয়া প্রথমেই বেন্টিঙ্ক বিচার বিভাগের উন্নতিসাধন করিলেন। কর্ণওয়ালিস-প্রবর্তিত ভ্রাম্যমাণ বিচারালয় (Circuit court) এবং আপীল আদালতগুলি তুলিয়া দিয়া তিনি বিচারকার্যে অযথা বিলম্বের পথ বন্ধ করিলেন। এলাহাবাদে তিনি একটি রেভিনিউ বোর্ড স্থাপন করিলেন। জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটদের কার্য পরিদর্শনের জন্য তিনি কমিশনার নামে কয়েকটি নূতন কর্মচারিপদ সৃষ্টি করিলেন। তিনি জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টরের দায়িত্ব একই হস্তে অর্পণ করিলেন। কর্ণওয়ালিসের বিচার-ব্যবস্থায় কোন দায়িত্বমূলক কর্মচারিপদে ভারতীয়দের নিযুক্ত করা হইত না। বেন্টিঙ্ক এই নিয়মের পরিবর্তন করিয়া ভারতীয় বিচারপতিদের বিচার-দক্ষতা, পদমর্যাদা ও বেতন বাড়াইয়া দিলেন। বিচারালয়গুলিতে পূর্বে ফার্‌সী ভাষা প্রচলিত ছিল। বেন্টিঙ্ক স্থানীয় ভাষায় বিচারালয়ে কাজ চালাইবার নিয়ম প্রবর্তন করিয়া বিচার-ব্যবস্থাকে জাতীয় চরিত্র দান করিয়াছিলেন। বেন্টিকের শাসন-সংস্কারের ফলে কোম্পানির শাসন-ব্যবস্থা সুষ্ঠু ও সুদক্ষ হইয়া উঠিয়াছিল।*

শাসন-সংক্রান্ত সংস্কার: বিচার-বিভাগের সংস্কার

এলাহাবাদে রেভিনিউ বোর্ড স্থাপন

ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টরের দায়িত্ব একই হস্তে অর্পণ; বিচার-বিভাগে ভারতীয়দের অধিকতর দায়িত্ব অর্পণ

* "Lord William Bentinck.........deserves credit for the clear vision which enabled him to construct for the first time a really workable

বেন্টিঙ্কের সংস্কার-কার্যাদির মধ্যে সামাজিক সংস্কারগুলিই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সামাজিক সংস্কারের জন্যই বেন্টিঙ্ক ভারত-ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া আছেন। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সতীদাহপ্রথা * নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করেন। স্বামীর মৃত্যু হইলে হিন্দু বিধবাগণ স্বেচ্ছায় স্বামীর চিতায় ঝাঁপ দিয়া সহমৃতা হইতেন। এইভাবে তাঁহারা 'সতী' হইতেন। কোন কোন মুসলমান রমণীও সতী হইয়াছেন এইরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়। যাহা হউক, ক্রমে সতীদাহ-প্রথা বিধবার অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহাকে স্বামীর চিতায় বলপূর্বক নিক্ষেপ করিবার রীতিতে পর্যবসিত হইয়াছিল। প্রগতিশীল ব্যক্তি-মাত্রেই এই বীভৎস ও অমানুষিক অনুষ্ঠানের বিরোধিতা করিতে লাগিলেন। লর্ড কর্ণওয়ালিসের শাসনকাল হইতেই কোম্পানি সতীদাহপ্রথা উঠাইয়া দিবার জন্য সচেষ্ট ছিলেন। এজন্য ইংরেজ কর্মচারিগণকে এবিষয়ে মনোযোগী হইতে বলা হইয়াছিল। লর্ড ওয়েলেস্‌লী সতীদাহপ্রথা নিবারণার্থে সদর নিজামত আদালতের জজদের অভিমত জানিতে চাহিলে, তাঁহারা এই প্রথা একেবারে উঠাইয়া না দিয়া কতকগুলি কঠোর নিয়ম-কানুন দ্বারা নিয়ন্ত্রণের সুপারিশ করিয়াছিলেন। লর্ড মিণ্টোর শাসনকালে এই সুপারিশ-কার্যকরী করিবার উদ্দেশ্যে কোন ম্যাজিস্ট্রেট বা পুলিশ কর্মচারীর বিনা অনু-মতিতে সতীদাহ নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছিল (১৮১৩)। লর্ড হেস্টিংসের আমলে ডাইরেক্টর সভা এই অমানুষিক প্রথা বিলোপের নির্দেশ প্রেরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু ভারতীয়দের ধর্মে আঘাত দেওয়া সমীচীন হইবে না মনে করিয়া লর্ড আমহার্স্ট সতীদাহ নিবারণের চেষ্টা করিতে সাহসী হন নাই। লর্ড বেন্টিঙ্ক অবশ্য সতীদাহপ্রথা নিবারণের জন্য কৃতসংকল্প ছিলেন। তিনি শিক্ষিত উদারপন্থী হিন্দু নেতৃবর্গ এবং সদর নিজামত আদালতের জজদের অকুণ্ঠ সাহায্যলাভে সমর্থ হইলেন। প্রিন্স্ দ্বারকানাথ ঠাকুর ও

সামাজিক সংস্কার

সতীদাহ নিবারণ (১৮২৯)

efficient administration ; offering to the natives of the country reasonable opportunities for the exercise of their abilities, and capable of the expansion still in progress." Smith, *Oxford History of India,* p. 663.

* "*Suttee* probably was a Scythian rite introduced from Central Asia." Smith, p. 62.

রামমোহন রায়ের নাম এবিষয়ে উল্লেখযোগ্য। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে বেন্টিঙ্কের আদেশে নৃশংস সতীদাহপ্রথার বিলোপ ঘটিয়াছিল।

লর্ড বেন্টিঙ্কের অন্যতম উল্লেখযোগ্য সমাজসংস্কারমূলক কার্য হইল ঠগী দমন। ঠগীদের অত্যাচার বহু পূর্ব হইতেই নিরাপদে পথচলার অসুবিধার সৃষ্টি করিতেছিল। মোগল সম্রাট আকবর এটোয়া জেলায় পাঁচশত ঠগীকে হত্যা করাইয়াছিলেন। ফরাসী পর্যটক থেভেনো (Thevenot)-এর বর্ণনা হইতে ঔরঙ্গজেবের আমলে ঠগীদের অত্যাচারের কথা পাওয়া যায়। ইংরাজ শাসনের প্রথম দিকেও ঠগীদের অত্যাচারে একস্থান হইতে অপরস্থানে যাতায়াত বিপজ্জনক হইয়া উঠিয়াছিল। অতর্কিত আক্রমণে পথিকদের গলায় ফাঁস লাগাইয়া হত্যা করিয়া তাহাদের অর্থ ও জিনিসপত্রাদি আত্মসাৎ করাই ছিল ঠগীদের উপজীবিকা। বেন্টিঙ্ক কর্ণেল শ্লীম্যান (Col. Sleeman)-এর উপর ঠগী-দমনের ভার অর্পণ করিলেন। শ্লীম্যান ফেরিঙ্ঘিয়া (Feringhia) নামে জনৈক ঠগীর নিকট হইতে ঠগীদের গোপন ঘাঁটিগুলির সংবাদ সংগ্রহ করিয়া কঠোর হস্তে তাহাদিগকে দমন করিলেন (১৮৩০)।

ঠগী-দমন—কর্ণেল শ্লীম্যান (১৮২৯-৩০)

১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে চার্টার এ্যাক্ট্ অনুসারে কোম্পানি ভারতীয়দের শিক্ষার জন্য বাৎসরিক অন্ততঃ এক লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে বাধ্য ছিল। এই অর্থ কেবলমাত্র সংস্কৃত, ফার্সী প্রভৃতি প্রাচ্য ভাষা শিক্ষার জন্য ব্যয়িত হইত। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের বেন্টিঙ্ক ইংরাজীভাষায় শিক্ষাদানের জন্য সরকারী অর্থ ব্যয়িত হইবে স্থির করিলে এই সূত্রে এক তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি হইয়াছিল। তদানীন্তন ব্রিটিশ সেক্রেটারী প্রিন্সেপ্ (H.T. Princep) ও বিখ্যাত ঐতিহাসিক উইলসন (Wilson) প্রাচ্যভাষা শিক্ষার জন্য সরকারী অর্থ ব্যয় করিবার পক্ষপাতী ছিলেন। গবর্ণর-জেনারেলের কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য লর্ড ম্যাকলে (Lord Macaulay) ছিলেন ইংরাজী শিক্ষাদানের পক্ষপাতী।* রাজা

পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রবর্তন (১৮৩৫)

* এই সূত্রে লর্ড ম্যাকলে প্রাচ্যের সাহিত্য সম্পর্কে তাঁহার জ্ঞানের অভাবহেতু নিম্নলিখিত উদ্ভট মন্তব্য করিয়াছিলেন: "A single shelf of a good European library was worth the whole native literature of India and Arabia."—quoted in Sinha & Banerjee, p. 589.

রামমোহন রায় প্রমুখ কলিকাতার শিক্ষিত হিন্দুসমাজ পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই মার্চ বেন্টিঙ্ক ও তাঁহার কাউন্সিল ইংরাজী শিক্ষার জন্য সরকারী অর্থ ব্যয়িত হইবে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন। সেই বৎসরেই (১৮৩৫) লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের চেষ্টায় কলিকাতার মেডিক্যাল কলেজ ও বোম্বাই-এর এল্‌ফিন্‌স্টোন্ ইন্‌স্টিটিউশন্ স্থাপিত হইয়াছিল।

কলিকাতার মেডিক্যাল কলেজ ও বোম্বাই-এর এল্‌ফিন্‌স্টোন্ ইন্‌স্টিটিউশন্ স্থাপন

লর্ড বেন্টিঙ্কের পররাষ্ট্রনীতি (Foreign Policy of Lord Bentinck): পররাষ্ট্রক্ষেত্রে বেন্টিঙ্ক নিরপেক্ষ-নীতি (Policy of non-intervention) অনুসরণ করিয়া চলিবার পক্ষপাতী ছিলেন। অবশ্য প্রয়োজনবোধে এই নীতি পরিত্যাগ করিতেও তিনি প্রস্তুত ছিলেন। তাঁহার নিরপেক্ষ-নীতির সুযোগ লইয়া বরোদার গাইকোয়াড় ইংরাজদের বিরোধিতা করিতে শুরু করিলেন। ভোপাল, জয়পুর এবং গোয়ালিওর রাজ্যেও নানাপ্রকার আভ্যন্তরীণ গোলযোগ দেখা দিল, কিন্তু এই সকল রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে বেন্টিঙ্ক হস্তক্ষেপ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। কিন্তু চরম ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতার নীতি ত্যাগ করিতেও তিনি অবশ্য পশ্চাদ্‌পদ হইলেন না। কাছাড়ের রাজা কোন উত্তরাধিকারী না রাখিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলে সেই রাজ্যের জনসাধারণের অনুরোধে বেন্টিঙ্ক কাছাড় রাজ্যটি কোম্পানির শাসনভুক্ত করিয়াছিলেন। কুর্গের রাজার অত্যাচারে প্রজাগণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলে বেন্টিঙ্ক কুর্গ রাজ্য কোম্পানির অধিকারভুক্ত করিয়াছিলেন। আসামের জন্তিয়া পরগণার অধিবাসিগণ নরবলি দিবার জন্য কয়েকজন ইংরাজকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল। ব্রিটিশ সরকারের অনুরোধসত্ত্বেও তাহাদের মুক্তি না দেওয়ায় বেন্টিঙ্ক জন্তিয়া পরগণা দখল করিয়া লইয়াছিলেন। মহীশূর রাজ্যে সেই সময়ে চরম অব্যবস্থা দেখা দিলে বেন্টিঙ্ক মহীশূরের শাসনব্যবস্থা কোম্পানির হস্তে ন্যস্ত করিয়াছিলেন। অবশ্য ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে মহীশূরের শাসনভার ব্রিটিশ সরকার পুনরায় মহীশূর রাজ-বংশের হস্তে ফিরাইয়া দিয়াছিলেন।

নিরপেক্ষতার নীতি

নিরপেক্ষতার নীতির ব্যতিক্রম : কাছাড়, কুর্গ, জন্তিয়া রাজ্য অধিকার

মহীশূরের শাসনভার কোম্পানির হস্তে গ্রহণ

বেন্টিঙ্কের রাজত্বকাল হইতেই ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা অহেতুক রুশভীতিতে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠেন। হিরাট ও কান্দাহারের পথে রাশিয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করিতে উদ্যত এই ভয়ে ভীত ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা লর্ড বেন্টিঙ্ককে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের প্রতি মনোযোগী হইতে নির্দেশ দিলেন। ১৮৩০-৩১ খ্রীষ্টাব্দে বোর্ড অব কণ্ট্রোল (Board of Control)-এর নির্দেশ অনুযায়ী আলেকজাণ্ডার বার্ণেস্ পাঞ্জাবের মহারাজা রঞ্জিৎ সিংহের নিকট নানাবিধ উপঢৌকন সহ উপস্থিত হইলেন। সেই বৎসরেরই (১৮৩১) শেষভাগে লর্ড বেন্টিঙ্ক শতদ্রু নদীর তীরে রূপার নামক স্থানে রঞ্জিৎ সিংহের সহিত মিত্রতার নিদর্শনস্বরূপ সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। রঞ্জিৎ সিংহের সহিত 'চিরস্থায়ী মিত্রতা' (Perpetual friendship) স্থাপন করিয়া তিনি উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে ব্রিটিশ স্বার্থ রক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। মহারাজা রঞ্জিৎ সিংহ ইংরাজ বণিকগণকে সিন্ধু ও শতদ্রু নদীপথে বাণিজ্য চালনার সুযোগ-সুবিধা দান করিতে এবং ব্রিটিশ রাজ্যসীমা মানিয়া চলিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন, উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে ব্রিটিশ স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে বেন্টিঙ্ক সিন্ধু প্রদেশের আমীরগণের সহিতও মিত্রতাবদ্ধ হইয়াছিলেন।

রঞ্জিৎ সিংহ ও সিন্ধুর আমীরগণের সহিত মিত্রতা-স্থাপন

লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্কের কৃতিত্ব (Estimate of Lord William Bentinck): ভারতের ব্রিটিশ যুগের ইতিহাসে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক এক গৌরবোজ্জ্বল স্থান অধিকার করিয়া আছেন। তাঁহার কৃতিত্বের আলোচনায় ঐতিহাসিকগণের মধ্যে মতদ্বৈধ আছে। থর্ণটন (Thornton)-এর মতে লর্ড বেন্টিঙ্ক নিজের যশ ও খ্যাতির দিকেই অধিকতর মনোযোগী ছিলেন। অপর পক্ষে তাঁহার কার্যকলাপের প্রশংসা করিতে গিয়া লর্ড ম্যাকলে বেন্টিঙ্ককে জনহিতৈষী শাসক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে বেন্টিঙ্ক তাঁহার শাসনকালে মুহূর্তের জন্যও জনকল্যাণের কথা বিস্মৃত হন নাই। ভারতীয় সমাজের কুসংস্কার দূরীকরণ, ভারতীয় ও ইংরাজ কর্মচারীদের মধ্যে বৈষম্য দূরীকরণ, ভারতীয়দের শিক্ষা-দীক্ষার উন্নতিসাধন প্রভৃতির জন্য লর্ড ম্যাকলে উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের প্রশংসা করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, তিনিই সর্বপ্রথম প্রাচ্যদেশীয় অত্যাচারী শাসনের (Oriental despotism) স্থলে ব্রিটিশ

ভারত-ইতিহাসে লর্ড বেণ্টিঙ্কের স্থান

স্বাধীনতার আস্বাদ ভারতবাসীকে দিয়াছিলেন ("......who infused into Oriental despotism the spirit of British freedom")। লর্ড বেন্টিঙ্কের শাসনকালে জনকল্যাণমূলক সংস্কার সাধিত হইয়াছিল সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু ম্যাকলের ভাষায় আবেগ ও উচ্ছ্বাসের প্রাধান্য যে রহিয়াছে সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ভারত-ইতিহাসে স্মরণীয়

তথাপি বেন্টিঙ্কের কৃতিত্ব বিচারে তাঁহার শাসনকালের প্রারম্ভে কোম্পানির আর্থিক দুরবস্থার কথা এবং তাঁহার সংস্কারাদির পশ্চাতে জনকল্যাণের ইচ্ছার কথা স্মরণ রাখিলে ভারত-ইতিহাসে বেন্টিঙ্কের নাম কৃতজ্ঞতা সহকারে স্মরণযোগ্য একথা বলিতে হইবে।

সনন্দ বা চার্টার এ্যাক্ট, ১৮৩৩ (Charter Act, 1833): ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের চার্টার এ্যাক্ট-এর মেয়াদ শেষ হইয়া গেলে ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় চার্টার পাস করিবার প্রশ্ন ব্রিটিশ পার্লামেন্টে উত্থাপিত হইলে ইংলণ্ডের শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষ হইতে নানাপ্রকার দাবি পেশ করা হইল। ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির চীনদেশের সহিত বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার উঠাইয়া দিয়া চীনদেশের বাণিজ্যে সকল বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানকেই সমান অধিকার দেওয়া হউক এই দাবি তাহারা করিল। এদিকে পার্লামেন্ট কর্তৃক নিযুক্ত (১৮২৯) সিলেক্ট কমিটি ভারতবর্ষে কোম্পানির কার্যাদি সম্পর্কে এক বিরাট রিপোর্ট পেশ করিয়াছিলেন (১৮৩২)। ভারতবর্ষের কোম্পানির রাজ্যের শাসনভার ব্রিটিশ সরকারের হস্তে ন্যস্ত করিবার জন্য পার্লামেন্টে সরকারের বিরোধী দল দাবি উত্থাপন করিলেও শেষ পর্যন্ত ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানিকেই পুনরায় কুড়ি বৎসরের জন্য ভারতে বাণিজ্য করিবার এবং ভারতবর্ষে কোম্পানি কর্তৃক অধিকৃত রাজ্য "ইংলণ্ড-রাজের পক্ষে" পরিচালনা করিবার অনুমতি দেওয়া হইল। চীনদেশীয় বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার অবশ্য কোম্পানিকে এইবার আর দেওয়া হইল না। ফলে, ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান হইতে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইল।

ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির চীনদেশীয় বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার বিলোপ

কোম্পানির ভারতীয় শাসনকর্তৃপক্ষকে আইন-প্রণয়নের ক্ষমতা দেওয়া

হইল। পূর্বে তাহারা কেবলমাত্র 'রেগুলেশন' (Regulation) পাস করিতে পারিত। বাংলার গবর্ণর-জেনারেলকে 'ভারতের গবর্ণর-জেনারেল' নাম দেওয়া হইল। মাদ্রাজ ও বোম্বাই-এর কাউন্সিলের আইন-প্রণয়নের ক্ষমতা বাতিল করিয়া দেওয়া হইল। ইওরোপীয় নাগরিকগণকে ভারতবর্ষে জমিদারি ক্রয় করিবার অধিকার দেওয়া হইল। নীল চাষের এবং অনুন্নত অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য জমি ক্রয় করিবার অধিকারও তাহারা পাইল। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' গ্রন্থে এই নীলকর ইওরোপীয়দের অমানুষিক অত্যাচারের বিবরণ পাওয়া যায়। ১৮৫৯ ও ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে নীলকরদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কথাও 'নীলদর্পণে' আছে। গবর্ণর-জেনারেলের কাউন্সিলের সদস্যসংখ্যা চার হইতে পাঁচ করা হইল এবং 'আইন সচিব' (Law member)-এর একটি নূতন পদ সৃষ্টি করিয়া তাঁহাকে পদাধিকার-বলে কাউন্সিলের পঞ্চম সদস্য নিযুক্ত করা হইল। আগ্রা অঞ্চল লইয়া 'উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ' নামে একটি নূতন প্রদেশ গঠনের অনুমতিও এই চার্টার-এ দেওয়া হইয়াছিল। অবশ্য এই শর্তটি কখনও কার্যকরী করা হয় নাই।

বাংলার গবর্ণর-জেনারেল 'ভারতের গবর্ণর-জেনারেল' নামে অভিহিত

নীল চাষ—নীলদর্পণ নীল চাষের সুযোগ

আইন সচিব বা Law member-এর পদ সৃষ্টি

জাতি, ধর্ম, বর্ণ, জন্ম প্রভৃতির জন্য কোন ভারতীয়কে অথবা ব্রিটিশ নাগরিককে কোম্পানির অধীনে চাকরি-দানে আপত্তি করা চলিবে না—এই নীতিও ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের চার্টার-এ সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল।

জাতি, ধর্ম, বর্ণ, জন্ম প্রভৃতি ভেদাভেদ দূরীকরণ

সার্ চার্লস্ মেট্‌কাফ্, ১৮৩৫-৩৬ (Sir Charles Metcalfe) : লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক-এর পর সার্ চার্লস্ মেট্‌কাফ্ অস্থায়ী গবর্ণর-জেনারেল নিযুক্ত হইয়াছিলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে হয়ত গবর্ণর-জেনারেল-পদে স্থায়িভাবে বহাল করা হইত। কিন্তু চার্লস্ মেট্‌কাফ্ সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দান করিয়াছিলেন বলিয়া ডাইরেক্টর সভা তাঁহার এই কার্যের তীব্র নিন্দা করিলে তিনি পদত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে ফিরিয়া গিয়াছিলেন।

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা

লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড, ১৮৩৬-৪২ (Lord Auckland) : লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড

ভারতবর্ষে পৌঁছিয়াই উন্নয়নমূলক কার্যে হস্তক্ষেপ করিলেন। ডাক্তারী, সাধারণ শিক্ষা প্রভৃতির উন্নতি বিধান করিয়া তিনি প্রথমে তাঁহার মানসিক উৎকর্ষের পরিচয় দিলেন। পূর্বে ইংরাজী স্কুল-কলেজের ছাত্র ভিন্ন অপর কাহাকেও সরকারী বৃত্তি দেওয়া হইত না। লর্ড অকল্যাণ্ড সংস্কৃত, আরবী ও ফারসী ভাষাশিক্ষার্থীদেরও সরকারী বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন তিনি তীর্থকর, বিভিন্ন জনপ্রিয় ধর্মানুষ্ঠানে কোম্পানির সৈন্যদের যোগদানের রীতি, ধর্মাধিষ্ঠানগুলির সম্পত্তির উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি উঠাইয়া দিয়াছিলেন। কৃষিকার্যের সুবিধার জন্য বৃহৎ সেচপরিকল্পনার প্রাথমিক কার্যাদিও তিনি করাইয়াছিলেন। শান্তি-মূলক নীতি অনুসরণে এবং জনকল্যাণকর কার্যাদিতে নিযুক্ত থাকিলে লর্ড অকল্যাণ্ড হয়ত সাফল্যলাভে সমর্থ হইতেন। কিন্তু সেই সময়ে রুশ-ভীতি-জনিত আফগান-নীতি পরিচালনায় তিনি অব্যবস্থিত-চিত্ততা, অদূরদর্শিতা ও সামরিক অকর্মণ্যতার পরিচয় দিয়া নিজের এবং ব্রিটিশ সরকারের মর্যাদা ধূলায় লুণ্ঠিত করিয়াছিলেন। দেশীয় নৃপতিগণের সহিত ব্যবহারেও তিনি গবর্ণর-জেনারেল-সুলভ মর্যাদা রক্ষা করিয়া চলিতে পারেন নাই।

জনকল্যাণমূলক সংস্কার

পররাষ্ট্রক্ষেত্রে অকল্যাণ্ডের দুর্বলতা

১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে অযোধ্যার নবাবের মৃত্যু ঘটিলে নাসির-উদ্দিন হায়দর নবাব-পদে অধিষ্ঠিত হইলেন। নাসির-উদ্দিন ছিলেন যেমন অকর্মণ্য তেমনি অত্যাচারী। তাঁহার রাজত্বকালের প্রারম্ভেই অযোধ্যার বিধবা বেগম (পাদ্‌শা বেগম) বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন। ব্রিটিশ সৈন্যের সাহায্যে এই বিদ্রোহ-দমনে বিলম্ব হইল না বটে, কিন্তু তাহাতে আভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থার কোন উন্নতি ঘটিল না। সুযোগ বুঝিয়া লর্ড অকল্যাণ্ড নাসির-উদ্দিনের নিকট হইতে অযোধ্যায় অবস্থিত ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর খরচ-বাবদ পূর্বাপেক্ষা অধিক অর্থসাহায্য চাহিলেন এবং এক নূতন চুক্তি স্বাক্ষর করিতে বলিলেন। ডাইরেক্টর সভা তাঁহার এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলে তিনি এই সংবাদটি অযোধ্যার নবাবের নিকট গোপন রাখিলেন। পূর্বাপেক্ষা অধিক অর্থসাহায্য তাঁহার নিকট হইতে গ্রহণ করা হইবে না একথা অবশ্য তিনি তাঁহাকে জানাইয়াছিলেন। অযোধ্যার নবাব উহা অকল্যাণ্ডের উদারতা বলিয়াই ধরিয়া লইয়াছিলেন।

অযোধ্যার নবাবের প্রতি ব্যবহার

সেই বৎসরই (১৮৩৭-৩৮) উত্তর-ভারতে এক দারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল। মোট আট লক্ষ লোক এই দুর্ভিক্ষের ফলে প্রাণ হারাইয়াছিল। দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িতদের সাহায্যের জন্য মোট ৩৮ লক্ষ টাকা খরচ হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাতে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ হ্রাস করা সম্ভব হয় নাই।

উত্তর-ভারতে দুর্ভিক্ষ

শিবাজীর বংশধর সাতারা (Satara)-এর রাজা পোর্তুগীজদের সহিত ষড়যন্ত্র শুরু করিলে তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তাঁহার ভ্রাতাকে সিংহাসনে স্থাপন করা হয় (১৮৩৯)। অনুরূপভাবে, কার্নুল (Karnul)-এর নবাব ব্রিটিশ-বিরোধী ষড়যন্ত্র করিতে আরম্ভ করিলে তাঁহার রাজ্যটি ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত করা হয়। ইন্দোর-এর হোল্‌কারও ব্রিটিশের বিরোধিতা শুরু করিলে তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

সাতারা, কার্নুল ও ইন্দোর রাজ্যের সহিত সম্পর্ক

প্রথম ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধ (The First Anglo-Afghan War) : লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড যখন ভারতের গবর্ণর-জেনারেল নিযুক্ত হইয়া আসিলেন তখন ভারতীয় রাজনীতির সর্বপ্রধান সমস্যা ছিল উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের নিরাপত্তা বিধান করা। উনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকে ব্রিটিশ মন্ত্রি-সভার পররাষ্ট্র-নীতি সম্পূর্ণভাবে রুশ-বিরোধী হইয়া উঠিয়াছিল। পররাষ্ট্র দপ্তরের সেক্রেটারী লর্ড পামারস্টোন (Palmerston)-এর অহেতুক রুশ-ভীতি এজন্য প্রধানতঃ দায়ী ছিল। ১৮৩৭-৩৮ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়ার সমর্থনে পারস্য আফগানিস্তানের হিরাট্ প্রদেশটি আক্রমণ করিলে পামারস্টোন অধিকতর সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন। গবর্ণর-জেনারেল লর্ড অকৃল্যাণ্ড ছিলেন পামারস্টোনের অন্ধ অনুসরণকারী। তিনিও রাশিয়া কর্তৃক হিরাট্-জয়ে অত্যন্ত সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন এবং রাশিয়ার সাহায্য লইয়া পারস্য যাহাতে আফগানিস্তানের দিকে অগ্রসর হইতে না পারে সেইজন্য ক্যাপ্টেন আলেকজাণ্ডার বার্ণেস্ (Capt. Alexander Burnes)-এর নেতৃত্বে আফগানিস্তানে একটি বাণিজ্য-মিশন প্রেরণ করিলেন। ডাইরেক্টর সভাও অকৃল্যাণ্ডকে আফগানিস্তানের রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন। নামে

রুশ-ভীতি

আলেকজাণ্ডার বার্ণেস-এর বাণিজ্য-মিশন

বাণিজ্য-মিশন হইলেও বস্তুত এই মিশনের মূল উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধা আদায় করা।

যাহা হউক, আফগানিস্তানের আমীর দোস্ত মোহম্মদও ইংরাজদের সহিত মিত্রতাবদ্ধ হইবার জন্য উদ্‌গ্রীব ছিলেন। কিন্তু ইংরাজদের সহিত মিত্রতার বিনিময়ে তিনি রঞ্জিৎ সিংহ কর্তৃক অধিকৃত পেশওয়ার প্রত্যর্পণ দাবি করিলেন। লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড দোস্ত মোহম্মদের মিত্রতার বিনিময়ে পাঞ্জাব-কেশরী রঞ্জিৎ সিংহকে অসন্তুষ্ট করিতে চাহিলেন না। তিনি রঞ্জিৎ সিংহকে অধিকতর নির্ভরযোগ্য ও শক্তিশালী মিত্র বলিয়া মনে করিলেন। দোস্ত মোহম্মদকে পেশওয়ার ফিরাইয়া দিবার জন্য রঞ্জিৎ সিংহের উপর কোনপ্রকার চাপ দিতে অস্বীকৃত হওয়ায় ইংরেজদের সহিত দোস্ত মোহম্মদ মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হইতে অস্বীকৃত হইলেন। উপরন্তু তিনি রাশিয়ার সহিত পূর্বাপেক্ষা অধিকতর মিত্রতাপূর্ণ ব্যবহার শুরু করিলেন। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড দোস্ত মোহম্মদের মিত্রতালাভের বিনিময়ে রঞ্জিৎ সিংহকে পেশওয়ার ফিরাইয়া দিবার জন্য চাপ দিতে অস্বীকৃত হইয়া নির্বুদ্ধিতার কাজ করিয়াছিলেন। কারণ, দোস্ত মোহম্মদের সহিত মিত্রতাসূত্রে খাইবার গিরিপথের উপর ব্রিটিশ প্রাধান্য বিস্তারের সুযোগ তিনি লাভ করিতে সমর্থ হইতেন। তাঁহার আফগান-নীতি অহেতুক রুশ-ভীতি দ্বারা প্রভাবিত ছিল। পারস্য দেশের সীমা ও কোম্পানির রাজ্যসীমার মধ্যে যে বিরাট ব্যবধান ছিল একথা লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড বুঝিতে পারেন নাই। পারস্যের সেনাবাহিনীর পক্ষে আফগানিস্তান অতিক্রম করিয়া ভারত-সীমান্তে উপস্থিত হওয়া তেমন সহজ ছিল না। এমতাবস্থায় পাঞ্জাবের রঞ্জিৎ সিংহের মিত্রতার উপর এত বেশি গুরুত্ব আরোপ করা অক্‌ল্যাণ্ডের অদূরদর্শিতার পরিচায়ক বলিয়া মনে করা হয়। শান্তিপূর্ণ উপায়ে রঞ্জিৎ সিংহকে পেশওয়ার ফিরাইয়া দিতে স্বীকৃত করাও অসম্ভব ছিল না।

আফগানিস্তানের আমীর দোস্ত মোহম্মদের সহিত ব্রিটিশ মৈত্রীর চেষ্টা—বিফলতায় পর্যবসিত

যাহা হউক দোস্ত মোহম্মদের সহিত মিত্রতা-স্থাপনের পরিকল্পনার অসাফল্য এবং তাঁহার রুশ-প্রীতি অক্‌ল্যাণ্ডের মনে দারুণ ভীতির সঞ্চার করিল। তিনি আফগানিস্তানের আমীর-পদ হইতে দোস্ত মোহম্মদকে অপসারণের জন্য কৃতসংকল্প হইলেন। দোস্ত মোহম্মদের স্থলে তিনি আহ্‌মদ

শাহ্ হুর্‌রাণীর জনৈক বংশধর—শাহ্ সুজাকে স্থাপন করিতে চাহিলেন।

প্রথম ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধের কারণ

শাহ্ সুজা আফগানিস্তানের সিংহাসনচ্যুত হইয়া ইংরাজদের রক্ষণাধীনে লুধিয়ানায় আশ্রয় লইয়াছিলেন। শাহ্ সুজার পক্ষ গ্রহণ করিয়া অক্‌ল্যাণ্ড আফগানিস্তানের সিংহাসন উদ্ধার করিতে সচেষ্ট হইলেন। শাহ্ সুজাকে আফগানিস্তানের সিংহাসনে স্থাপন করিতে পারিলে সেখানে ইংরাজ প্রভাব বিস্তারের সুযোগ বহুগুণে বৃদ্ধি পাইবে, এই ছিল লর্ড অক্‌ল্যাণ্ডের ধারণা। তিনি শাহ্ সুজা ও রঞ্জিৎ সিংহের সহিত মিত্রতাবদ্ধ হইলেন। এই ত্রিশক্তি চুক্তি (Triple Alliance) সম্পাদন করিয়া অক্‌ল্যাণ্ড আফগানিস্তান আক্রমণের পরিকল্পনা-গঠনে মনোনিবেশ করিলেন। কিন্তু কোম্পানির সেনাধ্যক্ষ তাঁহার এই আক্রমণমূলক পরিকল্পনা সমর্থন করিলেন না। ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা অবশ্য লর্ড অক্‌ল্যাণ্ডের আফগান-নীতি সমর্থন করিলেন। কিন্তু ডাইরেক্টর সভা উহার তীব্র বিরোধিতা করিতে লাগিলেন। নীতির দিক দিয়া বিচার করিলেও দোস্ত মোহম্মদের রুশ-প্রীতি অথবা ইংরাজদের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইতে অস্বীকৃত হওয়া যুদ্ধের কারণ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। স্বাধীন আমীর দোস্ত মোহম্মদ কোন্ শক্তির সহিত চুক্তিবদ্ধ হইবেন তাহা ব্রিটিশের অনুমোদনসাপেক্ষ নিশ্চয়ই ছিল না। সুতরাং অক্‌ল্যাণ্ডের আফগান-নীতির পশ্চাতে কোনপ্রকার নৈতিকতা যে ছিল না, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

শাহ্ সুজা, রঞ্জিৎ সিংহ ও ব্রিটিশের মধ্যে 'ত্রিশক্তি চুক্তি'

ঠিক সেই সময়ে আফগানিস্তানে হুর্‌রাণী ও বারাক্‌জাইস্ নামক দুইটি রাজপরিবারের মধ্যে এক তীব্র বিরোধের সৃষ্টি হয়। দোস্ত মোহম্মদ ছিলেন বারাক্‌জাইস্ বংশসম্ভূত। এই অন্তর্দ্বন্দ্বের সুযোগ গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্যে লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। এইভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড ব্রিটিশ ভারতীয় ইতিহাসে অন্যতম উল্লেখযোগ্য ভুল করিয়াছিলেন।

অক্‌ল্যাণ্ড কর্তৃক আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা

যুদ্ধের প্রারম্ভেই দোস্ত মোহম্মদ পরাজিত ও সিংহাসনচ্যুত হইলেন। বন্দী অবস্থায় তাঁহাকে কলিকাতায় লইয়া আসা হইল। শাহ্ সুজা ব্রিটিশ

সহায়তায় আফগানিস্তানের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন। কিন্তু শাহ্ সুজার ইংরাজ-পদলেহন এবং ব্রিটিশ ক্যাপ্টেন বার্নেস্-এর ব্যভিচার আফগান জাতির মনে এক দারুণ ঘৃণার সৃষ্টি করিল। তাহারা কাবুলে প্রকাশ্য বিদ্রোহ শুরু করিয়া ক্যাপ্টেন বার্নেস্‌কে ধরিয়া লইয়া গিয়া নৃশংসভাবে হত্যা করিয়া তাহার ব্যভিচারিতার প্রতিশোধ গ্রহণ করিল। ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট মেক্‌নাটেন (Macnaghten) আফগানদের সহিত অপমানজনক শর্তে এক চুক্তি স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হইলেন। এই চুক্তির শর্তানুসারে দোস্ত মোহম্মদকে মুক্তি দানে ও আফগানিস্তান হইতে ব্রিটিশ সৈন্য অপসারণে ব্রিটিশ পক্ষকে রাজী হইতে হইল। মেক্‌নাটেন পরিস্থিতির চাপে পড়িয়া এইরূপ শর্তসম্বলিত চুক্তি স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু এই চুক্তির শর্তাদি মানিয়া চলা তাঁহার ইচ্ছা ছিল না। তাঁহার উদ্দেশ্য সম্পর্কে আফগানরাও সন্দিহান হইয়া উঠিল এবং শেষ পর্যন্ত তাঁহাকেও হত্যা করিল। ইহার পর পুনরায় আফগানদের সহিত অধিকতর অপমানজনক শর্ত মানিয়া লইয়া ব্রিটিশ সেনাবাহিনীকে যাবতীয় অস্ত্রশস্ত্র আফগানদের হস্তে সমর্পণ করিয়া আফগানিস্তান পরিত্যাগ করিতে হইল। নিরস্ত্রভাবে আফগানিস্তান পরিত্যাগের কালে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর অনেকেই আফগানদের গুলিতে প্রাণ হারাইল। জালালাবাদ ও কান্দাহারে তখনও অবশ্য ইংরাজ প্রাধান্য বজায় ছিল। কিন্তু কাবুলে ব্রিটিশ সৈন্য বা রেসিডেণ্টের কোন চিহ্ন আর রহিল না। ব্রিটিশ সৈন্যক্ষয় এবং ব্রিটিশ মর্যাদা ধূলায় লুণ্ঠিত করিয়া লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড তাঁহার আফগান-নীতির চরম বিফলতার পরিচয় দিলেন। এইভাবে হৃতমর্যাদা ও অপদস্থ হইয়া তিনি পদত্যাগপূর্বক স্বদেশে ফিরিয়া গেলেন।

দোস্ত-মোহম্মদের পরাজয়

আফগানদের বিদ্রোহ—'মেক্‌নাটেন চুক্তি'

ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধের দ্বিতীয় পর্যায়—ব্রিটিশ সৈন্যক্ষয় ও মর্যাদাহানি

লর্ড অক্‌ল্যাণ্ডের পদত্যাগের পর লর্ড এলেনবরা (Lord Ellenborough) ভারতের গবর্ণর-জেনারেল নিযুক্ত হইলেন। ভারতবর্ষে পৌঁছিয়াই তিনি লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড কর্তৃক আরব্ধ প্রথম আফগান যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটাইতে চাহিলেন। ইহা ভিন্ন ব্রিটিশ মর্যাদা পুনরুদ্ধার করাও

ছিল তাঁহার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। তিনি সেনাপতি পোলক্‌কে জালালাবাদে অবরুদ্ধ ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর সাহায্যার্থে প্রেরণ করিলেন। সেনাপতি নট্ (Nott)-ও পোলক্‌কে সাহায্যদানে অগ্রসর হইলেন। কাবুলে পৌঁছিবার পূর্বেই সেনাপতি পোলক্ জালালাবাদের ব্রিটিশ বাহিনাকে অবরোধ-মুক্ত করিতে সক্ষম হইলেন। সেনাপতি নট্ গজনী শহরে প্রবেশ করিয়া শহরটিকে এক বিরাট ধ্বংসস্তূপে পরিণত করিলেন। তারপর পোলক্ ও নট্-এর যুগ্মবাহিনী কাবুলে প্রবেশ করিয়া এক পৈশাচিক ধ্বংসলীলার অনুষ্ঠান করিল। কাবুলের বাজারটি বিস্ফোরকের সাহায্যে ধূলিসাৎ করা হইল। এইভাবে আফগানিস্তানের সহিত যুদ্ধে পরাজয়ের অপমান দূর করিতে গিয়া ইংরাজগণ নিজ নাম অধিকতর মসিলিপ্ত করিয়াছিল মাত্র। ইতিপূর্বেই দোস্ত মোহম্মদ ব্রিটিশের কবলমুক্ত হইয়াছিলেন। কাবুল ও গজনীতে ধ্বংসলীলার অনুষ্ঠান করিয়া ব্রিটিশ সেনাবাহিনী অপসরণ করিলে আফগানগণ ব্রিটিশ পদলেহী আমীর শাহ্ সুজাকে হত্যা করিয়া দোস্ত মোহম্মদকে পুনরায় আমীর পদে স্থাপন করিল। এইভাবে প্রথম আফগান যুদ্ধে ব্রিটিশ পক্ষের চূড়ান্ত অপমান ও পরাজয় ঘটিয়াছিল।

লর্ড এলেনবরা-এর শাসনকাল : প্রথম ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধের পরিসমাপ্তি

লর্ড অক্‌ল্যাণ্ডের আফগান নীতির সমালোচনা (Criticism of Lord Auckland's Afghan Policy) ঃ প্রথম আফগান যুদ্ধের কারণ এবং যুদ্ধের বিবরণ আলোচনা করিলে লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড তথা ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার অদূরদর্শিতা ও নীতিজ্ঞানহীনতার পরিচয় পাওয়া যায়। ব্রিটিশ পররাষ্ট্র দপ্তরের সেক্রেটারী লর্ড পামারস্টোনের অহেতুক রুশ-ভীতিই যে অক্‌ল্যাণ্ডের আফগান-নীতির মূল ভিত্তি ছিল, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড ছিলেন লর্ড পামারস্টোনের অন্ধ অনুসরণকারী। সুতরাং আফগানিস্তান আক্রমণের সপক্ষে যথেষ্ট যুক্তি ছিল কিনা তাহা বিচার করিয়া দেখিবার মত ধৈর্য, স্থৈর্য বা দূরদৃষ্টি তিনি প্রদর্শন করেন নাই। রাশিয়া ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সীমা পর্যন্ত প্রভাব বিস্তার করিতে উদ্যত হইয়াছে এই ভীতি তাঁহার রাজনৈতিক দূরদৃষ্টিকে সম্পূর্ণভাবে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। তদানীন্তন ভারতীয় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত হইতে পারস্য

লর্ড পামারস্টোন ও লর্ড অক্‌ল্যাণ্ডের অহেতুক রুশ-ভীতি

বা রাশিয়ার রাজ্যসীমা কতদূর সেই ভৌগোলিক জ্ঞানও অক্ল্যাণ্ড বা লর্ড পামারস্টোনের ছিল না। পামারস্টোনকে এই অঞ্চলের একখানা বৃহৎ মানচিত্র আলোচনা করিয়া দেখিবার উপদেশও কেহ কেহ দিয়াছিলেন। কিন্তু রুশ-ভীতি পামারস্টোন ও তাঁহার শিষ্য অক্ল্যাণ্ডের মনে এমন এক বিভীষিকার সৃষ্টি করিয়াছিল যে, তদানীন্তন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সীমা এবং রুশপ্রভাবাধীন পারস্যের সীমা উভয়ই যে মধ্যবর্তী পাঞ্জাব, সিন্ধু, ভাওয়ালপুর ও রাজপুতানার বিস্তীর্ণ মরু অঞ্চলের দ্বারা বিচ্ছিন্ন ছিল এই কথা উপলব্ধি করিবার মত অনুধাবনশক্তি তাঁহাদের লোপ পাইয়াছিল। ব্রিটিশের মিত্রপক্ষ পাঞ্জাব কেশরী রঞ্জিৎ সিংহকে বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার দ্বারা আফগানিস্তানের আমীরকে পেশওয়ার ফিরাইয়া দিতে রাজী করাইবার কোন চেষ্টা-ই অক্ল্যাণ্ড করেন নাই। এই উপায়ে রঞ্জিৎ সিংহের নিকট হইতে পেশওয়ার দোস্ত মোহম্মদকে ফিরাইয়া দিবার চেষ্টা করিলেও হয়ত দোস্ত মোহম্মদ ব্রিটিশের সহিত প্রীতিপূর্ণ ব্যবহারই করিতেন।

তদানীন্তন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণার অভাব

স্বাধীন আমীর দোস্ত মোহম্মদের ইংরাজ-মৈত্রী প্রত্যাখ্যান তথা রুশ-মৈত্রী গ্রহণের স্বাধীনতা যে ছিল, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু লর্ড অক্ল্যাণ্ড আন্তর্জাতিক নৈতিকতায় জলাঞ্জলি দিয়া দোস্ত মোহম্মদকে সিংহাসনচ্যুত করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। মানবতা ও নৈতিকতার বিচারে তাঁহার এই আচরণ সমর্থনযোগ্য নহে।

স্বাধীন আমীর দোস্ত মোহম্মদের রুশ-প্রীতি যুদ্ধের কারণ হিসাবে অগ্রাহ্য

রাজনৈতিক প্রয়োজনের দিক দিয়াও এই আচরণ সমর্থনযোগ্য নহে। রুশসাহায্যপুষ্ট পারস্য হিরাট্ জয় করিলে রুশপ্রভাব বিস্তৃত হইবার যে আশঙ্কা ছিল, তাহা ইংরাজ ও আফগান বাহিনীর যুগ্ম চেষ্টায় ব্যাহত হইয়াছিল এবং ইতিপূর্বেই পারস্য হিরাটের অবরোধ উঠাইয়া লইতে বাধ্য হইয়াছিল। সুতরাং রুশপ্রভাব বিস্তারের যুক্তিও প্রথম ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধের সমর্থনে প্রদর্শন করা সম্ভব নহে।

রাজনৈতিক যুক্তির অভাব

আমীর দোস্ত মোহম্মদ ব্রিটিশদের কোনপ্রকার বিরোধিতা বা শত্রুতা-

সাধন করেন নাই। এমতাবস্থায় দোস্ত মোহম্মদের রুশ-মৈত্রীর অজুহাতে আফগানিস্তান আক্রমণ করিয়া অক্‌ল্যাণ্ড ব্রিটিশ নামে কলঙ্ক লেপন করিয়াছিলেন। তদুপরি আফগানিস্তান আক্রমণকালে সিন্ধুদেশের মধ্য দিয়া ব্রিটিশ সৈন্য প্রেরণ এবং সিন্ধুর আমীরদের নিকট হইতে জবরদস্তিমূলকভাবে অর্থসংগ্রহ সিন্ধুর আমীরগণের সহিত বেন্টিঙ্ক কর্তৃক স্বাক্ষরিত চুক্তির শর্তভঙ্গ করিয়াছিল। আফগান যুদ্ধ তথা সিন্ধুর আমীরদের প্রতি ব্যবহারের অনৈতিকতা ও অদূরদর্শিতা সম্পর্কে ব্রিটিশ ঐতিহাসিকদের মধ্যে কোন মতানৈক্য নাই।

ব্রিটিশ নামে কলঙ্ক-লেপন

লর্ড এলেনবরা, ১৮৪২—৪৪ (Lord Ellenborough) : লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড পদত্যাগ করিলে লর্ড এলেনবরা গবর্ণর-জেনারেল নিযুক্ত হইয়া আসিলেন। প্রথমেই তিনি লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড-এর আরব্ধ প্রথম ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধের অবসান এবং ব্রিটিশ মর্যাদা পুনরুদ্ধার করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। এবিষয়ে পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে (১৯৮ পৃষ্ঠা)। কিন্তু তিনি আফগানদের সহিত যুদ্ধে কৃতকার্য হইতে পারিলেন না। ব্রিটিশের মর্যাদা বৃদ্ধি করা দূরে থাকুক গজনী ও কাবুল শহরে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর বর্বরতা এবং শেষ পর্যন্ত দোস্ত মোহম্মদের আফগানিস্তানের সিংহাসনে পুনর্বার আরোহণ এলেনবরা-র কৃতিত্বের পরিচায়ক নহে।

প্রথম ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধ - ব্রিটিশ অসাফল্য

সিন্ধুবিজয় (Conquest of Sind) : অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে সিন্ধুর আমীরগণ আফগানিস্তানের মৌখিক আনুগত্য স্বীকার করিয়া চলিতেন। খইরাপুর, মীরপুর, হায়দ্রাবাদ প্রভৃতি স্থানের আমীরগণ ছিলেন সিন্ধুর প্রকৃত শাসক। ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ গবর্ণর-জেনারেল লর্ড মিণ্টো সিন্ধুদেশে ফরাসী প্রভাব বিনাশ করিবার উদ্দেশ্যে সিন্ধুর আমীরদের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইয়াছিলেন। এই চুক্তির শর্তানুসারে আমীরগণ কোন ফরাসীকে সিন্ধুদেশে অবস্থান করিতে দিবেন না বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন। এই চুক্তি ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে পুনর্বার স্বাক্ষরিত হইল। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে ক্যাপ্টেন আলেকজাণ্ডার বার্ণেস্ সিন্ধু-

১৮০৯ ও ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে আমীরগণের সহিত ইংরাজ কোম্পানির চুক্তি

নদের পথ ধরিয়া লাহোরে পৌঁছিবার কালে সিন্ধু উপত্যকার বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক গুরুত্ব উপলব্ধি করিলেন এবং একথা ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি-গোচর করিলেন। ইহার কয়েক বৎসর পরে (১৮৩২) লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক হায়দ্রাবাদের (সিন্ধু) আমীরের সহিত এক মিত্রতা-চুক্তি দ্বারা সিন্ধুনদ-পথে এবং স্থলপথে ব্যবসায়-বাণিজ্য করিবার অধিকার লাভ করিলেন।

লর্ড বেণ্টিঙ্ক ও আমীরদের সহিত চুক্তি (১৮৩২)

সামরিক বাহিনী, নৌবাহিনী বা কোনপ্রকার সামরিক সরঞ্জাম সিন্ধুদেশের মধ্য দিয়া লইয়া যাওয়া হইবে না এই প্রতিশ্রুতি অবশ্য লর্ড বেণ্টিঙ্ককে দিতে হইয়াছিল। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে অক্‌ল্যাণ্ড হায়দ্রাবাদে একজন ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট স্থাপনের শর্তে আমীরদের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইলেন, কিন্তু প্রথম ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধের কালে লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের চুক্তির শর্তাদি উপেক্ষা করিয়া সিন্ধুনদের মধ্য দিয়া সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। তদুপরি আমীরদের নিকট হইতেও অর্থ আদায় করিতে তিনি দ্বিধা করেন নাই। অক্‌ল্যাণ্ডের এইরূপ বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ গ্রহণ করা সিন্ধুর আমীরগণের পক্ষে অসম্ভব ছিল না।

অক্‌ল্যাণ্ড কর্তৃক চুক্তির শর্তভঙ্গ

বিশেষতঃ প্রথম ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধে পরাজয়ের পর ইচ্ছা করিলে সিন্ধুর আমীরগণ ব্রিটিশ বাহিনীকে আক্রমণ করিয়া পর্যুদস্ত করিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহারা ইংরাজদের বিরুদ্ধে কোন প্রকাশ্য সংঘর্ষে অগ্রসর হইলেন না। তথাপি লর্ড এলেনবরা সার্ চার্লস্ নেপিয়ার (Sir Charles Napier) নামে জনৈক নীতিজ্ঞানহীন দুর্ধর্ষ ইংরাজকে সিন্ধুদেশের আমীরগণের সহিত যে-কোন উপায়ে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করিয়া সিন্ধুদেশ অধিকার করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। চার্লস্ নেপিয়ার খইরাপুরের আমীর পরিবারের উত্তরাধিকার-দ্বন্দ্বে পক্ষ গ্রহণ করিয়া ক্রমে সিন্ধুর আমীরদের এক নূতন চুক্তি স্বাক্ষরে বাধ্য করিলেন। এই চুক্তি দ্বারা তিনি তাঁহাদিগকে স্ব স্ব রাজ্যের এক বিরাট অংশ ইংরাজদের ছাড়িয়া দিতে বাধ্য করিলেন। আমীরদের মুদ্রাপ্রচলনের অধিকার কাড়িয়া লওয়া হইল। কিন্তু আমীরগণকে ভীতিপ্রদর্শন করিবার উদ্দেশ্যে ইমামগড় নামক দুর্গটি ধূলিসাৎ করিলে এবং অবশেষে বেলুচ জাতিকে নানাভাবে উত্যক্ত করিয়া তুলিলে তাহারা ব্রিটিশ রেসিডেন্সী আক্রমণ করিতে বাধ্য

সার্ চার্লস্ নেপিয়ারের ঔদ্ধত্য

হইল। চার্লস্ নেপিয়ার বহুকাল হইতেই যুদ্ধের সুযোগ খুঁজিতেছিলেন। বেলুচগণ ব্রিটিশ রেসিডেন্সী আক্রমণ করিলে সার্ চার্লস্ নেপিয়ার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া যুদ্ধ ঘোষণা করিতে আর বিলম্ব করিলেন না।

মিয়ানী ও দাবো-এর যুদ্ধে জয়লাভ

মিয়ানী ও দাবো-এর যুদ্ধে আমীরগণ অধিকতর শক্তিশালী ব্রিটিশ বাহিনীর হস্তে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হইলে সিন্ধু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হইল (১৮৪৩)। আমীরগণকে তাঁহাদের স্ব স্ব দেশ হইতে নির্বাসিত করিয়া সার্ চার্লস্ নেপিয়ার সিন্ধুদেশের শাসক হিসাবে দীর্ঘ চারিবৎসর ধরিয়া চূড়ান্ত স্বেচ্ছাচার চালাইলেন।

ব্রিটিশের নীচ স্বার্থপর নীতি

এলেনবরা ও সার্ চার্লস্ নেপিয়ারের সিন্ধুবিজয়-সংক্রান্ত যাবতীয় আচরণ তাঁহাদের নীচ স্বার্থপরতা ও নীতিজ্ঞানহীনতার পরিচায়ক এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। সমসাময়িক ও পরবর্তী কালের ঐতিহাসিকগণ তাঁহাদের আচরণের তীব্র নিন্দা করিয়াছেন। ঔদ্ধত্য ও নীচ স্বার্থপরতাদোষে দুষ্ট সিন্ধু-বিজয় নীতি ডাইরেক্টর সভাও অনুমোদন করিলেন না। অবশ্য সেজন্য সিন্ধুদেশ আমীরদের ফিরাইয়া দিবার মতো উদারতা-প্রদর্শনেও তাঁহারা প্রস্তুত ছিলেন না।

লর্ড এলেনবরা ও গোয়ালিওর রাজ্য (Lord Ellenborough & Gwalior): এলেনবরার শাসনকালে গোয়ালিওর রাজ্যের সহিত ইংরাজদের এক তীব্র দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে জানকী সিন্ধিয়া অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হইলে গোয়ালিওর রাজ্যে এক দারুণ

গোয়ালিওর রাজ্যে অব্যবস্থা

অব্যবস্থা দেখা দেয়। এই অব্যবস্থার সুযোগ লইয়া সিন্ধিয়ার বিশাল সেনাবাহিনী প্রকৃত রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত করিয়া লইতে সমর্থ হয়। এদিকে শিখগণও এক বিশাল বাহিনীসহ ইংরাজদের সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে প্রায় প্রস্তুত ছিল। এমতাবস্থায় সিন্ধিয়ার সেনাবাহিনীর শিখদের সহিত যোগদান করিবার সম্ভাবনা স্বভাবতই লর্ড এলেনবরার অস্বস্তির কারণ হইয়া উঠিল। এলেনবরা ব্রিটিশ স্বার্থরক্ষার জন্য সেনাপতি সার্ হিউ গাফ্ (Sir Hugh Gough)-এর নেতৃত্বে এক বিরাট বাহিনীকে চম্বল নদীর অপর তীরে প্রেরণ করিলে

গোয়ালিওর রাজ্যের সেনাবাহিনী এলেনবরার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দিহান হইয়া যুদ্ধ শুরু করিল। কিন্তু মহারাজপুর ও পানিয়ার-এর যুদ্ধে গোয়ালিওর-এর সেনাবাহিনী ব্রিটিশ হস্তে পরাজিত হইলে এলেনবরা গোয়ালিওর রাজ্য কোম্পানির সাম্রাজ্যভুক্ত না করিলেও তথাকার শাসনব্যবস্থা একজন ব্রিটিশ রেসিডেন্টের নির্দেশানুক্রমে যাহাতে চলিতে পারে সেই ব্যবস্থা করিলেন।

মহারাজপুর ও পানিয়ার-এর যুদ্ধ—ব্রিটিশ জয়

এলেনবরার সংস্কার কার্যাদি (Ellenborough's Reforms): ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড এলেনবরা দাসপ্রথা বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করিলেন। লটারী দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিয়া উহা হইতে বোম্বাই, কলিকাতা ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর স্থানীয় উন্নতিবিধানের যে রীতি ছিল, তাহাও তিনি নিষিদ্ধ করিয়া দিলেন। তাঁহার আমলেই সর্বপ্রথম ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। দারোগাদের মাহিনা ও তাহাদের পদোন্নতির ব্যবস্থা করিয়া তিনি পুলিশ ব্যবস্থার উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন।

দাসপ্রথার উচ্ছেদ, লটারী নিষিদ্ধ, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ, পুলিশ ব্যবস্থার উন্নতিবিধান

লর্ড এলেনবরা স্বভাবতই উদ্ধত ছিলেন। তাঁহার যুদ্ধনীতি, ডাইরেক্টর সভার প্রতি অশ্রদ্ধা এবং সিভিল সার্ভিসের কর্মচারীদের প্রতি অবহেলা প্রভৃতি কারণে তাঁহাকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের আদেশ দেওয়া হইয়াছিল।

এলেনবরার প্রতি স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের আদেশ

রঞ্জিৎ সিংহ (Ranjit Singh): রঞ্জিৎ সিংহ ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম-গ্রহণ করেন এবং মাত্র বারো বৎসর বয়সে সুকারচুকিয়া 'মিস্‌ল'-এর নেতৃপদে অধিষ্ঠিত হন। সেই সময়ে পাঞ্জাব কয়েকটি সামন্ত রাজ্যে* বিভক্ত ছিল। এগুলিকে 'মিস্‌ল' বলা হইত। কানহেয়া মিস্‌ল, ভাঙ্গী মিস্‌ল, সুকারচুকিয়া মিস্‌ল—এই কয়েকটি সামন্ত রাজ্যই ছিল বিশেষ

* The Sikh *Misls* : The Bhangis, The Kanheyas, The Suker-chukias, The Nakkais, The Fyzulapurias, The Ahluwalias, The Dal-lewalas, The Ramgashias, The Nishanwallas, The Kavora Singhias, The Sahids and Nihangs and The Phulkias.—Dr. N. K. Sinha, *Ranjit Singh*, p. 2.

শক্তিশালী। কাবুলের জামান শাহ্ পাঞ্জাব আক্রমণ করিলে (১৭৯৮) রঞ্জিৎ সিংহ তাঁহাকে বাধা দান করেন। মুষ্টিমেয় অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া তিনি জামান শাহের শিবির পুনঃপুনঃ আক্রমণ দ্বারা তাঁহাকে উত্যক্ত করিয়া তুলিলে জামান শাহ্ রঞ্জিৎ সিংহের সহিত মিত্রতা স্থাপনে সচেষ্ট হইলেন। উভয়ের মধ্যে মিত্রতা স্থাপিত হইল। জামান শাহ্ রঞ্জিৎ সিংহকে 'রাজা' উপাধিতে ভূষিত করিলেন। জামান শাহ্ ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে লাহোর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে রঞ্জিৎ সিংহ লাহোর অধিকার করিয়া লইলেন। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে রঞ্জিৎ সিংহ জামান শাহ্ প্রদত্ত এক ফার্‌মানের বলে লাহোরের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। রঞ্জিৎ সিংহ কর্তৃক লাহোর অধিকারে জামান শাহের সমর্থন থাকিলেও এইরূপ কোন ফার্‌মান দেওয়া হইয়াছিল, একথা আধুনিক ঐতিহাসিকগণ কেহ কেহ স্বীকার করেন না।* জামান শাহ্ রঞ্জিৎ সিংহকে তাঁহার মিত্র বলিয়া মনে করিতেন, এই কারণে নিজাম-উদ্দিন কাসুর নামে জনৈক ব্যক্তি অমৃতসরের ভাঙ্গীদের সহিত সংঘবদ্ধ হইয়া জামান শাহ্‌কে বাৎসরিক পাঁচ লক্ষ টাকা করদানের শর্তে সমগ্র পাঞ্জাব অধিকার করিবার অনুমতি চাহিলে জামান শাহ্ উহা অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন। ইহার পর রঞ্জিৎ সিংহ জম্মু জয় করিতে অগ্রসর হইলেন। পথিমধ্যে তিনি মীরওয়াল ও নারওয়াল নামক দুইটি স্থান অধিকার করিলেন। জম্মুর রাজা ক্ষতিপূরণ হিসাবে নগদ কুড়ি হাজার টাকা দান করিয়া এবং রঞ্জিৎ সিংহের বশ্যতা স্বীকার করিয়া রক্ষা পাইলেন। ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে রঞ্জিৎ সিংহ অমৃতসর অধিকার করিয়া তাঁহার শক্তি ও মর্যাদা বহুগুণে বৃদ্ধি করিলেন। তারপর তিনি একে একে শতদ্রু নদীর পশ্চিমতীরস্থ শিখ মিস্‌লগুলি অধিকার করিয়া লইলেন। রঞ্জিৎ সিংহ সমগ্র শিখ জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া এক বৃহত্তর জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন। সুতরাং শতদ্রু নদীর পূর্বতীরস্থ শিখ মিস্‌লগুলি জয় করাও তাঁহার পক্ষে একান্ত প্রয়োজন ছিল। ঠিক সেই সময়ে শতদ্রু নদীর পূর্বতীরস্থ মিস্‌লগুলির

কাবুলের জামান শাহের সহিত রঞ্জিৎ সিংহের মিত্রতা

মীরওয়াল ও নারওয়াল অধিকার : জম্মুর আনুগত্য লাভ

অমৃতসর অধিকার (১৮০৫)

---

* Ibid p. 12.

নেতৃবর্গের মধ্যে এক দারুণ আত্মকলহ দেখা দিলে কেহ কেহ রঞ্জিৎ সিংহের

সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। রঞ্জিৎ সিংহ এই সুযোগে লুধিয়ানা অধিকার করিয়া লইলেন। এমতাবস্থায় শিখনেতৃবর্গ স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহারা রঞ্জিৎ সিংহের সাহায্য চাহিয়া অত্যন্ত ভুল করিয়াছেন। রঞ্জিৎ সিংহ সাহায্যকারী মিত্রহিসাবে আসিয়া নিজেই প্রভু সাজিয়া বসিয়াছেন।

অমৃতসরের সন্ধি
(১৮০৯)

এমতাবস্থায় শতদ্রু নদীর পূর্বতীরের মিস্‌লগুলির নেতৃগণ ইংরাজদের সাহায্য প্রার্থনা করিলে লর্ড মিণ্টো চার্লস্ মেট্‌কাফ্‌কে রঞ্জিৎ সিংহের সভায় প্রেরণ করিয়া তাঁহার সহিত এ-বিষয়ে মীমাংসা করিতে চাহিলেন। দীর্ঘকাল ধরিয়া উভয়পক্ষের মধ্যে আলাপ-আলোচনার পর ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে অমৃতসরের সন্ধির দ্বারা শতদ্রু নদী রঞ্জিৎ সিংহের রাজ্যের পূর্বদিকের সীমারেখা বলিয়া স্থিরীকৃত

হইল। শতদ্রু নদীর পূর্বতীরস্থ শিখ মিস্‌লগুলিতে রঞ্জিৎ সিংহ হস্তক্ষেপ করিবেন না এই প্রতিশ্রুতি দান করিলেন।

অমৃতসরের সন্ধির পর রঞ্জিৎ সিংহ পাঞ্জাবের পার্বত্য রাজ্যগুলি, কাশ্মীর, মুলতান, কোহাট, বান্নু, টঙ্ক, দেরা ইসমাইল খাঁ, দেরা গাজী খাঁ, পেশওয়ার প্রভৃতি স্থান জয় করিলেন। এইভাবে তাঁহার রাজ্য পাঞ্জাব হইতে খাইবার গিরিপথ এবং সিন্ধুদেশের সীমা পর্যন্ত বিস্তারলাভ করিল। হিদারুর-এর যুদ্ধে আফগানদের পরাজিত করিয়া তিনি এটক জয় করিলেন। কয়েক বৎসর পরে নওসেরা-এর যুদ্ধে তিনি আফগান আক্রমণ প্রতিহত করিয়া শতদ্রু নদীর বামতীরে নিজ অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিলেন। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে কাবুলের দোস্ত মোহম্মদ জামরুদ ও সার্ কাদের নামক দুইটি দুর্গ আক্রমণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু দুর্গ দুইটি শেষ পর্যন্ত দখল করিতে সমর্থ হন নাই।

রঞ্জিৎ সিংহের রাজ্য-বিস্তার

রঞ্জিৎ সিংহ কেবলমাত্র সমরবিজয়ী নেতা ছিলেন না, শাসনকার্যেও তাঁহার যথেষ্ট দক্ষতা ছিল। রাজ্যের নিরাপত্তা বিধান করাই ছিল তাঁহার নব-বিজিত রাজ্যের সর্বপ্রথম এবং সর্বপ্রধান প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে তিনি তাঁহার সেনাবাহিনীকে আধুনিক সামরিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। আফগানিস্তানের তদানীন্তন আমীর শাহ্ সুজার মৃত্যুর পর অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দিবে একথা তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন। আধুনিক যুদ্ধপদ্ধতিতে শিক্ষিত সেনাবাহিনীর সাহায্যে সেই সময়ে আফগানিস্তানে অধিকার-বিস্তার করাও অসম্ভব হইবে না, একথা মনে করিয়া তিনি ফরাসীসম্রাট নেপোলিয়ন বোনাপার্টির দুইজন প্রাক্তন সামরিক কর্মচারীকে নিজ সেনাবাহিনীর শিক্ষাদানের জন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার সেনাবাহিনী সামরিক দক্ষতায় যে-কোন ইওরোপীয় সেনাবাহিনীর সমতুল্য ছিল। শাসনব্যবস্থায়ও রঞ্জিৎ সিংহ যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। প্রচলিত রীতি-নীতির উপর নির্ভর করিয়া তিনি দেশ শাসন করিতেন।

তাঁহার শাসন ও সামরিক সংগঠন

ইংরাজগণ রঞ্জিৎ সিংহের মৈত্রীর মূল্য উপলব্ধি করিয়া তাঁহার সহিত প্রীতিপূর্ণ ব্যবহারে ত্রুটি করে নাই। কিন্তু সিন্ধু উপত্যকায় রঞ্জিৎ সিংহ রাজ্য-

বিস্তারে অগ্রসর হইলে ইংরাজগণ তাঁহাকে নিরস্ত করিয়াছিল। সেই সময়ে রুশ আক্রমণের ভয়ে ভীত ইংরাজগণ রঞ্জিৎ সিংহকে কোনভাবে অসন্তুষ্ট করিতে চাহিল না। লর্ড বেন্টিঙ্ক স্বয়ং রঞ্জিৎ সিংহের দরবারে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন। দোস্ত মোহম্মদ ইংরাজদের সহিত মিত্রতার বিনিময়ে রঞ্জিৎ সিংহ কর্তৃক অধিকৃত পেশওয়ার-প্রত্যর্পণ দাবী করিলে ইংরাজগণ সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল। ইহা হইতে তাহারা রঞ্জিৎ সিংহের সহিত মিত্রতার উপর কতদূর গুরুত্ব আরোপ করিত তাহা উপলব্ধি করা যায়। রঞ্জিৎ সিংহের জীবদ্দশায় ইংরাজদের সহিত তাঁহার মিত্রতা সম্পূর্ণভাবে বজায় ছিল। ইংরাজগণ শাহ্ সুজাকে আফগানিস্তানের আমীর-পদে স্থাপন ব্যাপারে রঞ্জিৎ সিংহের সাহায্য পাইয়াছিল।

ইংরাজদের সহিত মৈত্রী

তাঁহার কৃতিত্ব (His Estimate) : রঞ্জিৎ সিংহ একাধারে দুর্ধর্ষ সৈনিক, সুদক্ষ জননায়ক এবং গভীর জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ দেশপ্রেমিক ছিলেন। বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত শিখজাতিকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া তিনি এক বৃহৎ শিখশক্তি-গঠনে কৃতসংকল্প ছিলেন। শতদ্রু নদীর পূর্বতীরস্থ শিখ মিস্‌লগুলির নেতৃবর্গের বাধার ফলে এই বিষয়ে সাফল্যলাভ করিতে না পারিলেও তিনি শতদ্রু নদীর পশ্চিমতীরস্থ শিখ মিস্‌লগুলি জয় করিয়া ঐক্যবদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। নিজ প্রতিভা, সংগঠনী-শক্তি ও সামরিক দক্ষতার বলে তিনি অতি অল্প বয়সে সামান্য এক দলপতি হইতে ক্রমে শিখরাজ্যের রাজপদে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। দুর্ধর্ষ আফগান উপজাতিদের আক্রমণ হইতে নিজ রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত রক্ষা করিতে তিনি সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহার নব-প্রতিষ্ঠিত রাজ্যের শক্তিবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তিনি ইওরোপীয় পদ্ধতিতে তাঁহার বিশাল সেনাবাহিনীকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

সংগঠনী শক্তি ও সামরিক দক্ষতা

তাঁহার শাসনব্যবস্থা স্বৈরাচারী ছিল বটে, কিন্তু স্বেচ্ছাচারী ছিল না। প্রচলিত রীতি-নীতি মানিয়া চলিয়া তিনি শাসনকার্য পরিচালনা করিতেন। পরধর্ম-সহিষ্ণুতা ছিল তাঁহার শাসনব্যবস্থার মূলনীতি। জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে রাজকর্মচারিপদে নিযুক্ত করিয়া তিনি শাসনব্যবস্থায় দক্ষতা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন এবং নিজ মানসিক

পরধর্ম-সহিষ্ণুতা

উৎকর্ষেরও পরিচয় দিয়াছিলেন। রঞ্জিৎ সিংহ নিরক্ষর ছিলেন, কিন্তু তাঁহার অসাধারণ স্মৃতিশক্তি হায়দর আলির মতোই তাঁহারও শিক্ষার অভাবজনিত অসুবিধা বহুলাংশে হ্রাস করিয়াছিল। চার্লস্ মেট্‌কাফ্ রঞ্জিৎ সিংহের শাসনকার্যের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন। বিদেশী পর্যটক মাত্রেই রঞ্জিৎ সিংহের সমর-নিপুণতা ও শাসনকার্যে পারদর্শিতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। ফরাসী পর্যটক জ্যাকেমোঁ (Jaquemont) তাঁহাকে নেপোলিয়ন বোনাপার্টের ক্ষুদ্র সংস্করণ বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। দয়া, কোমলতা, বিজিতের প্রতি অনুকম্পা, সৌজন্য ও মর্যাদাপূর্ণ ব্যবহারের জন্য তিনি সকলের প্রশংসা অর্জন করিয়াছিলেন। জার্মান পর্যটক ফন্ হিতগেলও রঞ্জিৎ সিংহের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে রঞ্জিৎ সিংহের মৃত্যু হয়।

বিদেশী পর্যটকদের প্রশংসা

রঞ্জিৎ সিংহের উত্তরাধিকারিগণ (Successors of Ranjit Singh) : মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব হইতে রঞ্জিৎ সিংহের অসুস্থতাহেতু তাঁহার পুত্র খড়ক সিংহ শাসনকার্য পরিচালনা করিতেছিলেন। খড়ক সিংহ পিতার ন্যায় দক্ষতা বা দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন না। ফলে, রঞ্জিৎ সিংহের মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব হইতেই শিখরাজ্যে নানাপ্রকার গোলযোগের সূচনা হইল। রঞ্জিৎ সিংহের মৃত্যুর (১৮৩৯) পর ক্রমেই এই অব্যবস্থা বৃদ্ধি পাইয়া চলিল। খড়ক সিংহ অবশ্য পিতার মৃত্যুর এক বৎসরের মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। নৌ-নিহল সিংহ নামে খড়ক সিংহের পুত্রও আকস্মিকভাবে পিতার মৃত্যুর পরদিনই এক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারাইলেন। ফলে, রঞ্জিৎ সিংহের অপর এক পুত্র শের সিংহ সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। কিন্তু তিনিও ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে আততায়ীর হস্তে প্রাণ হারাইলেন। এইভাবে শিখরাজ্যে ক্রমেই অব্যবস্থা বাড়িয়া চলিলে শিখ সেনাবাহিনী—খাল্‌সা, রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত করিয়া লইল। রঞ্জিৎ সিংহের সর্বকনিষ্ঠ নাবালক পুত্র দলীপ সিংহকে সিংহাসনে স্থাপন করিয়া তাহারা নিজেরাই শাসনকার্য পরিচালনা করিতে লাগিল। রাজা লালসিংহ হইলেন ওয়াজীর বা মন্ত্রী এবং সর্দার তেজসিংহ হইলেন সেনাপতি। রাণীমাতা ঝিন্দন নামেমাত্রই দলীপ সিংহের অভিভাবিকা হইলেন।

পরবর্তী রাজগণের দুর্বলতা—খাল্‌সার প্রাধান্যলাভ

লর্ড হার্ডিঞ্জ*, ১৮৪৪-৪৮ (Lord Hardinge): লর্ড এলেনবরার পর লর্ড হার্ডিঞ্জ্ গবর্ণর-জেনারেল-পদে নিযুক্ত হইয়া আসিলেন। তিনি ছিলেন সামরিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সাহসী ব্যক্তি। শাসনভার গ্রহণের অল্পকালের মধ্যেই তাঁহাকে প্রথম শিখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে হইল। রাণীমাতা ঝিন্দন শিখ সেনাবাহিনীর ঔদ্ধত্য হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার একমাত্র পথ হিসাবে তাহাদিগকে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিতে সচেষ্ট হইলেন। তিনি স্পষ্টই উপলব্ধি করিলেন যে, ব্রিটিশ সৈন্যের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইলে শিখ সেনাবাহিনীর শক্তি যেমন হ্রাস পাইবে তেমনি যুদ্ধে জয়লাভ করিলে তাহাদিগকে পুনরায় ব্রিটিশ শক্তির সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে প্ররোচিত করা চলিবে। উভয় ক্ষেত্রেই শাসনব্যবস্থাকে সেনাবাহিনীর প্রভাবমুক্ত করা সম্ভব হইবে।

রাণীমাতা ঝিন্দনের কূটকৌশল

রাণী ঝিন্দনের প্ররোচনায় শিখ সেনাবাহিনী অমৃতসরের সন্ধির (১৮০৯) শর্ত ভঙ্গ করিয়া শতদ্রু নদীর পূর্বতীরে উপস্থিত হইল (১৮৪৫)। লর্ড হার্ডিঞ্জ্ স্বভাবতই শিখদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। মুদ্‌কী, ফিরোজশাহ্, আলিওয়াল এবং সুব্রাঁও—এই চারিটি যুদ্ধে শিখদের পরাজিত করিয়া ব্রিটিশ সৈন্য লাহোর অধিকার করিলে উভয়পক্ষের মধ্যে লাহোর-এর চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল। এই চুক্তির শর্তানুসারে শিখ-গণ শতদ্রু নদীর পূর্বতীরে অধিকৃত সকল স্থান ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ হিসাবে ব্রিটিশ পক্ষ পনর লক্ষ টাকা অথবা উহার পরিবর্তে নগদ পাঁচ লক্ষ টাকা ও কাশ্মীর রাজ্য দাবী করিলে শিখগণ শেষোক্ত শর্ত মানিয়া লইল। ইংরাজগণ গোলাব সিংহ নামে জম্মুর জনৈক ডোগ্‌রা দল-পতির নিকট দশ লক্ষ টাকায় কাশ্মীর রাজ্যটি বিক্রয় করিয়া দিল। শতদ্রু নদীর পশ্চিম তীরস্থ স্থানসমূহে শিখ অধিকার অক্ষুণ্ণ রহিল বটে, কিন্তু তাহাদিগকে একজন ব্রিটিশ রেসিডেন্ট এবং এক বৎসরের জন্য লাহোরে এক ব্রিটিশ বাহিনী রাখিতে স্বীকৃত হইতে হইল। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে এক নূতন চুক্তি দ্বারা আটজন শিখসর্দার লইয়া গঠিত এক অভিভাবক সভার হস্তে নাবালক রাজা দলীপ সিংহের পক্ষে শাসনকার্য

প্রথম শিখযুদ্ধ

লাহোরের সন্ধি

*সাধারণত Lord Hardinge 'লর্ড হাডিঞ্জ্' বলা হইয়া থাকে, কিন্তু শুদ্ধ উচ্চারণ হইল লর্ড হার্ডিং।

পরিচালনার ভার ন্যস্ত করা হইল। অবশ্য এই অভিভাবক সভাকে ব্রিটিশ রেসিডেন্টের নির্দেশ-অনুযায়ী চলিতে হইত। তদুপরি লাহোরে একদল ব্রিটিশ সৈন্য মোতায়েন ছিল এবং সেজন্য শিখগণ বাৎসরিক বাইশ লক্ষ টাকা খরচ বহন করিত। এইভাবে প্রথম শিখযুদ্ধে পাঞ্জাব সম্পূর্ণভাবে ব্রিটিশের প্রভাবাধীন হইয়া পড়িল।

লর্ড হার্ডিঞ্জ্-এর সংস্কারকার্যাদি (Lord Hardinge's Reforms) : শাসনভার গ্রহণ করিয়াই লর্ড হার্ডিঞ্জ্ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারকার্যে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে দেশীয় রাজগণের রাজ্যসীমার মধ্যে সতীদাহপ্রথা অবাধভাবে প্রচলিত ছিল। লর্ড বেন্টিঙ্কের 'সতীদাহপ্রথা নিবারণ আইন' কেবলমাত্র ব্রিটিশ অধিকৃত রাজ্যের মধ্যেই কার্যকরী ছিল। লর্ড হার্ডিঞ্জ্ দেশীয় রাজ্যে সতীদাহপ্রথা এবং শিশুহত্যা নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। ভারতীয় রেলপথ নির্মাণ-পরিকল্পনার প্রাথমিক কার্যাদি তিনিই শুরু করিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন গঙ্গার খাল-খনন, শিক্ষার প্রসার প্রভৃতি কার্যের পৃষ্ঠপোষকতাও তিনি করিয়াছিলেন। উড়িষ্যার পার্বত্য অঞ্চলে খোন্দ জাতির মধ্যে সেই সময়ে নরবলি প্রচলিত ছিল। হার্ডিঞ্জ্ এই বর্বরোচিত প্রথা নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন।

সতীদাহ, শিশুহত্যা ও নরবলি-নিবারণ, রেলপথ নির্মাণ, গঙ্গাখাল-খনন প্রভৃতি নানাবিধ কার্য

লর্ড ডালহৌসী, ১৮৪৮-৫৬ (Lord Dalhousie) : ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ইতিহাসে লর্ড ডালহৌসীর কার্যকাল এক অতি গুরুত্বপূর্ণ স্মরণীয় অধ্যায়। গবর্ণর-জেনারেল-পদে নিযুক্ত হইবার পূর্বে ডালহৌসী বোর্ড-অব-ট্রেড-এর সভাপতি হিসাবে ব্রিটিশ মন্ত্রিসভায় যোগদান করিয়াছিলেন। সেই সময়েই কঠোর শ্রমের ফলে তিনি ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া পড়েন। তদুপরি ভারতের গবর্ণর-জেনারেল-পদে নিযুক্ত হইবার পর দীর্ঘ আট বৎসর অক্লান্তভাবে কর্তব্য পালন করিতে গিয়া তিনি অকালমৃত্যু বরণ করিয়াছিলেন। লর্ড ডালহৌসী অনন্যসাধারণ সংগঠনী ও উদ্ভাবনী-শক্তির অধিকারী ছিলেন।

তাঁহার কর্তব্যনিষ্ঠা

ভারত-ইতিহাসে ডালহৌসী তাঁহার সাম্রাজ্যবাদী বিস্তার-নীতির জন্যই সমধিক প্রসিদ্ধ। তাঁহার অন্তরে প্রজার হিতসাধনের ইচ্ছা যে না ছিল, এমন নহে। ঘোর সাম্রাজ্যবাদী হইলেও

সাম্রাজ্য-বিস্তারের জন্য প্রসিদ্ধিলাভ

ভারতের ব্রিটিশ গবর্ণর-জেনারেলগণের মধ্যে ডালহৌসী ছিলেন যেমন কর্মনিষ্ঠ তেমনি কর্তব্যপরায়ণ।

সাম্রাজ্য-বিস্তার-নীতির তিনটি ভিন্ন ভিন্ন পন্থা

ডালহৌসীর সাম্রাজ্য-বিস্তার-নীতির তিনটি ভিন্ন ভিন্ন দিক ছিল, যথা, (১) যুদ্ধের দ্বারা রাজ্য-বিস্তার, (২) স্বত্ব-বিলোপ নীতির প্রয়োগ দ্বারা রাজ্যদখল ও (৩) অরাজকতার অভিযোগে দেশীয় রাজ্য অধিকার।

(১) যুদ্ধের দ্বারা রাজ্য-বিস্তার (Expansion through War of Annexation) : যুদ্ধের দ্বারা রাজ্য-বিস্তার-নীতির প্রয়োগ ডালহৌসী কর্তৃক পাঞ্জাব ও পেগু অধিকারে পরিলক্ষিত হয়। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড হার্ডিঞ্জ্ শিখদের সহিত যে চুক্তি স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, উহার ফলে পাঞ্জাবের নাবালক মহারাজা দলীপ সিংহ সম্পূর্ণভাবে ব্রিটিশ প্রভাবাধীন হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই ব্রিটিশপ্রভুত্ব শিখদের নিকট অসহনীয় হইয়া উঠিলে পাঞ্জাবে পুনরায় গোলযোগের সৃষ্টি হইল।

ব্রিটিশ প্রভাবাধীন পাঞ্জাব

দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধ (The Second Sikh War) : দেওয়ান মূলরাজ ছিলেন মূলতানের শাসনকর্তা। আইনতঃ পাঞ্জাবের মহারাজার অধীন হইলেও তিনি একপ্রকার স্বাধীনভাবেই রাজত্ব করিতেছিলেন। ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট-প্রভাবিত লাহোরের অভিভাবক সভা তাঁহাকে মূলতানের শাসন-সংক্রান্ত আয়-ব্যয়ের হিসাব দাখিল করিতে আদেশ করায় মূলরাজ শাসনকর্তাপদ ত্যাগ করিবেন বলিয়া জানাইলে তাঁহার স্থলে একজন নূতন শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হইল। লাহোরের ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট ভ্যান্স এগ্‌নিউ (Vans Agnew) ও এণ্ডারসন্ (Anderson) নামে দুইজন ইংরাজ কর্মচারীকে একদল সৈন্যসহ মূলতানের নব নিযুক্ত শাসনকর্তাকে নির্বিঘ্নে তাঁহার কর্মস্থলে স্থাপনের জন্য প্রেরণ করিলেন। মূলরাজ এই দুইজন ব্রিটিশ কর্মচারীকে হত্যা করাইয়া পুনরায় মূলতানে নিজ প্রভুত্ব স্থাপন করিলে (১৮৪৮, এপ্রিল) পাঞ্জাবের শিখ সৈন্যগণও বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। পেশওয়ার পুনরুদ্ধারের আশায় আফগান জাতিও এই বিদ্রোহে যোগদান করিল। তখন লর্ড ডালহৌসী যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। সেনাপতি লর্ড গাফ্ (Lord Gough) কুড়ি হাজার সৈন্য এবং একশত

দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধের কারণ

কামান সহ পাঞ্জাবের দিকে অগ্রসর হইলেন। বোম্বাই হইতে একদল সৈন্য আনাইয়া প্রয়োজনবোধে লর্ড গাফ্‌কে সাহায্য করিবার জন্য প্রস্তুত রাখা হইল। ইতিমধ্যে লেফ্‌টেনাণ্ট হারবার্ট এড্‌ওয়ার্ডস্ (Lieutenant Herbert Edwards) স্থানীয় লোক লইয়া গঠিত এক সেনাবাহিনী গঠন করিয়া মূলতান আক্রমণ করিলে, মূলরাজ মূলতানের দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। লাহোর হইতে ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট সার্ হেনরী লরেন্স শের্ সিংহের নেতৃত্বে একদল সৈন্য মূলরাজের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। শের্ সিংহ মূলরাজের পক্ষে যোগদান করিয়া ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন।

মূলতান অবরোধ

লর্ড গাফ্ প্রথমে শের্ সিংহের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন, কিন্তু রামনগরের নিকট তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াও পরাজিত করিতে পারিলেন না। অতঃপর ঝিলাম নদীর তীরে চিলিয়ানওয়ালায় শিখদের সহিত তাঁহার এক ভীষণ যুদ্ধ হইল (১৮৪৯)। যুদ্ধের প্রথম দিকে ব্রিটিশ সৈন্য সাময়িকভাবে সাফল্যলাভ করিলেও শেষদিকে শিখ সৈন্যের হস্তে সম্পূর্ণভাবে পর্যুদস্ত হইল। এক বিরাট সংখ্যক ব্রিটিশ সৈন্য এই যুদ্ধে হতাহত হইল। কিন্তু শিখবাহিনী এই সাফল্য শেষ পর্যন্ত বজায় রাখিতে পারিল না। একপ্রকার অমীমাংসিত অবস্থায়ই যুদ্ধের অবসান ঘটিল। ইহার অব্যবহিত পরেই ব্রিটিশ সৈন্য মূলতান অধিকার করিতে সমর্থ হইলে তথাকার ব্রিটিশ বাহিনীও লর্ড গাফ্-এর সৈন্যদের সহিত যোগদান করিল। তারপর চীনাব নদীর তীরে গুজরাট নামক এক শহরের উপকণ্ঠে লর্ড গাফ্ ও শিখদের মধ্যে যুদ্ধ হয় (১৮৪৯, ফেব্রুয়ারি)। এই যুদ্ধে শিখগণ সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হইয়া আফগানিস্তানের দিকে পলায়ন করিল। লর্ড গাফ্ চিলিয়ানওয়ালার যুদ্ধে পরাজয়ের অপমান গুজরাটের যুদ্ধে জয়লাভের দ্বারা দূর করিলেন। পেশওয়ার দখলে এবং শের্ সিংহের আত্ম-সমর্পণে দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধের অবসান ঘটিল।

চিলিয়ানওয়ালার যুদ্ধ (১৮৪৯)

গুজরাটের যুদ্ধ (১৮৪৯)

লর্ড ডালহৌসী কলিকাতা কাউন্সিল বা ইংলণ্ডস্থ কর্তৃপক্ষের মতামতের অপেক্ষা না করিয়াই সমগ্র পাঞ্জাব অধিকার করিয়া লইলেন। নাবালক মহারাজা দলীপ সিংহকে সিংহাসন-

পাঞ্জাব অধিকার

চ্যুত করিয়া সামান্য ভাতা (বাৎসরিক ৫০ হাজার পাউণ্ড) গ্রহণে বাধ্য করা হইল। শিখ খাল্‌সা সেনাবাহিনী ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইল এবং শিখজাতিকে সম্পূর্ণভাবে নিরস্ত্র করা হইল। পাঞ্জাব ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হওয়ার ফলে উত্তর-পশ্চিমদিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সীমা আফগানিস্তানের সীমা পর্যন্ত বিস্তারলাভ করিল।

ডালহৌসী জন লরেন্স, হারবার্ট লরেন্স, এডওয়ার্ডস্, রিচার্ড টেম্পল্, নিকোলসন প্রভৃতি অভিজ্ঞ ব্রিটিশ কর্মচারিগণের হস্তে পাঞ্জাবের শাসনকার্যের ভার অর্পণ করিলেন। পাঞ্জাব একজন চীফ্ কমিশনারের অধীনে স্থাপন করা হইল। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে এক সারি দুর্গ ও সেনানিবাস নির্মাণ করিয়া পাঞ্জাব তথা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত রক্ষার ব্যবস্থা করা হইল। দস্যুতা, দাসপ্রথা প্রভৃতি দমন করিয়া এবং কৃষির উন্নতি, খাল-খনন, রাস্তাঘাট প্রভৃতি নির্মাণ করিয়া পাঞ্জাবের আভ্যন্তরীণ শাসনে শৃঙ্খলা স্থাপিত হইতে পারে সেই ব্যবস্থাও ডালহৌসী করিলেন। গ্রামে গ্রামে স্কুল স্থাপন করিয়া এবং বিচার-ব্যবস্থার উন্নতিসাধন করিয়া জনসাধারণকে শান্তি-পূর্ণভাবে জীবনযাপনে উৎসাহিত করা হইল। ব্রিটিশ শাসনাধীনে পাঞ্জাবে যে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপিত হইয়াছিল তাহার ফলে কৃতজ্ঞতাবদ্ধ শিখজাতি দ্বিতীয় ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধে ও ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের সিপাহী-বিদ্রোহ দমনে ব্রিটিশদের সাহায্য দান করিয়াছিল।

আভ্যন্তরীণ শাসনের উন্নতি : সীমান্ত রক্ষার ব্যবস্থা

দ্বিতীয় ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধ (The Second Anglo-Burmese War) : প্রথম ব্রহ্ম যুদ্ধের (১৮২৬) পর ব্রহ্মদেশে একজন ব্রিটিশ রেসিডেন্ট স্থাপনের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। বর্মীগণ ব্রিটিশদের প্রতি স্বভাবতই বিদ্বেষভাবাপন্ন ছিল। তাহারা ভারতের ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ তথা ব্রিটিশ রেসিডেন্টের প্রতি প্রকাশ্যভাবে ঘৃণা প্রদর্শন করিতে শুরু করিলে ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ রেসিডেন্টকে ব্রহ্মদেশ পরিত্যাগ করিতে আদেশ দেওয়া হইয়াছিল। কয়েক বৎসর পরে (১৮৫১) কয়েকজন ব্রিটিশ বণিক বর্মীদের হস্তে লাঞ্ছিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইলে সেই সংবাদ লর্ড ডালহৌসীর নিকট পৌঁছিবামাত্র তিনি সেইজন্য উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দাবী করিলেন। ব্রহ্ম সরকারের নিকট ক্ষতিপূরণ দাবী করিতে গিয়া কমোডোর

দ্বিতীয় ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধের কারণ

ল্যাম্বার্ট (Commodore Lambert) ব্রহ্ম সরকারের একটি জাহাজ দখল করিয়া লইলেন। এই সূত্রে বর্মীসৈন্য কমোডোর ল্যাম্বার্টের জাহাজের উপর গুলি বর্ষণ করিলে দ্বিতীয় ব্রহ্মযুদ্ধের সূত্রপাত হইল। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে ১৪ই এপ্রিল রেঙ্গুন ব্রিটিশ বাহিনী কর্তৃক অধিকৃত হইল। সেই বৎসরই অক্টোবর মাসে জেনারেল গড্উইন (General Godwin) প্রোম দখল করিলেন। ব্রহ্মরাজ ব্রিটিশের সহিত সন্ধিস্থাপনে অস্বীকৃত হইলে লর্ড ডালহৌসী সমগ্র পেগু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত বলিয়া ঘোষণা করিলেন। এইভাবে ব্রহ্মদেশের উপকূল অঞ্চল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হওয়ায় চট্টগ্রাম হইতে সিঙ্গাপুর পর্যন্ত সমগ্র উপকূল অঞ্চল যেমন ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত হইল তেমনি ব্রহ্মদেশ সমুদ্রের সহিত সংযোগ-পথের জন্য ব্রিটিশের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হইয়া পড়িল।

পেগু অধিকার

সিকিম রাজ্যের একাংশ অধিকার (Occupation of a part of Sikkim) : কোম্পানির সাম্রাজ্যের উত্তরে অবস্থিত নেপাল ও ভুটানের মধ্যবর্তী ক্ষুদ্র সিকিম রাজ্যের রাজা ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ডক্টর ক্যাম্পবেল (Dr. Campbell) নামে জনৈক ইংরাজ কর্মচারী ও ডক্টর হুকার (Dr. Hooker) নামে অপর একজন ইংরাজকে বন্দী করিলে লর্ড ডালহৌসী সিকিম রাজ্যের এক ক্ষুদ্র অংশ অধিকার করিয়া উহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়াছিলেন (১৮৫০)।

সিকিমের একাংশ অধিকার

(২) স্বত্ব-বিলোপ নীতির প্রয়োগ দ্বারা রাজ্যদখল (Annexation by the Doctrine of Lapse) : লর্ড ডালহৌসী ছিলেন ঘোর সাম্রাজ্যবাদী। যেন-তেন-প্রকারেণ ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-বিস্তার তিনি তাঁহার ভারত-শাসনের মূল-নীতি বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলেন। যুদ্ধের দ্বারা সাম্রাজ্য-বিস্তার ভিন্ন তাঁহার 'স্বত্ব-বিলোপ নীতি'র প্রয়োগ দ্বারাও রাজ্য-বিস্তারে তিনি কম সাফল্যলাভ করেন নাই। বস্তুত, তিনি সর্বাধিক সংখ্যক রাজ্য এই নীতির প্রয়োগ দ্বারা-ই অধিকার করিয়াছিলেন। 'স্বত্ব-বিলোপ নীতি'র মূল কথা হইল এই যে, ব্রিটিশের অধীন অথবা ব্রিটিশ-শক্তি কর্তৃক সৃষ্ট কোন দেশীয় রাজ্যের রাজবংশের কোন উত্তরাধিকারী না থাকিলেও সেই রাজ্য সরাসরি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়া পড়িবে। কোন

স্বত্ব-বিলোপ নীতি

দত্তকপুত্রকে এই সকল রাজ্যের উত্তরাধিকার দেওয়া চলিবে না। ব্রিটিশ সরকারের 'বিশেষ অনুমতি' দান বন্ধ করিয়া দেশীয় রাজগণের দত্তকপুত্র গ্রহণের অধিকার লর্ড ডালহৌসী বস্তুত অস্বীকার করিলেন। ঘটনাচক্রে এমনই হইল যে, ডালহৌসীর আমলেই কয়েকটি দেশীয় রাজ্যের রাজগণের অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যু হইল। ডালহৌসী তাঁহার স্বত্ব-বিলোপ নীতির প্রয়োগ দ্বারা এই সকল রাজ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া লইলেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, স্বত্ব-বিলোপ নীতি লর্ড ডালহৌসী কর্তৃক উদ্ভাবিত নহে। ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে ডাইরেক্টর সভা (Court of Directors) কোম্পানির অধীন দেশীয় রাজ্যগুলির রাজগণকে দত্তকপুত্র গ্রহণের অনুমতি যেন সহজে না দেওয়া হয় সেই নির্দেশ প্রেরণ করিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর পরে (১৮৪১) ডাইরেক্টর সভা আদেশ করিলেন যে, সম্মানজনক এবং ন্যায্য পন্থায় কোম্পানি যে-কোন সম্পত্তি ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত করিবার চেষ্টায় ত্রুটি যেন না করে। ইহা হইতেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, কুখ্যাত 'স্বত্ব-বিলোপ নীতি' লর্ড ডালহৌসীর নামের সহিত জড়িত থাকিলেও বস্তুত তিনি এই নীতির উদ্ভাবন করেন নাই। পূর্ববর্তী গবর্ণর-জেনারেলগণ যেস্থলে এই নীতির প্রয়োগ করা সঙ্গত মনে করেন নাই অথবা এই নীতি কার্যকরী করা যুক্তিসঙ্গত মনে করেন নাই, সেই স্থলে লর্ড ডালহৌসী উহার ব্যাপক প্রয়োগ করিয়া এই কু-খ্যাত নীতির সহিত নিজ নামকে জড়িত করিয়াছিলেন। ডালহৌসী যেখানে স্বত্ব-বিলোপ নীতি কার্যকরা করিবার সামান্য অজুহাত পাইয়াছিলেন সেখানেই উহার প্রয়োগ, এমন কি অপ-প্রয়োগ করিয়াছিলেন। ভারতীয়দের চিরা-চরিত রীতি-নীতি, তাহাদের মনোভাব, তাহাদের ন্যায্য-অধিকার—সব কিছু উপেক্ষা করিয়া লর্ড ডালহৌসী তাঁহার এই নীতি কার্যকরী করিয়াছিলেন।

স্বত্ব-বিলোপ নীতি লর্ড ডালহৌসী কর্তৃক উদ্ভাবিত নহে

ডালহৌসী কর্তৃক স্বত্ব-বিলোপ নীতির ব্যাপক প্রয়োগ

স্বত্ব-বিলোপ নীতি সর্বপ্রথমেই সাতারা রাজ্যটির উপর প্রয়োগ করা হইল। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে সাতারা রাজ্যটি কোম্পানি কর্তৃক-ই সৃষ্ট হইয়াছিল। সাতারার রাজা অপুত্রক অবস্থায় মারা যাইবার পূর্বে এক দত্তকপুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে

সাতারা অধিকার

রাজার মৃত্যু হইলে কোম্পানির অনুমতি না লইয়া সেই দত্তকপুত্র গ্রহণ অবৈধ ঘোষণা করা হইল এবং সাতারা রাজ্যটি বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করা হইল। ডাইরেক্টর সভা এবিষয়ে লর্ড ডালহৌসীকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করিলেন।*
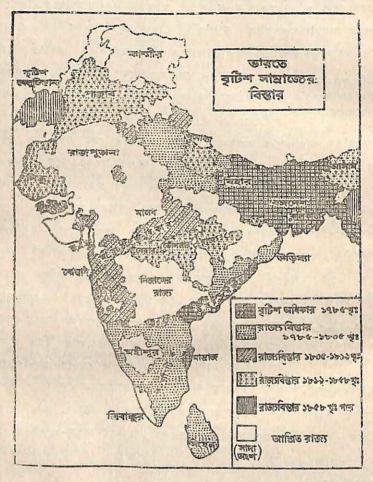
সাতারা রাজ্যের পর আসিল সম্বলপুরের পালা। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে সম্বলপুরের

---

* "We are fully satisfied that by the general law and custom of India a dependent principality like that of Satara, cannot pass to an adopted heir without the consent of the paramount Power."—*Court of Directors to Gov. Genl.* Vide Smith, p. 704.

রাজার অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যু হইলে লর্ড ডালহৌসী সম্বলপুর অধিকার করিয়া লইলেন। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ভোঁসলে বংশের শেষ রাজা অপুত্রক অবস্থায় মারা গেলে লর্ড ডালহৌসী নাগপুর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া লইলেন। নাগপুর কোম্পানি কর্তৃক সৃষ্ট রাজ্য ছিল না। তথাপি সাতারা রাজ্যে যে নীতি প্রয়োগ করা হইয়াছিল ঠিক অনুরূপ নীতির প্রয়োগের দ্বারা নাগপুরও দখল করা হইয়াছিল। কলিকাতা ও বোম্বাই, বোম্বাই ও মাদ্রাজের মধ্যস্থলে অবস্থিত নাগপুর রাজ্যের রাজনৈতিক গুরুত্ব সাম্রাজ্যবাদী লর্ড ডালহৌসীর দৃষ্টি এড়ায় নাই। সাম্রাজ্যবাদী বিস্তার-নীতিই ছিল নাগপুর অধিকারের মূল কথা।

সম্বলপুর (১৮৫০)
নাগপুর (১৮৫৩)

সেই বৎসরেই (১৮৫৩) ঝাঁসির রাজার মৃত্যু ঘটিলে তাঁহার দত্তকপুত্রের দাবী অস্বীকার করিয়া ঝাঁসি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করা হইল। অনুরূপ পরিস্থিতিতে ভগৎ, উদয়পুর, জৈৎপুর, কারাউলি প্রভৃতি রাজ্য লর্ড ডালহৌসী কোম্পানির অধিকারভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। ভগৎ ও উদয়পুর রাজ্য দুইটি অবশ্য পরবর্তী গবর্ণর-জেনারেল লর্ড ক্যানিং রাজ্য দুইটির উত্তরাধিকারীকে ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। কারাউলি রাজ্যের ক্ষেত্রে স্বত্ব-বিলোপ নীতির প্রয়োগ অবৈধ বিবেচনা করিয়া এই রাজ্যটিও ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। কারাউলি ছিল ব্রিটিশের রক্ষণাধীন মিত্ররাজ্য (Protected ally)।

ঝাঁসি, ভগৎ, উদয়পুর, জৈৎপুর, কারাউলি

ভগৎ, উদয়পুর ও কারাউলি প্রত্যর্পণ

ডালহৌসী তাঁহার কু-খ্যাত স্বত্ব-বিলোপ নীতির প্রয়োগ দ্বারা পেশওয়া দ্বিতীয় বাজীরাও-এর দত্তকপুত্র ধন্ধুপন্থের ভাতা বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। ধন্ধুপন্থ-ই ইতিহাসে নানাসাহেব নামে পরিচিত।

নানাসাহেবের ভাতা বন্ধ

কর্ণাট ও তাঞ্জোর রাজ্য দুইটি লর্ড ওয়েলেস্‌লী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু ঐ দুই রাজ্যের রাজগণকে ভাতা দানের ব্যবস্থা তিনি করিয়াছিলেন। লর্ড ডালহৌসী তাঞ্জোর ও কর্ণাটের রাজপরিবারের বংশধরগণের ভাতা বন্ধ করিয়া ব্রিটিশ সরকারের পূর্ব-প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিতে দ্বিধাবোধ করিলেন না।

তাঞ্জোর ও কর্ণাটের রাজপরিবারের ভাতা বন্ধ

(৩) অরাজকতার অভিযোগে দেশীয় রাজ্য অধিকার (Annexation of native states on grounds of Misgovernment) : লর্ড ডালহৌসী তাঁহার তৃতীয় নীতি অনুসারে অরাজকতার অভিযোগে ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে অযোধ্যা রাজ্যটি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করিলেন। এই অরাজকতা বা অব্যবস্থার সূচনা করিয়াছিলেন লর্ড ওয়েলেস্‌লী। তাঁহার প্রবর্তিত অধীনতামূলক মিত্রতার নীতি প্রয়োগের অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবেই যে অরাজকতা দেখা দিয়াছিল লর্ড ডালহৌসী সে বিষয়ে মোটেই ভাবিলেন না। ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণাধীন এবং ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর উপর নির্ভরশীল অযোধ্যার নবাব স্বভাবতই শাসনকার্যে শৃঙ্খলা বজায় রখিতে পারেন নাই। অথচ এই অভিযোগেই লর্ড ডালহৌসীর আমলে ডাইরেক্টর সভার নির্দেশ অনুসারে অযোধ্যা রাজ্য কোম্পানির অধিকারভুক্ত করা হইয়াছিল।

অযোধ্যা (১৮৫৬)

ঠিক অরাজকতার কারণে না হইলেও কোম্পানির সেনাবাহিনী মোতায়েন রাখিবার খরচ বাবদ প্রাপ্য অর্থ দিতে হায়দ্রাবাদের নিজাম অক্ষম হইলে বেরার প্রদেশটি তাঁহার নিকট হইতে লইয়া ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত করা হইয়াছিল।

বেরার

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের জন্য লর্ড ডালহৌসীর দায়িত্ব (Dalhousie's responsibility for the Revolt of 1857) : ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের জন্য লর্ড ডালহৌসী যে যথেষ্ট পরিমাণে দায়ী ছিলেন নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক মাত্রেই একথা স্বীকার করিয়া থাকেন। ডালহৌসী ছিলেন ঘোর সাম্রাজ্যবাদী। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-বিস্তারে তিনি কোনপ্রকার নৈতিকতা বা রাজনৈতিক দূরদর্শিতার কথা বিবেচনা করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। স্বত্ব-বিলোপ নীতির উদ্ভাবন করিয়াছিলেন ইংলণ্ডস্থ কোম্পানির ডাইরেক্টর সভা। কিন্তু ডালহৌসীর পূর্ববর্তী গবর্ণর-জেনারেলগণ ভারতীয়দের চিরাচরিত রীতি-নীতি ও স্ব স্ব রাজনৈতিক বিচার-বুদ্ধি দ্বারা কতক পরিমাণে পরিচালিত হইয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহারা ডাইরেক্টর সভার নির্দেশ সত্ত্বেও যথেচ্ছভাবে দেশীয় রাজগণের অধিকারনাশে সাহসী হন নাই। কিন্তু লর্ড ডালহৌসীর নিকট ভারতীয়দের রীতি-নীতি, বা তাহাদের সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টির

কোন প্রশ্নই ছিল না। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, দেশীয় রাজ্যগুলিকে যতই ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত করা যাইবে ততই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি যেমন ঘটিবে, তেমনি দেশীয় রাজগণের প্রজাবর্গ ইংরাজ শাসনের সুফল ভোগ করিতে পারিবে। এই ধারণার বশবর্তী হইয়া তিনি সাতারা ও নাগপুর রাজ্য দুইটি অধিকার করেন এবং নানাসাহেবের ভাতা বন্ধ করেন। এইভাবে মারাঠা রাজ্যপঞ্চকের মধ্যে তিনটির-ই তিনি অবসান ঘটাইলেন। তাঞ্জোর ও কর্ণাটের রাজপরিবারের ভাতাও তিনি বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাতেই তাঁহার সাম্রাজ্য-বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা মিটিল না। তিনি অযোধ্যা রাজ্যটিও অরাজকতার অজুহাতে অধিকার করিয়া লইলেন। এমন কি তিনি দিল্লীর সম্রাটের উপাধি নাকচ করিয়া দিয়া ব্রিটিশ সরকারকে ভারতের সার্বভৌম শক্তিতে পরিণত করিতে চাহিয়াছিলেন। কেবলমাত্র ডাইরেক্টর সভার অনুমোদন না পাওয়াতে ইহা তিনি কার্যে পরিণত করিতে পারেন নাই।

ভারতীয়দের চিরাচরিত রীতি-নীতির উপেক্ষা

ডালহৌসীর স্বত্ব-বিলোপ নীতি প্রয়োগের অ-নৈতিকতা এবং নাগপুর ও অযোধ্যা রাজ্য অধিকারকালে তাঁহার নীচ স্বার্থপরতা ও অত্যাচার ভারত-বাসীদের মনে ব্রিটিশদের প্রতি এক ব্যাপক ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করিয়া-ছিল। নাগপুরের রাজপ্রাসাদ অবরোধ করিয়া গরু, ঘোড়া, হাতী হইতে আরম্ভ করিয়া আসবাবপত্র ও মণি-মুক্তা লুণ্ঠন করিতে ইংরাজগণ দ্বিধাবোধ করে নাই। অশীতি বৎসরের বৃদ্ধা রাণীমাতার আপত্তি সত্ত্বেও ইংরাজ-গণ প্রাসাদ হইতে আসবাবপত্র সরাইয়া লইতে লজ্জাবোধ করে নাই। এই সকল আসবাবপত্র ও মণিমুক্তা বিক্রয়ের জন্য কলিকাতায় প্রেরণ করা হইয়া-ছিল। নাগপুর রাজ্য অধিকার অপেক্ষা রাজপ্রাসাদ-লুণ্ঠন প্রতিবেশী রাজ্য-গুলির মধ্যে এক দারুণ বিক্ষোভের সৃষ্টি করিয়াছিল।*

অ-নৈতিকতা, অত্যাচার, নাগপুরের রাজপ্রাসাদ লুণ্ঠন

অযোধ্যা রাজ্য অধিকারের সময়ও নাগপুর রাজ্য অধিকারকালের

---

* Vide Sir John William Kaye's *A History of the Sepoy War in India*, Vol. I, pp. 83-84. also see R. C. Majumdar's *The Sepoy Mutiny & Revolt of 1857* p. 8.

বর্বরতার পুনরাবৃত্তি ঘটিল। নবাবপরিবারকে রাস্তায় বাহির করিয়া দিয়া নবাবের কোষাগারের দরজা ভাঙ্গিয়া যাবতীয় ধনরত্ন লুণ্ঠন করা হইয়াছিল। ইহাতে অযোধ্যার নবাবকে তাঁহারই প্রজাবর্গের নিকট হেয় প্রতিপন্ন করা হইয়াছিল। কিন্তু এই আচরণ ব্রিটিশ জাতি ও ব্রিটিশ মর্যাদায় কলঙ্ক লেপন করিয়াছিল সন্দেহ নাই।*

অযোধ্যার নবাব-পরিবারের প্রতি বর্বরোচিত আচরণ

ডালহৌসীর উপরি-উক্ত কার্যকলাপ ভারতবর্ষের সর্বত্র দেশীয় রাজগণের মনে এক দারুণ সন্দেহের সৃষ্টি করিয়াছিল। তাঁহাদের মনে এই কথাই উদিত হইল যে, নাগপুর বা অযোধ্যার ন্যায় ব্রিটিশের সমর্থক দেশীয় রাজ্যগুলির প্রতি যখন ব্রিটিশগণ এইরূপ ব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই, তখন অপরাপর রাজ্যের প্রতি তাহারা না জানি কি করিবে।†

ঝাঁসিরাজ্য দখল এবং নানাসাহেবের ভাতা বন্ধ করিয়াও ডালহৌসী ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের পথ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। লর্ড ডালহৌসীর ভারতবর্ষ পরিত্যাগের পূর্বে বিদ্রোহ শুরু না হইলেও তাঁহার সাম্রাজ্যবাদী নীতির কঠোর প্রয়োগ ও অপরাপর নানাবিধ কারণে বিদ্রোহের ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়া রহিল। এই বিদ্রোহের জন্য ডালহৌসী যে যথেষ্ট পরিমাণে দায়ী ছিলেন, ইহা অনস্বীকার্য।

---

* Ibid, Vol. I, pp. 404-5, also see Majumdar, p. 12, S. N. Sen's *Eighteen Fifty Seven*, pp. 38-39.

† Kaye, Vol. I, p. 152, also see Majumdar, p. 14, also vide S. N. Sen, p. 39.

নবম অধ্যায়
লর্ড ক্যানিং ঃ ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ
(Lord Canning : Revolt of 1857)

লর্ড ক্যানিং, ১৮৫৬-৬২ (Lord Canning) : লর্ড ক্যানিং ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে ভারতের গবর্ণর-জেনারেল নিযুক্ত হইয়া আসিলেন। তিনি ছিলেন ভূতপূর্ব ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী লর্ড ক্যানিং-এর পুত্র। ভারতবর্ষে আসিবার পূর্বে তিনি কিছুকাল ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে ও ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার সদস্য হিসাবে রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা-সঞ্চয়ের সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার শাসনকালের সর্বপ্রধান ঘটনা হইল ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ।

পূর্ব-অভিজ্ঞতা

লর্ড ক্যানিং যে বৎসর গবর্ণর-জেনারেল হিসাবে ভারতের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন সেই বৎসর রাশিয়ার গ্রাস হইতে তুরস্ককে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে ইংলণ্ড ক্রিমিয়ার যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিল। তদুপরি ব্রিটিশ বণিক সম্প্রদায়ের ঔদ্ধত্য ও অত্যাচারে পর বৎসর (১৮৫৭) চীন দেশেও এক ইঙ্গ-চীন যুদ্ধের সৃষ্টি হইয়াছিল। লর্ড পামারস্টোনের রুশভীতি এবং তুরস্কের নিরাপত্তা-রক্ষা নীতি লর্ড ক্যানিং-এর পররাষ্ট্র-নীতিকে প্রভাবিত করিয়াছিল।

ক্রিমিয়ার যুদ্ধ ঃ চীনা যুদ্ধ

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে পারস্য হিরাট দখল করিয়া লইলে ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা অত্যন্ত ভীত হইলেন। পারস্য সমগ্র আফগানিস্তান গ্রাস করিয়া ব্রিটিশ নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ করিতে পারে এই আশঙ্কা করিয়া ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার নির্দেশে লর্ড ক্যানিং পারস্য উপসাগর অঞ্চলে এক সামরিক অভিযান প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই অভিযান অবশ্য আশাতীতভাবে সাফল্যলাভ করিয়াছিল। ইংরাজগণ বুশায়ার অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিল। পর পর কয়েকটি যুদ্ধে পরাজয়ের পর পারস্যের সেনাবাহিনী হিরাট ত্যাগ করিতে বাধ্য

লর্ড ক্যানিং কর্তৃক পারস্যের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান প্রেরণ

হইয়াছিল, তদুপরি ভবিষ্যতে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক নীতি অনুসরণ করিবে না বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল। কিন্তু ইহার অব্যবহিত পরেই ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে এক ব্যাপক অভ্যুত্থান ভারতে ব্রিটিশ শক্তির ভিত্তি কাঁপাইয়া তুলিয়াছিল।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ (Revolt of 1857): ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে যে বিদ্রোহ দেখা দিয়াছিল উহার প্রকৃতি সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ পরস্পর-বিরোধী মত পোষণ করেন। প্রধানত দুইটি মতের পরিপ্রেক্ষিতেই এই বিদ্রোহের প্রকৃতি বিচার করা সমীচীন হইবে। কাহারো কাহারো মতে এবং ব্রিটিশ ঐতিহাসিক ও লেখকদের অধিকাংশের মতে—১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ ছিল সিপাহীদের বিদ্রোহ। এই কারণে তাঁহারা ইহাকে "সিপাহী বিদ্রোহ" নামকরণ করিয়াছেন। পক্ষান্তরে কাহারো কাহারো—বিশেষত ভারতীয় ঐতিহাসিক ও লেখকগণের মতে ইহা ছিল ব্রিটিশ প্রভুত্বের অবসানকল্পে সর্ব-প্রথম জাতীয় সংগ্রাম। এই উভয় মতেরই সপক্ষে এবং বিপক্ষে এত সব যুক্তি প্রদর্শন করা হইয়াছে যে, ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহকে 'সিপাহী বিদ্রোহ' বলা যেমন অনুচিত তেমনি 'জাতীয় সংগ্রাম' বলাও যুক্তিযুক্ত হইবে না। এই কারণে ইহাকে এই পুস্তকে '১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ' বলিয়া অভিহিত করা হইল।

সিপাহী বিদ্রোহ বা জাতীয় সংগ্রাম?

কারণ (Causes): ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের নানাবিধ কারণকে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সামরিক ও ধর্ম-নৈতিক এই কয়টি ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ে ভাগ করিয়া আলোচনা করাই সুবিধাজনক হইবে।

রাজনৈতিক, সামাজিক অর্থনৈতিক, সামরিক ও ধর্মনৈতিক কারণ

রাজনৈতিক কারণের মধ্যে লর্ড ডালহৌসির স্বত্ব-বিলোপ নীতির প্রয়োগ দ্বারা সাতারা, সম্বলপুর, নাগপুর, ঝাঁসি প্রভৃতি অধিকার এবং নানাসাহেবের ভাতা বন্ধ করা বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। ইহা ভিন্ন তাঞ্জোর ও কর্ণাটেরও রাজপরিবারের ভাতা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। অযোধ্যা রাজ্যটি কু-শাসনের অজুহাতে অধিকার করিয়া লওয়া হইয়াছিল। কিন্তু এই সকল রাজ্য অধিকার করিবার অ-নৈতিকতার প্রশ্ন বাদ দিলেও যে অত্যাচার ও অমানুষিকতার সহিত নাগপুরের রাজপ্রাসাদ এবং অযোধ্যার

(১) রাজনৈতিক:

(ক) স্বত্ব-বিলোপ নীতির প্রয়োগ

নবাবের প্রাসাদ লুণ্ঠন করা হইয়াছিল তাহা তদানীন্তন ভারতের দেশীয় রাজগণের মধ্যে এক দারুণ বিক্ষোভ ও সন্দেহের সৃষ্টি করিয়াছিল। বলপূর্বক নাগপুর প্রাসাদের গরু, ঘোড়া, হাতী, মণিমুক্তা ও আসবাবপত্র লইয়া গিয়া নামমাত্র মূল্যে বিক্রয় করিবার পশ্চাতে ব্রিটিশ স্বার্থপরতার অতি নীচ প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। অযোধ্যার নবাবের প্রাসাদ হইতে নবাব পরিবারের কন্যাদের পর্যন্ত বাহির করিয়া দিয়া বলপূর্বক নবাবের কোষাগার লুণ্ঠনও একই দোষে দুষ্ট ছিল। এই অত্যাচারী নীতি সমগ্র ভারতে এক ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাবের সৃষ্টি করিয়াছিল। ব্রিটিশ প্রতিশ্রুতির এবং ব্রিটিশের প্রতি আনুগত্যের কোন মূল্য নাই, দেশীয় রাজগণ ও জমিদার শ্রেণীর নিকট এই কথাই প্রকট হইয়া উঠিয়াছিল।*

(খ) নাগপুর ও অযোধ্যার রাজপ্রাসাদ লুণ্ঠন

অযোধ্যার নবাবের আর্থিক সাহায্যের উপর নবাব পরিবারের সহিত সম্পর্কিত বহুসংখ্যক পুরুষ ও মহিলা নির্ভরশীল ছিলেন। দেশীয় শাসন-ব্যবস্থার এই চিরাচরিত রীতি কেবল অযোধ্যায় নহে দেশের অন্যান্য অংশেও প্রচলিত ছিল। কিন্তু ব্রিটিশ অধিকারের পর অযোধ্যায় এইরূপ বহু পরিবার অর্থসাহায্যের অভাবে অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। অলঙ্কারপত্র এবং অপরাপর সামগ্রী বিক্রয় করিয়া তাহাদিগকে দিনযাপন করিতে হইয়াছিল। ব্রিটিশ সরকার অবশ্য শেষ পর্যন্ত এই সকল পরিবারের ভাতার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু উহা কার্যকরী হইবার পূর্বেই বহু সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলাদের পর্যন্ত রাত্রিতে অপরের নিকট খাদ্যদ্রব্য ভিক্ষা করিতে হইয়াছিল।† এইরূপ অবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া জনসাধারণের মনে

(গ) অযোধ্যার নবাবের আশ্রিত পরিবারবর্গের দুর্দশা—জনসাধারণের মধ্যে বিদ্বেষ

* "The rules of native states, all over India, must have asked themselves the question who could be safe, if the British thus treated one 'who had ever been their most faithful ally' ". Vide Majumdar, p. 14.

† "Families which had never before been outside the *Zenana* used to go out at night and beg their bread." Kaye, Vol. I. p. 420. footnote, also see Majumdar, p. 13.

স্বভাবতই দেখা দিবে তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই। ইহা ভিন্ন অযোধ্যায় যে নূতন রাজস্ব-নীতির প্রচলন করা হইয়াছিল, তাহার ফলে অসংখ্য তালুকদার তাঁহাদের জমিদারিচ্যুত হইয়াছিলেন। তদুপরি তাঁহাদের অনুচরবাহিনী ও দুর্গাদি ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। অযোধ্যার চিরা-চরিত বিচার-ব্যবস্থার স্থলে নূতন বিচার-ব্যবস্থা চালু করা হইয়াছিল। কিন্তু ইহা ছিল ব্যয়বহুল এবং সময়সাপেক্ষ। ফলে, জনসাধারণের মনে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে অসন্তোষের মাত্রা আরও বৃদ্ধি পাইয়া-ছিল। কোভারলি জ্যাক্‌সন্ (Coverly Jackson) ও গাব্‌বিনস্ (Mr. Gubbins)-এর ন্যায় উদ্ধত প্রকৃতির ব্রিটিশ-কর্মচারিগণ জনসাধারণের মনে ব্রিটিশের প্রতি বিদ্বেষ ও বিতৃষ্ণা বহুগুণে বাড়াইয়া দিয়াছিলেন।

(ঘ) অযোধ্যায় প্রবর্তিত নূতন রাজস্ব-নীতি ও বিচারব্যবস্থার ত্রুটি

(ঙ) ব্রিটিশ কর্মচারি-বর্গের অত্যাচারী শাসন

সামাজিক কারণও বিদ্রোহের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছিল, বলা বাহুল্য। বিদ্রোহের প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্ব হইতেই ব্রিটিশ শাসক-বর্গের ভারতীয়দের প্রতি ঘৃণা এবং ভারতীয়দের সংস্পর্শ এড়াইয়া চলিবার মনোবৃত্তি ভারতবাসীর নিকট প্রকট হইয়া উঠিয়াছিল। সিয়ার-উল্-মুতাখরিণ গ্রন্থে ব্রিটিশ কর্মচারিবর্গের ভারতীয়দের প্রতি এইরূপ মনোভাবের উল্লেখ পাওয়া যায়। ওয়ারেন হেস্টিংস্‌ও এই কথা তাঁহার এক পত্রে উল্লেখ করিয়াছিলেন। শাসক ও শাসিতের মধ্যে এইরূপ ব্যবধান শান্তি বা আনুগত্যের অনুকূল নহে, বলা বাহুল্য। বাংলাদেশেই ব্রিটিশ শাসনের গোড়াপত্তন হইয়াছিল। কিন্তু উহার একশত বৎসর পরেও জনৈক শিক্ষিত বাঙালী হিন্দু অভিযোগ করিয়াছিলেন যে, দীর্ঘকাল শাসনের পরও ইংরাজ ও হিন্দু-সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনপ্রকার সৌহার্দ্য বা পরস্পর শ্রদ্ধার ভাব জাগে নাই।* ভারতবাসীর প্রতি সাত-সমুদ্র-তের-নদীর অপর পারের ইংরাজদের এইরূপ ব্যবহার উদার মনোবৃত্তিসম্পন্ন কোন কোন ব্রিটিশ কর্মচারীরও মনঃপূত ছিল না। লেফ্‌টেনান্ট ভার্নে (Verney)-এর রচনায় স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, ব্রিটিশ কর্ম-চারিবর্গের সহিত ভারতীয়দের কোনপ্রকার মেলামেশা ছিল না। কোন কারণে

(২) সামাজিক:

(ক) ব্রিটিশ কর্মচারি-গণের ভারতবাসীর প্রতি ঘৃণা

* Vide S. N. Sen, *Eighteen Fifty Seven*, p. 29.

কোন ভারতবাসীকে ব্রিটিশ কর্মচারীর নিকট যদি বা আসিতে হইত, তাহা হইলে সেই সাক্ষাতের পর ব্রিটিশ কর্মচারীর প্রতি তাহার ঘৃণা-ই বৃদ্ধি পাইত।*

(খ) ইংরাজী শিক্ষা, রেলপথ, টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা, সতীদাহ দমন প্রভৃতি দুরভিসন্ধিমূলক বলিয়া সন্দেহ

ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্তন, রেলপথ, টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা, সতীদাহ দমন প্রভৃতি সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যাদি যুক্তির দিক দিয়া সম্পূর্ণ সমর্থনযোগ্য হইলেও অপরাপর কারণ এবং ব্রিটিশ শাসকবর্গের শাসিতদের হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিবার মনোবৃত্তির পরিপ্রেক্ষিতে ঐগুলি ভারতবাসীর নিকট দুরভিসন্ধিমূলক বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছিল।

(গ) ব্রিটিশ কর্মচারি-বর্গের ব্যভিচার

ব্রিটিশ সামরিক কর্মচারিবর্গের ব্যভিচার, নীচজাতির স্ত্রীলোক লইয়া 'হারেম' গঠন প্রভৃতি অ-নৈতিকতা সমসাময়িক ভারতবাসীর চক্ষে ব্রিটিশদের হেয় প্রতিপন্ন করিয়াছিল।

(৩) অর্থনৈতিক :

অর্থনৈতিক কারণের উপর পূর্বেকার ঐতিহাসিকগণ ততটা গুরুত্ব আরোপ করেন নাই। কিন্তু আধুনিক গবেষণায় ইহার যথাযথ গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত হওয়া গিয়াছে। বাংলাদেশে ব্রিটিশ শাসনের গোড়াপত্তনের সময় হইতে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের পূর্বাবধি একশত বৎসর ধরিয়া ইংরাজগণ যে পরিমাণ সোনা, রূপা প্রভৃতি মূল্যবান ধাতু ভারতবর্ষ হইতে লইয়া গিয়াছিল তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে ব্রিটিশ অধিকৃত রাজ্যের প্রজাবর্গের অর্থনৈতিক অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হইয়া উঠিতেছিল। ইংরাজদের আমলে নূতন রাজস্ব-নীতি এই দুরবস্থার মাত্রা বৃদ্ধি করিয়াছিল। বিলাতী শিল্পজাত দ্রব্যাদির আমদানির ফলে দেশীয় ক্ষুদ্র শিল্পগুলি ক্রমেই বিনাশপ্রাপ্ত হইতেছিল। ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্তনে পূর্বেকার বিদ্বান সমাজের সমাদর হ্রাস পাইতেছিল। দেশীয় ভাষায় সংস্কৃত বা ফার্সী-শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের জীবিকার্জনের পন্থা ক্রমেই লোপ পাইতেছিল। বিদ্রোহের সময় হিন্দু ও মুসলমানগণের যুগ্ম ঘোষণায় জনসাধারণের আর্থিক অবনতি স্পষ্ট

(ক) ভারতবর্ষ হইতে মূল্যবান ধাতু ইংলণ্ডে রপ্তানি—দেশীয় শিল্পের অপমৃত্যু

* Vide S. N. Sen, pp. 29-30.

ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছিল। চৌকিদারী কর বৃদ্ধি, পথকর স্থাপন, যানবাহনের উপর কর স্থাপন প্রভৃতি জনসাধারণের দুর্দশা বৃদ্ধি করিয়াছিল।*

(খ) জনসাধারণের আর্থিক দুরবস্থা

এই আর্থিক কারণ সেনাবাহিনীর মধ্যে সিপাহী—অর্থাৎ ভারতীয় সৈনিকদের মধ্যেও দারুণ অসন্তোষের সৃষ্টি করিয়াছিল। সাধারণ সিপাহীর মাহিনা ছিল মাসিক ৯৲ টাকা। 'সোয়ার' অর্থাৎ অশ্বারোহী সৈনিকদের অবস্থা কোন অংশে উন্নত ছিল না। তাহাদের মাহিনা সামান্য অধিক ছিল বটে, কিন্তু তাহাদের মাহিনা হইতে নানা খাতে কিছু কিছু করিয়া অর্থ কাটিয়া রাখা হইত। মোট ৩ লক্ষ ১৫ হাজার ৫২০ জন সিপাহী এবং দেশীয় অফিসার-এর জন্য মোট ৯৮ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় করা হইত, অথচ মাত্র ৫১ হাজার ৩১৬ জন ইওরোপীয় অফিসার ও সৈনিকের পশ্চাতে মোট ৫৬ লক্ষ ৬৮ হাজার পাউণ্ড ব্যয়িত হইত। দেশীয় রাজগণের হাত হইতে শাসনভার ব্রিটিশ হস্তে চলিয়া যাইবার ফলে দেশের বিভিন্ন অংশে বহু একদা-সম্ভ্রান্ত এবং স্বচ্ছল পরিবার চরম দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

(গ) সৈনিকদের আর্থিক দুরবস্থা

কিন্তু বিদ্রোহের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল সেনাবাহিনীর অসন্তোষ। নানাকারণে এই অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়াছিল। ইওরোপীয়দের তুলনায় ভারতীয় সৈনিকদের বেতনের স্বল্পতাও সৈনিকদের মনে স্বভাবতই বিদ্বেষ জাগাইয়া তুলিয়াছিল। এই বিদ্বেষের সঙ্গত কারণও ছিল। প্রধানত, সিপাহীদের সাহায্যেই ইংরাজগণ ভারতবর্ষে এক বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিল। কিন্তু এই সাম্রাজ্য-জয়ে সাহায্যের বিনিময়ে তাহারা কোনপ্রকার আর্থিক সুযোগ-সুবিধা পায় নাই। উপরন্তু ব্রিটিশ সৈনিকদের তুলনায় তাহাদের মাহিনা এত অল্প ছিল যে, তাহারা এই বৈষম্য-

(৪) সামরিক

(ক) সিপাহীদের মাহিনার স্বল্পতা—বৈষম্যমূলক ব্যবহার

* "...in Hindoostan they have exacted as revenue Rupees 300/- when only 200/- were due...and still they are solicitous to raise their demands. The people must therefore be ruined and begarred...they have doubled and quadrupled and raised tenfold the Chowkeedaree tax and have wished to ruin the people. The occupation of all respectable man is gone, and millions are destitute of the necessaries of life." Vide, S. N. Sen, p. 1.

মূলক ব্যবহারে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। এই বৈষম্যমূলক ব্যবহার তাহাদের অন্তরকে ইংরাজদের বিরুদ্ধে বিষাইয়া দিয়াছিল।

ইংরাজ সামরিক কর্মচারীদের ব্যবহারও যেমন ছিল উদ্ধত তেমনি অপমানজনক। দেশীয় সৈনিকদিগকে তাহারা 'শূয়ার' প্রভৃতি গালাগালি না দিয়া কথা বলিত না। দেশীয় ভাষা তাহারা জানিত না বটে, কিন্তু গালাগালির প্রয়োজনীয় কথাগুলি শিখিয়া লইতে তাহাদের বিলম্ব হইত না। ঊর্ধ্বতন কোন ইওরোপীয় কর্মচারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়া তাহারা প্রতিকার পাইত না। ব্রিটিশ শাসনের প্রথমদিকে ব্রিটিশ কর্মচারী ও সিপাহীদের সম্পর্ক এইরূপ ছিল না। তখন ব্রিটিশ সামরিক কর্মচারিবর্গ যথেষ্ট উদারতা প্রদর্শন করিত। কিন্তু ক্রমেই তাহাদের ব্যবহার আপত্তিজনক হইয়া উঠিয়াছিল।

(খ) ব্রিটিশ সামরিক কর্মচারিবর্গের কটূক্তি

পদোন্নতির ক্ষেত্রেও দেশীয় ও ইওরোপীয়দের মধ্যে বৈষম্য করা হইত। ভারতীয় অফিসার ও সিপাহীর পদোন্নতির আশা ছিল না। অভিজ্ঞ ভারতীয় অফিসারদের দাবি অগ্রাহ্য করিয়া অনভিজ্ঞ ইওরোপীয় অফিসারগণকে দায়িত্বমূলক কার্যে নিযুক্ত করা হইত। ইহার ফলে ইওরোপীয় অফিসার ও সৈনিকদের বিরুদ্ধে দেশীয় অফিসার ও সিপাহীদের বিদ্বেষ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছিল।

(গ) ভারতীয় সামরিক অফিসার বা সিপাহীর পদোন্নতির সুযোগের অভাব

ভারতীয় সৈনিকদিগকে বিদ্রোহী করিয়া তুলিবার পশ্চাতে ইওরোপীয় সামরিক কর্মচারিগণেরও দায়িত্ব যে নেহাৎ কম ছিল না তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। সামরিক ঘাঁটির কোন কাজের কন্ট্রাক্ট্ দিবার কালে অফিসারগণ উৎকোচ গ্রহণ করিত। ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে ডাইরেক্টর সভার আদেশক্রমে মাদ্রাজ গবর্ণমেন্ট এই অবৈধ অর্থগ্রহণ নিষিদ্ধ করিয়া দিলে ব্রিটিশ অফিসারগণ বিদ্রোহ করিতে ত্রুটি করে নাই। সাময়িকভাবে বিদ্রোহ মাদ্রাজের বাহিরে অপরাপর সামরিক ঘাঁটিতে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ইহা ভিন্ন ভেলোর সিপাহী বিদ্রোহ, ব্যারাকপুর সিপাহী বিদ্রোহ প্রভৃতির দৃষ্টান্ত হইতেও এই কথাই প্রমাণিত হয় যে, কর্তৃপক্ষের অন্যায়মূলক আদেশ—বিশেষত ধর্মবিরোধী আদেশের বিরুদ্ধে

(ঘ) ব্রিটিশ সামরিক অফিসারগণের দৃষ্টান্ত—মাদ্রাজ বিদ্রোহ

(ঙ) পূর্বতন সিপাহী বিদ্রোহ—ভেলোর, ব্যারাকপুর

ভারতীয় সিপাহীরাও বিদ্রোহ করিয়া প্রতিবাদ জানাইতে পশ্চাদপদ ছিল না।

উপরি-উক্ত কারণের ফলে ভারতবাসীদের এবং বিশেষভাবে সিপাহীদের মনে যখন ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাব জাগিয়াছে, তখন ইওরোপীয় খ্রীষ্টধর্ম-যাজকদের হিন্দু ও মুসলমানগণকে ধর্মান্তরিত করিবার চেষ্টা অগ্নিতে ঘৃতাহুতির কাজ করিয়াছিল। রেভারেণ্ড গোপীনাথ নন্দী নামে জনৈক ভারতীয় ধর্মান্তরিত খ্রীষ্টধর্মযাজকের বিবরণী হইতে সেই সময়কার খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের পদ্ধতির কথা অবগত হওয়া যায়। সিপাহীদের নিকট পাদ্রীরা খ্রীষ্টধর্ম সম্পর্কে বক্তৃতা করিত। জেলখানায় কয়েদীদের নিকট পাদ্রীদের অবাধ যাওয়া-আসার অধিকার ছিল। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যেই এই ধর্মান্তরিত করিবার চেষ্টা চলিতেছিল।

(৫) ধর্মনৈতিক

(ক) খ্রীষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত করিবার চেষ্টা

এমতাবস্থায় ভারতীয়দের নিকট সতীদাহপ্রথা নিবারণ, বিধবা-বিবাহ আইন, এমন কি রেলভ্রমণে জাতিভেদ মানিয়া চলিবার অসুবিধা প্রভৃতি, ইংরাজ শাসকবর্গের সকলকে খ্রীষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত করিবার এক অভিসন্ধি বলিয়া মনে হইল। ভেলোর সিপাহী বিদ্রোহের প্রধান কারণ ছিল সিপাহীদের চামড়ার টুপি পরিধানের এবং দাড়ি কামাইয়া ফেলিবার আদেশ দান। ব্যারাকপুরের বিদ্রোহের কারণের মধ্যে অর্থনৈতিক কারণ ছিল বটে, কিন্তু প্রধান কারণই ছিল সিপাহীদের উপর সমুদ্র অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মদেশে যাইবার আদেশ।

(খ) রেলপথ, সতীদাহ দমন, বিধবা-বিবাহ—প্রভৃতি দুরভিসন্ধিমূলক বলিয়া ধারণা

(গ) ধর্মনৈতিক কারণে ভেলোর ও ব্যারাকপুরের বিদ্রোহ

রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সামরিক ও ধর্মনৈতিক কারণে যখন বিদ্রোহের ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছে, তখন চর্বি-মাখান কার্তুজ (greased cartridge) বারুদ-স্তূপে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের কাজ করিল। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার এন্‌ফিল্ড রাইফ্‌ল্ (Enfield Rifle) নামে এক প্রকার নূতন ধরণের বন্দুক সেনাবাহিনীতে চালু করিলেন। এই বন্দুকের কার্তুজ (cartridge) দাঁতে কাটিয়া বন্দুকে পুরিতে হইত। গরু এবং শূকরের চর্বি-মাখান কার্তুজ স্বভাবতই হিন্দু ও মুসলমান উভয়

প্রত্যক্ষ কারণ

সম্প্রদায়ের নিকট ধর্মনাশের সূক্ষ্ম পন্থা বলিয়া মনে হইল। স্বভাবতই উভয় সম্প্রদায়ের সিপাহীদের মধ্যেই এক দারুণ বিক্ষোভের সৃষ্টি হইলে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে মার্চ ব্যারাকপুরে মঙ্গল পাণ্ডে নামে জনৈক সিপাহী প্রকাশ্যভাবে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। সেইদিন মঙ্গল পাণ্ডের সহকর্মীদের সকলে না হইলেও অনেকেই তাহার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করে নাই। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ এই কারণে সমগ্র রেজিমেণ্ট (34th. N.I.) ভাঙ্গিয়া দিয়া বিদ্রোহের আগুন চাপা দিতে চাহিলেন। মঙ্গল পাণ্ডে ও তাহার সমর্থক জমাদার ঈশ্বরী পাণ্ডেকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হইল। কিন্তু তাহাতে বিদ্রোহের আগুন নিভিল না। ৩৪নং পদাতিক রেজিমেণ্ট্ ভাঙ্গিয়া দেওয়ার ফলে কর্মচ্যুত সিপাহীরা বিদ্রোহের আগুন ছড়াইতে বিরত হইল না। ক্রমে অপরাপর সেনাদলের মধ্যেও জাতিনাশের ভীতি দারুণভাবে ছড়াইয়া পড়িল। পরবর্তী ঘটনা ঘটিল মীরাটের সামরিক ছাউনিতে। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে এপ্রিল কুচকাওয়াজের কালে মোট ৯০ জন সিপাহীর মধ্যে ৮৫ জন চর্বি-মাখান কার্তুজ স্পর্শ করিতে অস্বীকার করিল। সামরিক আইন অনুসারে বিচার করিয়া তাহাদিগকে দশ বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইল। ৯ই মে (১৮৫৭) সমবেত সেনাবাহিনীর সম্মুখে দণ্ডপ্রাপ্ত সিপাহীদের হাতে-পায়ে লোহার বেড়ি লাগাইয়া জেলখানায় লইয়া যাওয়া হইল। পরদিন (১০ই মে, ১৮৫৭) দণ্ডাদেশপ্রাপ্ত সৈনিকদের সহকর্মিগণ জেলখানায় বলপূর্বক প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে মুক্ত করিল। এই ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে সিপাহীদের মধ্যে যখন এক দারুণ চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে তখন সেনাবাহিনীকে বিদ্রোহাত্মক পন্থা ত্যাগ করিতে উপদেশ-দান-রত কর্ণেল ফিনিস (Col. Finnis)-কে গুলি করিয়া হত্যা করার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত বিদ্রোহ শুরু হইল (১০ই মে, ১৮৫৭)।

এন্‌ফিল্ড রাইফ্‌ল্

মঙ্গল পাণ্ডের বিদ্রোহ

মীরাটের বিদ্রোহ
১০ই মে, ১৮৫৭

বিদ্রোহের বিস্তার (Spread of the Revolt): সিপাহীদের বিদ্রোহ ব্যারাকপুর হইতে মীরাট এবং তথা হইতে দিল্লীতে বিস্তারলাভ করিল। মীরাট হইতে বিদ্রোহী সিপাহীগণ দিল্লীতে পৌঁছিয়া (১১ই মে) মোগল বংশধর বাহাদুর শাহ্‌কে

ব্যারাকপুরের বিদ্রোহ

হিন্দুস্তানের সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিল। মীরাট এবং দিল্লী উভয় স্থানেই সিপাহারা ব্রিটিশ সামরিক অফিসার ও অপরাপর ইওরোপীয়দের হত্যা করিতে দ্বিধা করিল না। দিল্লী বিদ্রোহী সিপাহীগণ কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছে সংবাদ পাইয়া ফিরোজপুর (১৩ই মে) এবং মুজফ্‌ফর নগরের সিপাহীগণও বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। বিদ্রোহী সিপাহীদের সহিত কোন কোন স্থানে জনসাধারণও যোগদান করিতে ত্রুটি করিল না। পাঞ্জাব, নৌসেরা, হতমর্দান প্রভৃতি স্থানে বিদ্রোহ দেখা দিল। অযোধ্যা ও বর্তমান উত্তরপ্রদেশে বিদ্রোহ অত্যন্ত ব্যাপকভাবে আরম্ভ হইল। এটোয়া, মইনপুরী, রুরকী, এটা, হোদাল, মথুরা, লক্ষ্ণৌ, বেরিলি, শাহ্‌জাহানপুর, মোরাদাবাদ, বোদাও, আজমগড়, কানপুর, এলাহাবাদ, ফৈজাবাদ, দরিয়াবাদ, ফতেপুর, ফতেগড়, হাতরস ও অপরাপর বহুস্থানে বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। বিদ্রোহিগণ জেলখানা ভাঙ্গিয়া কয়েদীদিগকে ছাড়িয়া দিল, সরকারী খাজাঞ্চাখানা লুট করিল। সিপাহীদের বিদ্রোহের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় প্রতি স্থানেই বেসামরিক জনসাধারণও বিদ্রোহ করিল।

দিল্লী : বাহাদুর শাহ্‌ (২য়) সম্রাট বলিয়া ঘোষিত

ফিরোজপুর, মুজফ্‌ফর নগর

পাঞ্জাব, নৌসেরা, হতমর্দান

অযোধ্যা ও বর্তমান উত্তরপ্রদেশে ব্যাপক বিদ্রোহ

অযোধ্যায় যে সকল তালুকদার ব্রিটিশ অধিকারের (১৮৫৬) পর সম্পত্তিচ্যুত হইয়াছিল, তাহারা সকলেই বিদ্রোহে যোগদান করিল। কৃষকগণও তালুকদারগণের পক্ষ গ্রহণ করিয়া বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করিতে লাগিল। সমগ্র অযোধ্যা রাজ্যে বিদ্রোহ এক ব্যাপক জাতীয় বিদ্রোহে রূপান্তরিত হইল।

অযোধ্যায় তালুকদার ও কৃষকদের অংশ গ্রহণ

মীরাট, দিল্লী ও অযোধ্যা ভিন্ন কানপুরে নানাসাহেব, ঝাঁসিতে ঝাঁসির রাণী এবং জগদীশপুরে কুনওয়ার সিং বিদ্রোহের এক একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। বুন্দেলখণ্ডে বান্দার নবাব এবং বাণপুর ও শাহ্‌গড়ের রাজগণও অনুরূপ অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। দিল্লীতে যেমন বাহাদুর শাহ্‌ সম্রাট বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিলেন, সেইরূপ নানাসাহেবও নিজেকে পেশওয়া বলিয়া ঘোষণা করিলেন। অযোধ্যা ও রোহিলখণ্ডের জমিদারগণ নিজেরা স্বাধীন হইয়া

নানাসাহেব, ঝাঁসির রাণী

গেলেন। বেরিলীর খান বাহাদুর খাঁ ছিলেন হাফিজ রহমৎ খাঁর বংশধর। তিনি নিজেকে দিল্লী-সম্রাটের স্থানীয় প্রতিনিধি বলিয়া ঘোষণা করিয়া নিজস্ব শাসনব্যবস্থা চালু করিলেন। বেরিলীর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া বিজনোর রাজ্যেও মাহ্মুদ খাঁ দিল্লী-সম্রাটের প্রতিনিধি হিসাবে নিজেকে ঘোষণা করিলেন। এইভাবে বিভিন্ন স্থানে স্থানীয় প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিগণ শাসনক্ষমতা নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়া ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটাইতে চাহিলেন।

খান বাহাদুর খাঁ, মাহ্মুদ খাঁ

বিহারে দানাপুর নামক স্থানের সিপাহীগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া কুনওয়ার সিং-এর নেতৃত্বাধীনে সমবেত হইল। দেওগড়-এর সেনাবাহিনীও বিদ্রোহে যোগদান করিল। বাংলাদেশে ঢাকা ও চট্টগ্রামে সিপাহীগণ বিদ্রোহী হইলে উভয় স্থানেই তাহাদিগকে সহজে দমন করা হইল।

বিহার ও বাংলাদেশ

দাক্ষিণাত্য, মধ্য-ভারত, রাজস্থান প্রভৃতি অঞ্চলেও বিদ্রোহের আগুন ছড়াইয়া পড়িল।

দাক্ষিণাত্য, মধ্য-ভারত ও রাজস্থান

বিদ্রোহ-দমন (Suppression of the Revolt): বিদ্রোহীদের ব্রিটিশ-বিদ্বেষ কোন কোন স্থানে নির্দোষ ইওরোপীয় নারী ও শিশুদের হত্যাকাণ্ডে প্রকাশলাভ করিয়াছিল বটে, কিন্তু বিদ্রোহ-দমনে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের পৈশাচিকতা কোন অংশে কম ছিল না।

নৃশংসতা

বিদ্রোহের প্রথম দিকে ব্রিটিশ পক্ষ পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেও সার্ জন লরেন্স, সার্ হেন্‌রী লরেন্স, হেভেলক্, আউটরাম বা উট্রাম্, সার্ কোলিন্ ক্যাম্পবেল্ প্রভৃতি ইংরাজ কর্মচারী ও সেনাপতিদের তৎপরতায় এবং শিখ, নেপালী ও ব্রিটিশ সৈনিকদের সাহায্যে শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহ দমন করা সম্ভব হইয়াছিল।

বিদ্রোহ-দমনে ব্রিটিশ কর্মচারী ও সেনাপতি-গণের তৎপরতা

বিদ্রোহীদের নেতৃবর্গের মধ্যে প্রধান ছিলেন কানপুরের নানাসাহেব ও তাঁতিয়া তোপী। তাঁতিয়া তোপীর প্রকৃত নাম রামচন্দ্র পাণ্ডুরঙ্গ তোপী। ইনি তাঁতিয়া তোপী নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ। তাঁতিয়া তোপী নানাসাহেবের প্রধান পার্শ্বচর হিসাবে বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। নানাসাহেবের অপর একজন বিশ্বস্ত অনুচর ছিলেন আজিম-উল্লা। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নানা-

সাহেবের ভাতা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইলে নানাসাহেব আজিম-উল্লাকে ডাইরেক্টর সভার নিকট এবিষয়ে আলাপ-আলোচনার জন্য ইংলণ্ডে প্রেরণ করিয়াছিলেন। বিদ্রোহী নেতৃবর্গের অপর একজন ছিলেন রাজপুত-দলপতি কুনওয়ার সিং। ইনি জগদীশপুরের (আর্‌রা) তালুকদার ছিলেন। ফৈজাবাদের মৌলভী আহম্মদ-উল্লা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে হিন্দু ও মুসলমানগণকে সমবেতভাবে দাঁড়াইবার জন্য আহ্বান জানাইয়াছিলেন। তিনি নিজ অনুচরবর্গসহ ব্রিটিশের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণও করিয়াছিলেন। ঝাঁসির রাণীর কথা কাহারও অবিদিত নহে। তাঁহার সামরিক দক্ষতা ও দূরদর্শিতা, তাঁহার সাহস ও বীরত্ব ব্রিটিশেরও প্রশংসা অর্জন করিয়াছিল। মধ্য-ভারত ও বুন্দেলখণ্ডের বিদ্রোহের নেতৃত্ব করিয়াছিলেন ঝাঁসির রাণী। তাঁতিয়া তোপী ও ঝাঁসির রাণী অনন্যসাধারণ সামরিক কৌশল প্রদর্শন করিয়া গোয়ালিয়র অধিকার করিয়াছিলেন। ইহার পর সার্ হিউ রোজ-এর অধীনে এক ব্রিটিশ বাহিনীর সহিত যুদ্ধে তিনি প্রাণ হারাইয়া ভারতীয় বীরাঙ্গনাদের অন্যতম হিসাবে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। তাঁতিয়া তোপী হিউ রোজ-এর হস্তে পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন, কিন্তু পরে ধৃত হন এবং প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। নানাসাহেব পরাজিত হইয়া নেপালে আশ্রয় গ্রহণ করেন। পরে কিভাবে তাঁহার মৃত্যু ঘটিয়াছিল সেবিষয়ে সঠিক কিছু জানিতে পারা যায় নাই।

বিদ্রোহী নেতৃবর্গ: নানাসাহেব, তাঁতিয়া তোপী, আজিম-উল্লা, কুন্‌ওয়ার সিং, ঝাঁসির রাণী

এদিকে ব্রিটিশদের পক্ষে দিল্লী জয় করা অপরিহার্য ছিল। কারণ হিন্দুস্তানের সার্বভৌমত্বের সহিত দিল্লী রাজধানীর ছিল এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক; সুতরাং দীর্ঘ চারিমাস ক্রমাগত যুদ্ধ করিয়া ব্রিটিশ পক্ষ দিল্লী পুনরধিকারে সমর্থ হইল। সম্রাট বাহাদুর শাহ্ বন্দী হইলেন। তাঁহাকে রেঙ্গুনে নির্বাসিত করিয়া মোগল বংশের অবসান ঘটান হইল।

ব্রিটিশ শক্তির দিল্লী পুনরধিকার—বাহাদুর শাহের নির্বাসন

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের প্রকৃতি (Character of the Revolt of 1857): ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ 'সিপাহী বিদ্রোহ' কিংবা 'জাতীয় আন্দোলন' এই প্রশ্ন সম্পর্কে পরস্পর-বিরোধী মত আছে। প্রধানত, দুইটি ভাগে এই সকল বিভিন্ন মতকে ভাগ করিয়া বিচার করা উচিত হইবে।

(১) জে. বি. নর্টন (J. B. Norton), ডক্টর ডাফ্ (Dr. Duff) প্রমুখ ব্যক্তিদের মতে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ প্রথমত, সিপাহী বিদ্রোহ হিসাবে শুরু হইলেও পরে উহা ব্যাপকতা এবং জাতীয় আন্দোলনের প্রকৃতি লাভ করিয়াছিল। সমসাময়িক জনৈক মার্কিন লেখকও অনুরূপ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। (২) পক্ষান্তরে জন কে. (J. W. Kaye), সার্ সৈয়দ আহম্মদ, জনৈক বাঙালী সামরিক কর্মচারী—দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির মতে ইহা সিপাহীদের বিদ্রোহ ভিন্ন কিছুই ছিল না। বে-সামরিক ব্যক্তিদের মধ্যে যাহারা ইহাতে যোগদান করিয়াছিল তাহাদের প্রধান এবং একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল লুণ্ঠন ও গোলযোগের সুযোগ গ্রহণ করা।

পরস্পর-বিরোধী মতবাদ

উপরি-উক্ত দুইটি মতের প্রথমটিকে স্ফীত করিয়া সাভারকর-প্রমুখ দেশপ্রেমিকগণ ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহকে জাতীয় স্বাধীনতার প্রথম যুদ্ধ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বস্তুত, বিদ্রোহীদের সময় হইতে শুরু করিয়া এযাবৎ কোন সর্বজনগ্রাহ্য সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হয় নাই। অধুনা প্রকাশিত ডক্টর মজুমদারের The Sepoy Mutiny & The Revolt of 1857 এবং ডক্টর সেনের Eighteen Fifty Seven—এই দুইখানি গ্রন্থে নূতন গবেষণালব্ধ তথ্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে সমগ্র বিষয়টিকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করা হইয়াছে। ডক্টর মজুমদার এবং ডক্টর সেন মোটামুটি এক-ই কথা বলিয়াছেন। ডক্টর মজুমদার চার্লস্ রেক্স্ (Mr. Charles Raikes) নামে তদানীন্তন জনৈক ইংরাজ বিচারপতির রচনার উপর নির্ভর করিয়া এবং নানাপ্রকার যুক্তি প্রদর্শন করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহ জাতীয় আন্দোলন হিসাবে প্রথম শুরু হয় নাই। প্রধানত ইহা একটি সিপাহী বিদ্রোহ-ই বটে, কিন্তু কোন কোন অঞ্চলে সিপাহী বিদ্রোহ-ই প্রসার লাভ করিয়া জাতীয় আন্দোলনে রূপান্তরিত হইয়াছিল। বর্তমান উত্তরপ্রদেশের অধিকাংশ, মধ্যপ্রদেশের এক ক্ষুদ্র অংশ এবং বিহারের পশ্চিমাংশে সিপাহী বিদ্রোহ জাতীয় বিদ্রোহ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। অন্যত্র ইহা সিপাহী বিদ্রোহ ভিন্ন অপর কিছু ছিল

ডক্টর মজুমদার ও ডক্টর সেনের অভিমত

মূলতঃ সিপাহী বিদ্রোহ—কোন কোন অঞ্চলে জাতীয় আন্দোলনে রূপান্তরিত

না।* ডক্টর সেনও অনুরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া বলিয়াছেন যে, ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ সিপাহী বিদ্রোহ হিসাবে শুরু হইলেও সকল স্থানে ইহা কেবল সিপাহীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বিদ্রোহের প্রধান কেন্দ্রগুলিতে বিদ্রোহীদের পশ্চাতে জনসাধারণের সমর্থন ছিল। অবশ্য স্থানবিশেষে এই সমর্থনের মাত্রা অল্প বা অধিক ছিল।

এখানে বলা প্রয়োজন যে, ডক্টর মজুমদার বা ডক্টর সেনের যুক্তি সর্বক্ষেত্রেই অকাট্য এমন নহে। কেহ কেহ মনে করেন যে, তাঁহাদের উভয়ের সিদ্ধান্তই গতানুগতিক ও রক্ষণশীল মনোবৃত্তি-প্রসূত। নর্টন ও ডক্টর ডাফের মন্তব্য, বাহাদুর শাহ্‌কে বিদ্রোহিগণ কর্তৃক হিন্দুস্তানের সম্রাট বলিয়া ঘোষণা, বাহাদুর শাহের ঘোষণায় দেশের হিন্দু-মুসলমান সকল সম্প্রদায়ের লোককে ইংরাজ-বিতাড়নে অগ্রসর হইবার আহ্বান প্রভৃতির পরিপ্রেক্ষিতে অনেকে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহকে জাতীয় বিদ্রোহের চরিত্র দান করিয়া থাকেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে সামরিক বলে বলীয়ান ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে নিরস্ত্র ভারতবাসীর পক্ষে কোনপ্রকার আন্দোলন শুরু করিবার কল্পনাও আসে নাই। সেই সময়ে ব্রিটিশের সহিত যুঝিতে হইলে সামরিক শক্তির প্রয়োজন—এই ছিল ধারণা। ইহা ভিন্ন সেনাবাহিনীর বিভিন্ন দলের মধ্যে কোনপ্রকার ঐক্য যে না ছিল, এমন নহে। তদুপরি ব্রিটিশ বিতাড়ন-ই ছিল সেই আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য। বহুস্থানের কৃষকগণও বিদ্রোহে যোগদান

অপরাপর মতামত

* "The most reasonable conclusion, therefore, seems to be that primarily the outbreak was mutiny of the troops.........All the available facts fully support his (Raikes) thesis that the outbreak of 1857 was not a mutiny growing out of a national revolt or forming a part of it, but primarily a mutiny gradually developing into a general revolt in certain areas." Majumdar, p. 318-321.

"The movement began as a mutiny but it was not everywhere confined to the army." Sen p. 405.

".........The revolt commanded popular support in varying degrees in the principal theatres of war, which extended roughly from western Behar to the eastern confines of the Punjab." Ibid, p. 407.

করিয়াছিল এই প্রমাণও আছে। এমতাবস্থায় ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ সামরিক বিদ্রোহ হিসাবে শুরু হওয়াই ছিল তদানীন্তন পরিস্থিতিতে একমাত্র যুক্তিসম্মত পন্থা। সুতরাং ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহকে, প্রথমে সামরিক বিদ্রোহ হিসাবে শুরু হইয়াছিল, পরে কোন কোন স্থানে জাতীয় বিপ্লবের রূপ গ্রহণ করিয়াছিল এইরূপ সূক্ষ্ম পার্থক্যের ভিত্তিতে, উপযুক্ত মর্যাদা না-দিবার যুক্তি নাই, একথা অনেকে মনে করিয়া থাকেন। আর উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতবাসীর জাতীয়তাবোধকে আজিকার মানদণ্ডে বিচার করিলেও চলিবে না। ব্যাপক ব্রিটিশ-বিদ্বেষ প্রথমত সেনাবাহিনীর বিদ্রোহে প্রকাশ লাভ করিলেও উহার জাতীয় চরিত্র ক্ষুণ্ণ হইবার কোন কারণ নাই। এই বিদ্রোহের সুযোগে প্রধানত ব্যক্তিগত কারণে ব্রিটিশের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন ব্যক্তিগণ, পদচ্যুত ও ক্ষমতাচ্যুত শাসকশ্রেণী ও জমিদারগণ স্ব স্ব প্রাধান্য-স্থাপনে ব্যস্ত ছিলেন বটে, কিন্তু বিদ্রোহ যদি সফলতার পথে অগ্রসর হইত তাহা হইলে শেষ পর্যন্ত এই স্বার্থান্বেষী, প্রজার স্বার্থবিরোধী শাসকবর্গকে যে পুনরায় ক্ষমতা হারাইতে হইত তাহার সম্ভাবনা একেবারে ছিল না একথা বলা যায় কি ?

উপসংহার

যাহা হউক, উপসংহারে এই কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের প্রকৃতি সম্পর্কে কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছান সম্ভব হয় নাই। নূতন তথ্যাদি আবিষ্কৃত হইলেই এই বিষয়ে যে মতানৈক্য রহিয়াছে উহার অবসান ঘটিবে।*

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের বিফলতার কারণ (Causes of the failure of the Revolt of 1857) : ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের বিফলতার বিভিন্ন কারণের মধ্যে সর্বপ্রথমেই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বিদ্রোহীদের কার্যপন্থা, সময় প্রভৃতি সম্পর্কে উপযুক্ত যোগাযোগ বা সংহতি ছিল না। ফলে, একই সময়ে সকল স্থানে বিদ্রোহ যেমন শুরু হয় নাই, তেমনি সর্বত্র নীতি বা কর্মপন্থা অনুসৃত হয়

(১) সংহতির অভাব

---

* ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিশদ আলোচনা এই গ্রন্থে সংযোগ করা সম্ভব নহে। মোটামুটি ধরণের আলোচনা করা হইল মাত্র।

নাই। দ্বিতীয়ত, নানাসাহেব ও বাহাদুর শাহের মধ্যে স্বার্থের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। নানাসাহেব পেশওয়া হইবার এবং মারাঠা প্রাধান্য পুনঃস্থাপনের জন্য সচেষ্ট ছিলেন। বাহাদুর শাহ্ স্বভাবতই চাহিয়াছিলেন মোগল প্রাধান্য পুনরুজ্জীবিত করিতে। তৃতীয়ত, ইতস্তত: বিক্ষিপ্তভাবে বিদ্রোহ দেখা দিবার ফলে উহা আঞ্চলিক সীমার মধ্যে গণ্ডিবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। দক্ষিণ-ভারতে এই বিদ্রোহের বিস্তৃতি ঘটে নাই। চতুর্থত, বিদ্রোহী নেতাগণের ব্যাপক বিদ্রোহ-পরিচালনার মত যোগ্যতা ও দক্ষতা ছিল না। ঝাঁসির রাণী, নানাসাহেব, তাঁতিয়া তোপী, কুনওয়ার সিং প্রভৃতি নেতৃবর্গ স্ব স্ব এলাকায় সুযোগ্য নেতৃত্বের পরিচয় দান করিলেও ব্যাপক বিদ্রোহের সামগ্রিক পরিচালনার ক্ষমতা তাঁহাদের কাহারো ছিল না। উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাব বিদ্রোহের অসাফল্যের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল একথা অনস্বীকার্য। তদানীন্তন দেশীয় রাজগণের মধ্যে কেহই এই বিদ্রোহে যোগদান করেন নাই। পঞ্চমত, বিদ্রোহের পরাজয়ের কারণগুলির মধ্যে ব্রিটিশ কূট-কৌশলেরও উল্লেখ করিতে হইবে। ভীতিপ্রদর্শন করিয়া এবং প্রয়োজনবোধে উপযুক্ত পুরস্কারের প্রলোভন দেখাইয়া তাহারা অনেকেই সপক্ষে টানিতে সক্ষম হইয়াছিল। শিখদের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ কৌশল সম্পূর্ণ-রূপে কার্যকরী হইয়াছিল। মাত্র দশ বৎসর পূর্বে ব্রিটিশ সরকার পাঞ্জাব অধিকার করিয়া শিখ-শক্তির অবসান ঘটাইয়াছিল। কিন্তু সেই শিখদের ব্রিটিশ-শক্তি এই বিদ্রোহ-দমনের কার্যে নিয়োগ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। ষষ্ঠত, বিদ্রোহকে সমগ্রভাবে পরিচালনার কোন সামগ্রিক পরিকল্পনা বা কেন্দ্রীয় সংগঠন ছিল না। ফলে, বিদ্রোহীদের শক্তি ইতস্তত: বিক্ষিপ্তভাবে অযথা বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল। কোন কোন স্থানে বিদ্রোহীদের মধ্যে সংগঠনের পরিচয় পাওয়া গেলেও বিদ্রোহকে জয়যুক্ত করিতে হইলে যে কেন্দ্রীয় পরিচালনা ও পরিকল্পনার প্রয়োজন হয় তাহা ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহে গড়িয়া উঠে নাই। সপ্তমত, ব্রিটিশ সেনাবাহিনী যাহাতে দিল্লী অবরুদ্ধ করিতে না পারে সেইজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না করিয়া বিদ্রোহিগণ অত্যন্ত ভুল

(২) আদর্শ ও উদ্দেশ্যের পার্থক্য

(৩) আঞ্চলিক সীমায় সীমাবদ্ধতা

(৪) সুযোগ্য নেতার অভাব

(৫) ব্রিটিশ কূটকৌশল

(৬) বিদ্রোহীদের সংগঠনের অভাব

করিয়াছিল। ইহা ভিন্ন দিল্লী যখন ব্রিটিশ সৈন্য কর্তৃক অবরুদ্ধ হইয়াছিল তখন দিল্লীর অভ্যন্তর হইতে বাধা দানের সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইতেও অবরোধকারী ব্রিটিশ বাহিনীকে আক্রমণ করিবার চেষ্টা না করিয়া বিদ্রোহিগণ সামরিক অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছিল।* অষ্টমত, ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর সামরিক দক্ষতা, গোলাবারুদের প্রাচুর্য এবং সর্বোপরি একই সেনাপতির নির্দেশানুযায়ী যুদ্ধ করা—প্রভৃতির স্থলে সিপাহীদের সামরিক দক্ষতার ন্যূনতা, গোলাবারুদের অপ্রাচুর্য এবং সর্বোপরি বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত সামরিক নেতৃত্ব তাহাদের দুর্বলতার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলা, সামরিক দূরদর্শিতা, উন্নত ধরণের সেনাপতিত্বও বিদ্রোহীদের পরাজয়ের কারণ ছিল, বলা বাহুল্য।

(৭) বিদ্রোহীদের সামরিক ভুল

(৮) ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর দক্ষতা

বিদ্রোহের ফলাফল (Results of the Revolt) : ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ বিফলতায় পর্যবসিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু ইহার ফলে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ব্যাপক পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। প্রথমত, ইংলণ্ডের ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ স্পষ্টই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের হস্তে এত বড় সাম্রাজ্যের শাসনভার ছাড়িয়া দেওয়া নিরাপদ নহে। এই কারণে ভারতে ব্রিটিশ ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসনের অবসান ঘটাইয়া এই সাম্রাজ্য ব্রিটিশ সরকারের অধীনে স্থাপন করা হইল। ভারত শাসনের উন্নতির জন্য একটি আইন পাস করিয়া ভারতের শাসনভার একজন সেক্রেটারী ও পনের জন সদস্য লইয়া গঠিত একটি কাউন্সিলের হস্তে ন্যস্ত করা হইল। এই সংস্থাটি ইংলণ্ডে স্থাপিত হইল এবং ইংলণ্ডের মহারাণীর পক্ষে ভারতের শাসন-পরিচালনার দায়িত্ব এই কাউন্সিল ও সেক্রেটারীর হস্তে ন্যস্ত করা হইল। ব্রিটিশ সার্বভৌম ক্ষমতার প্রতীক মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রতিনিধি হিসাবে ভারতের গবর্ণর-জেনারেলকে ভাইস্‌রয় বা প্রতিনিধি নিযুক্ত করা হইল।

ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসনের অবসান

ভাইস্‌রয় নিয়োগ

* Vide, Majumder, p. 271.

দ্বিতীয়ত, মহারাণীর ঘোষণা দ্বারা লর্ড ডালহৌসী-প্রবর্তিত স্বত্ব-বিলোপ নীতি পরিত্যক্ত হইল। এই ঘোষণায় স্পষ্টভাবে বলা হইল যে, ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষে আর রাজ্যবিস্তার করিবেন না। দেশীয় নৃপতিদের মনে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি যে সন্দেহ উপজাত হইয়াছিল উহা দূরীকরণের জন্যই এই কথার উল্লেখ করা হইয়াছিল, বলা বাহুল্য। ইহার ফলে দীর্ঘকাল প্রচলিত ভারতে ব্রিটিশ অধিকার বিস্তৃতির নীতির পরিবর্তন ঘটিল। সাত শতেরও অধিক দেশীয় রাজ্য, অর্থাৎ ভারতের মোট আয়তনের দুই-পঞ্চমাংশ, ব্রিটিশ শাসন-বহির্ভূত রহিয়া গেল। ইহা ভিন্ন দেশীয় রাজগণের উত্তরাধিকার তাঁহাদের নিজ নিজ আইন অনুসারে নিয়ন্ত্রিত হইবে এবং দত্তক পুত্র গ্রহণের ব্যাপারেও তাঁহাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকিবে।*

স্বত্ব-বিলোপ নীতি পরিত্যক্ত: সাত শত দেশীয় রাজা ব্রিটিশ শাসন বহির্ভূত

তৃতীয়ত, ভারতের শাসনব্যবস্থায় ভারতীয়দের অধিকতর অংশদানের নীতিও গৃহীত হইল। ভারতে ব্রিটিশ শাসকসম্প্রদায় এবং ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে কোনপ্রকার যোগাযোগ ছিল না বলিয়াই ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ ঘটিয়াছিল, এই কথা স্মরণ করিয়া ভারতবর্ষের শাসনব্যবস্থায় অধিক সংখ্যক ভারতীয়দের নিয়োগের নীতি প্রবর্তিত হইল।

শাসনব্যবস্থায় অধিক সংখ্যক ভারতীয় নিয়োগের নীতি

চতুর্থত, ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজ ও বোম্বাই কাউন্সিলের আইন-প্রবর্তনের ক্ষমতা কলিকাতা কাউন্সিলের হস্তে ন্যস্ত করা হইয়াছিল, কিন্তু বিদ্রোহেয় পর এই কেন্দ্রীকরণ-নীতি পরিত্যক্ত হইল। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের কাউন্সিলস্ এ্যাক্ট (Councils Act) পাস করিয়া বোম্বাই ও মাদ্রাজ কাউন্সিলের আইন প্রণয়ন-ক্ষমতা ফিরাইয়া দেওয়া হইল। ব্রিটিশ শাসনাধীনে কোন প্রদেশ গঠন করা হইলেও উহাতে কাউন্সিল স্থাপনের ব্যবস্থা করা হইল। এই সকল কাউন্সিলে ভারতীয় সভ্য গ্রহণের ব্যবস্থাও করা হইয়াছিল।

কাউন্সিল্স্ এ্যাক্ট, (১৮৬১)

পঞ্চমত, ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের ফলে ব্রিটিশ শাসকবর্গের মধ্যে যে

*Thompson & Garratt : p. 468.

ভীতি ও সন্দেহের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা দূর করিবার জন্য এবং ভারতে ব্রিটিশ শাসনের নিরাপত্তা বিধানের উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ সাম্রাজ্যবাদী বিভেদ নীতির (Divide et impera) প্রচলন করিতে সচেষ্ট হইলেন। সেই সময় হইতেই সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষ রোপণের চেষ্টা শুরু হইল।

সাম্রাজ্যবাদী বিভেদ নীতি (Divide et impera)

ষষ্ঠত, ভারতীয় সিপাহীদের সংখ্যার অনুপাতে অতি নগণ্য সংখ্যক ব্রিটিশ সৈনিক রাখিবার বিপদ বুঝিতে পারিয়া ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ আরও বহু ব্রিটিশ সৈন্য ভারতবর্ষে আনাইয়া ভবিষ্যতে সিপাহী বিদ্রোহের পথ বন্ধ করিতে চাহিলেন। ইহা ভিন্ন যাবতীয় দায়িত্বমূলক কার্যে কেবলমাত্র ইংরাজ কর্মচারী নিয়োগের নীতি অনুসৃত হইতে লাগিল।

ব্রিটিশ সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি

সপ্তমত, বিদ্রোহ দমনে ব্রিটিশ পক্ষের বর্বরতা এবং লক্ষ্ণৌ, দিল্লী, কানপুর প্রভৃতি স্থানের বিদ্রোহীদের সাহসিকতা ভারতীয়দের মনে এক দিকে যেমন ব্যাপক ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাবের সৃষ্টি করিয়াছিল, অপর দিকে বিদ্রোহের কালে সাহায্যদানে অগ্রসর না হওয়ার জন্য গভার অনুতাপের সৃষ্টি করিয়াছিল।

ভারতীয়দের মনোভাব

অষ্টমত, ব্রিটিশদের প্রতি যে বিরূপ মনোভাবের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার ফলে ব্রিটিশদের সহিত সামাজিক মেলামেশা পূর্বেকার তুলনায় হ্রাসপ্রাপ্ত হইল। পরস্পর সন্দেহ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সেই সময় হইতেই 'এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান' (Anglo-Indian) সম্প্রদায়ের প্রতিও ভারতীয়দের বিরূপ মনোভাবের সৃষ্টি হইয়াছিল।

সর্বশেষে, ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের কারণগুলির মধ্যে ব্রিটিশ শাসনাধীনে সতীদাহপ্রথা দমন, ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্তন প্রভৃতি সংস্কার প্রবর্তন অন্যতম কারণ ছিল, এই কথা উপলব্ধি করিয়া ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ সংস্কার-কার্যাদি গ্রহণে সতর্কতা অবলম্বন করিয়া চলিতে লাগিলেন। বস্তুত তাঁহারা প্রতিক্রিয়াশাল হইয়া উঠিলেন।

সংস্কার নীতিতে সতর্কতা —প্রতিক্রিয়াশীলতা

দশম অধ্যায়

ভারতের জাগরণ

(Awakening of India)

বাংলার নবজাগরণ (Bengal Renaissance) ঃ সুষুপ্তির পর আসে জাগরণ, আর দীর্ঘ সুষুপ্তির ফলে যখন আত্মাবলুপ্তি ঘটে, তখন আসে হয় চিরপতন নতুবা পুনর্জন্ম বা নবজাগরণ। ইওরোপের মধ্যযুগের দীর্ঘ সুষুপ্তি যখন আত্মাবলুপ্তিতে পরিণত হইয়াছিল তখনই ঘটিয়াছিল এক ব্যাপক নবজাগরণ বা রেনেসাঁস। আর সেই নবজাগরণের অগ্রদূত ছিল ইতালি ও ইতালিবাসী।

ইওরোপে নবজাগরণ

মোগল সাম্রাজ্যের পতনের যুগে সমগ্র ভারতবর্ষে এক বিরাট অনৈক্যের চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও বিচ্ছিন্নতা-জনিত অন্তর্মুখিতা সমগ্র ভারতবর্ষকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডিতে বিভক্ত করিয়া দিয়াছিল। রাজনৈতিক ক্ষেত্রের এই বিচ্ছিন্নতা রাজনীতির গণ্ডি ছাড়াইয়া অর্থনীতি, সাহিত্য, সংস্কৃতি প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রে ক্রমে এক আত্মবিস্মৃতিতে পরিণত হইয়াছিল। ভারত-ইতিহাসে তখন এক অন্ধকার যুগের সূচনা হইয়াছে। সংস্কৃতির ধর্ম-ই হইল আঘাতের মধ্য দিয়া অগ্রসর হওয়া। আবদ্ধ জলে যেমন স্রোত আসে না, জোয়ার-ভাঁটা খেলে না, সেইরূপ আবদ্ধ সংস্কৃতিরও অগ্রগতি থাকে না। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত ভারত-ইতিহাসে এই বৈশিষ্ট্যই পরিলক্ষিত হয়।

মোগল শাসনের শেষভাগে ভারতীয় সংস্কৃতির গতিহীনতা

কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতে, বিশেষভাবে বাংলাদেশে ব্রিটিশ রাজনৈতিক এবং বাণিজ্যিক প্রাধান্য স্থাপিত হওয়ার ফলে ক্রমে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সাহিত্যের প্রভাব বিস্তার লাভ করিল। বাঙালী জাতিই হইল এই নূতন শিক্ষা ও সাহিত্য-সম্পদের সর্বপ্রথম সংগ্রাহক। আরব দেশের সহিত বাণিজ্যব্যপদেশে আরবীয় সভ্যতার প্রভাব যেমন ইতালিতে বিস্তার লাভ করিয়া ইওরোপীয় রেনেসাঁস সৃষ্টির পথ প্রস্তুত করিয়াছিল, সেইরূপ পাশ্চাত্য সাহিত্য ও সংস্কৃতির

পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে নবজাগরণের সূত্রপাত

প্রভাবও প্রথমে বাংলাদেশে বিস্তার লাভ করিয়া ভারতের নবজাগরণের সূত্রপাত করিয়াছিল। রেনেসাঁসের ক্ষেত্রে ইওরোপে ইতালি ও ইতালীয় জাতি যে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল, বাংলাদেশ ও বাঙালী জাতি ভারতীয় নবজাগরণে অনুরূপ অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। এবিষয়ে বাংলাদেশই ছিল ভারতের ইতালি।

বাংলাদেশ ভারতবর্ষের ইতালি

রাজা রামমোহন রায়, ১৭৭২-১৮৩৩ (Raja Rammohan Roy): ইওরোপীয় রেনেসাঁসের অগ্রদূত ইতালির সহিত বাংলাদেশের নানাদিক দিয়া সাদৃশ্য ছিল। পেত্রার্ক, বোক্কাচো প্রভৃতি হিউম্যানিস্টগণ যেমন ইতালীয় রেনেসাঁসের সূচনা করিয়াছিলেন, সেইরূপ বাংলাদেশের নবজাগরণের সূচনা করিয়াছিলেন হিউম্যানিস্ট বা মানবধর্মী রাজা রামমোহন রায়। ভারতীয় কৃষ্টি ও পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার সংমিশ্রণে যে আধুনিক ভারতের ও আধুনিক মানুষের সৃষ্টি হইয়াছে তাহাদের অগ্রদূত ছিলেন রামমোহন। হিউম্যানিস্ট-সুলভ অনুসন্ধিৎসা, সংস্কারক-সুলভ মনোবল এবং ঋষি-সুলভ প্রজ্ঞা লইয়া রামমোহন এক যুগপ্রবর্তকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির সমন্বয়ের এক অভূতপূর্ব মূর্ত প্রতীক ছিলেন রাজা রামমোহন।

বাংলার নবজাগরণের অগ্রদূত—হিউম্যানিস্ট রাজা রামমোহন রায়

নবজাগরণের প্রধান শর্ত-ই হইল চিন্তাধারার মুক্তি। গতানুগতিকতার স্থলে অনুসন্ধানী ও সমালোচক দৃষ্টি না জন্মিলে নবজাগরণের সূত্রপাত হইতে পারে না। উহার জন্য প্রয়োজন আত্মাবলুপ্তির স্থলে আত্ম-চেতনার। রক্ষণশীলতা ত্যাগ করিয়া যুক্তি-তর্কের দ্বারা সকল কিছুরই মূল্য নির্ধারণ এবং বৃহত্তম স্বার্থের জন্য যাহা প্রকৃত সহায়ক উহা গ্রহণ করিবার মধ্যেই নবজাগরণের বীজ নিহিত থাকে। রামমোহন বাঙালী তথা ভারতবাসীর আত্মাবলুপ্তি দূর করিয়া তাহাদের চিন্তাধারার মুক্তিসাধন করিয়াছিলেন।

চিন্তাধারার মুক্তি

মানবসভ্যতার মাপকাঠি হইল সমন্বয়-সাধনের ক্ষমতা। ইতিহাসের স্রোতে যখন বিভিন্ন শিক্ষা ও সংস্কৃতি, ধর্ম ও রাজনীতির প্রভাব একই স্থলে আসিয়া সমবেত হয়, তখন স্বভাবতই শুরু হয় সংঘর্ষ ও দ্বন্দ্বের। এই সংঘর্ষের মধ্যে সমন্বয় ও সামঞ্জস্য বিধান করিতে পারিলেই সভ্যতা অগ্রগতির পথে অগ্রসর হইতে পারে। ভারত-ইতিহাসের এইরূপ এক-যুগসন্ধিক্ষণে যখন তিনটি ভিন্ন

ভিন্ন সভ্যতা—হিন্দু, ইসলামীয় ও ইওরোপীয়—একই স্থলে আশ্রয় গ্রহণ করিতে চাহিল তখন স্বভাবতই প্রয়োজন হইল এক বিরাট সমন্বয়ের। এই ঐতিহাসিক প্রয়োজন মিটাইবার জন্যই যেন রামমোহনের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। তাঁহার ব্যক্তিত্ব ছিল বহুত্বের এক বিরাট সমন্বয়স্বরূপ। হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টান সভ্যতা ও সংস্কৃতির পূর্ণ সমন্বয়ের প্রতীক ছিলেন রাজা রামমোহন। এই সমন্বয়ই ছিল তাঁহার মূল প্রতিভা এবং উহার মধ্যেই হইয়াছিল নূতন যুগের সূচনা। রামমোহন ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির অন্যতম কেন্দ্রস্থল বারাণসীতে সংস্কৃতশাস্ত্র অধ্যয়ন এবং পাটনায় আরবী ও ফারসী ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিব্বতে গিয়া তিনি তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করেন। ইহা ভিন্ন ইংরাজী, হিব্রু, গ্রীক, সীরীয় প্রভৃতি ভাষায়ও তাঁহার ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের দৃষ্টান্ত ও ফরাসী বিপ্লবের প্রভাব তাঁহার স্বভাবত বিপ্লবী মনে এক গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ধর্ম ও যুক্তিবাদ (Rationalism)-এর সমন্বয় সাধন করা, রাজনীতি ক্ষেত্রে স্বাধীনতা আনয়ন করা এবং সামাজিক ক্ষেত্রে কুসংস্কারমুক্ত স্বাধীন ও বলিষ্ঠ চিন্তাধারার সূচনা করাই ছিল তাঁহার জীবনের আদর্শ। ইংরাজ হিউম্যানিস্ট ফ্রান্সিস্ বেকন হইতে আরম্ভ করিয়া লক্ ও নিউটন, হিউম, গিবন্, ভল্টেয়ার, টোম, পেইন প্রভৃতি মনীষিগণের চিন্তাধারার সহিত তিনি পরিচিত ছিলেন। সুতরাং রামমোহনের চরিত্রে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতি এবং হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টান ধর্মনীতি সব কিছুর এক মহাসমন্বয় ঘটিবে তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই।

হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টান শিক্ষা ও সংস্কৃতির সমন্বয়ের প্রতীক

তাঁহার শিক্ষা

এইভাবে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থাদি পাঠ করিয়া 'সকল ধর্মই মূলতঃ একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী' এই সিদ্ধান্তে তিনি উপনীত হইলেন। তিনি হিন্দুধর্মের অর্থহীন আচার-অনুষ্ঠান, বহু দেব-দেবীতে বিশ্বাস প্রভৃতির যে কোন মূল্য নাই তাহা বেদ ও উপনিষদ হইতে প্রমাণ করিবার চেষ্টা শুরু করিলেন। তিনি হিন্দুধর্মকে কুসংস্কারমুক্ত একেশ্বরবাদে পরিণত করিবার জন্য প্রচারকার্য শুরু করিলে তদানীন্তন বাঙালী হিন্দুদের মধ্যে

রামমোহনের মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য ধর্ম, শিক্ষা ও সংস্কৃতির এক অভূতপূর্ব সংমিশ্রণ

এক দারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল। এই স্থত্র ধরিয়া এক তীব্র বিতর্কেরও সূচনা হইল। সংস্কারমুক্ত একদল শিক্ষিত বাঙালী রামমোহনের সহিত যোগদান করিলেন। নিজ ধর্মমত প্রচারের জন্য রামমোহন প্রথমে 'আত্মীয় সভা' নামে একটি আলোচনা সভা স্থাপন করিয়াছিলেন (১৮১৫)। কিন্তু জীবনের শেষভাগে তিনি অধিকতর সুসংবদ্ধ একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন (১৮২৮)। ইহার নাম দেওয়া হইয়াছিল 'ব্রাহ্ম সভা'। ইহাই পরবর্তী কালে ব্রাহ্ম-সমাজে রূপান্তরিত হইয়াছিল। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, রামমোহন রায় প্রবর্তিত ধর্মমত হিন্দুধর্মের অন্তর্নিহিত একেশ্বরবাদের প্রচার ভিন্ন আর কিছু নহে।

উপনিষদের ভিত্তিতে একেশ্বরবাদের প্রচার—রক্ষণশাল হিন্দুদের বিরোধিতা

আত্মীয় সভা—পরবর্তী কালে ব্রাহ্মসমাজে রূপান্তরিত

রাজা রামমোহন রায় শুধু হিন্দুধর্মকে সংস্কারমুক্ত করিবার চেষ্টাতে-ই নিজ কার্যকলাপ গণ্ডিবদ্ধ রাখেন নাই। তিনি ছিলেন ভারতের নবযুগের অগ্রদূত। শিক্ষা, সমাজ সংস্কার, রাজনীতি ও দেশপ্রেম—সকল ক্ষেত্রেই তিনি নবজাগরণের সূচনা করিয়াছিলেন।

শিক্ষাসংস্কার, রাজনীতি, সর্বক্ষেত্রে রামমোহনের দান

বাংলা তথা ভারতবর্ষে ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্তনের ব্যাপারে রামমোহনের নাম সর্বপ্রথমেই উল্লেখযোগ্য। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির চার্টার-এ বৎসরে এক লক্ষ টাকা ভারতীয়দের শিক্ষার খাতে ব্যয় করিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। এই নির্দেশ কার্যকরী করিবার উদ্দেশ্যে ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে Committee of Public Instruction নামে একটি সংস্থা সরকার কর্তৃক স্থাপিত হইল। এই সংস্থাটি কলিকাতায় সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করিতে মনস্থ করিলে রাজা রামমোহন রায় গবর্ণর-জেনারেল লর্ড আমহার্স্ট-এর নিকট ইহার তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়াছিলেন। তিনি পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা যথা, রসায়ন-বিদ্যা, শারীর-বিদ্যা, চিকিৎসা-শাস্ত্র প্রভৃতি প্রবর্তন করিবার জন্য সরকারী অর্থ ব্যয়িত হওয়া প্রয়োজন এই যুক্তি দেখাইয়াছিলেন। তৎসত্ত্বেও সরকারী সাহায্যে সংস্কৃত কলেজ, মাদ্রাসা প্রভৃতি স্থাপন করা চলিল। সংস্কৃত পুস্তকাদি

ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্তনে রামমোহনের আগ্রহ

মুদ্রণে সরকারী অর্থ ব্যয়িত হইতে লাগিল। কিন্তু তদানীন্তন বাংলার শিক্ষিত সমাজের মধ্যে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার জন্য আগ্রহ লর্ড আমহার্স্ট-এর নিকট রাজা রামমোহন রায়ের প্রতিবাদ-পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। সরকার—অর্থাৎ ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্তৃপক্ষ ভারতের প্রাচীন সাহিত্য ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা করিলেও খ্রীষ্টধর্মযাজক ও উদারপন্থী ভারতীয়দের চেষ্টায় পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা বিস্তারের জন্য স্কুল, কলেজ স্থাপিত হইতেছিল। ডেভিড্ হেয়ার ও রাম-মোহনের চেষ্টায় ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু কলেজ স্থাপিত হইয়াছিল। পরে উহার প্রেসিডেন্সী কলেজ নামকরণ করা হইয়াছে। ইংরাজী ভাষায় পুস্তক রচনা ও প্রকাশনের জন্য ডেভিড্ হেয়ার ঐ বৎসরই 'স্কুল বুক সোসাইটি' নামে একটি সংগঠন স্থাপন করিয়াছিলেন। গতানুগতিক চিন্তাধারা হইতে বাঙালী যুব-সম্প্রদায়কে মুক্ত করিবার ব্যাপারে হিন্দু কলেজের অধ্যাপক হেন্‌রী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও-র নাম উল্লেখযোগ্য। স্কটিশ মিশনারী ডক্টর আলেকজাণ্ডার ডাফ্ প্রথমে কলিকাতায় আসিয়া যখন পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা-বিস্তারে সচেষ্ট হন, তখনও রাজা রামমোহন রায় তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য দান করিয়াছিলেন। ডক্টর ডাফ্ কর্তৃক স্থাপিত জেনারেল এ্যাসেম্ব্‌লীজ ইন্‌ষ্টিটিউশন বর্তমান স্কটিশ চার্চ কলেজে রূপান্তরিত হইয়াছে। রামমোহন স্বয়ং একটি অ্যাংলো-হিন্দু স্কুল ও বেদান্ত কলেজ নামে একটি কলেজ স্থাপন করিয়াও পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা প্রসারের চেষ্টা করিয়াছিলেন।

হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা —ডেভিড্ হেয়ার

ডক্টর আলেকজাণ্ডার ডাফ্ঃ জেনারেল এ্যাসেম্ব্‌লীজ কলেজের প্রতিষ্ঠা

বাংলা গদ্যের স্রষ্টা হিসাবেও রাজা রামমোহনের দান কৃতজ্ঞতা-সহকারে স্মরণযোগ্য। বাংলা গদ্যের উন্নতিসাধনে রামমোহন রায়ের রচনার দান নেহাৎ কম ছিল না। তাঁহার প্রচারিত একেশ্বরবাদ-সংক্রান্ত বিতর্ক একদিকে যেমন কুসংস্কারমুক্ত হিন্দুধর্ম স্থাপনের পথ-নির্মাণে সচেষ্ট ছিল তেমনি অপরদিকে বাংলা গদ্যেরও উন্নতিবিধানে সাহায্য করিয়াছিল। রামমোহন রায় ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে একখানি বাংলা ব্যাকরণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার এই ব্যাকরণখানি আধুনিককালের পণ্ডিতগণেরও প্রশংসা অর্জন করিয়াছে।

বাংলা গদ্যের স্রষ্টাদের অন্যতম

সমাজ-সংস্কারের ক্ষেত্রে রামমোহন রায়ের দান চিরস্মরণীয় হইয়া আছে।

জাতিভেদ প্রথা দূরীকরণ, স্ত্রীজাতির সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি, হিন্দুসমাজের কুসংস্কার-দূরীকরণ প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই রামমোহন নিজ মানসিক উৎকর্ষের পরিচয় দান করিয়াছিলেন। সতীদাহ প্রথা-নিবারণে তাঁহার সহানুভূতি ও সহযোগিতা না থাকিলে লর্ড বেন্টিঙ্ক উহা পাস করিতে সমর্থ হইতেন কিনা সন্দেহ। হিন্দু বিধবাগণ যাহাতে সম্পত্তির উত্তরাধিকার পাইতে পারেন সেই চেষ্টাও তিনি করিয়াছিলেন। তিনি হিন্দু বিধবা-বিবাহেরও পক্ষপাতী ছিলেন। নারীজাতির আদর্শ এবং সমাজে নারীজাতির পুরুষদের নিকট হইতে কিরূপ ব্যবহার পাওয়া উচিত, সে বিষয়েও তিনি প্রবন্ধাদি প্রকাশ করিয়া হিন্দুসমাজের উন্নয়নের চেষ্টা করিয়াছিলেন। এক কথায় বলিতে গেলে তিনি ছিলেন ভারতীয় সমাজ-সংস্কারের প্রকৃত উদ্যোক্তা।

জাতিভেদ-প্রথা দূরীকরণ, স্ত্রীজাতির মর্যাদা-বৃদ্ধি, বিধবাদের উত্তরাধিকার, সতীদাহ প্রথা-নিবারণ, হিন্দু বিধবা-বিবাহ প্রভৃতির চেষ্টা

রাজনীতিক্ষেত্রে রামমোহন ছিলেন ভারতের নবজাগরণের ভবিষ্যৎদ্রষ্টা। শাসনতান্ত্রিক উপায়ে রাজনৈতিক অভিযোগ দূরীকরণের যে ইঙ্গিত তিনি রাখিয়া গিয়াছিলেন, উহা অনুসরণ করিয়াই ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। রাজনীতিক্ষেত্রে তাঁহার মতবাদ ছিল অতি-আধুনিক ধরণের। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় রাজস্ব ও বিচার-ব্যবস্থা এবং জমিদার-শ্রেণীর অত্যাচারে জর্জরিত কৃষক সম্প্রদায়ের দুরবস্থা প্রভৃতি অভিযোগের প্রতিকার দাবি করিয়া তিনি ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের নিকট এক স্মারকলিপি পেশ করিয়াছিলেন।

ভারতের জাতীয়তা-বাদের জনক

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষার জন্যও রামমোহন যথেষ্ট চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। স্বাধীন এবং বলিষ্ঠ জনমতের সৃষ্টি ও প্রকাশের দায়িত্ব সংবাদ-পত্রের। রামমোহন রায় সর্বপ্রথম ভারতের সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়াছিলেন। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রেস রেগুলেশনের প্রতিবাদ করিয়া তিনি সুপ্রীম কোর্টের নিকট এক দরখাস্ত পেশ করিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন তিনি বাংলাদেশে সংবাদপত্র-সেবীদের শ্রেষ্ঠ কয়েকজন যথা, হরিশচন্দ্র মুখার্জী, মতিলাল ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, কেশবচন্দ্র সেন, গিরিশচন্দ্র ঘোষ,

সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য চেষ্টা

শম্ভুচন্দ্র মুখার্জী, দ্বারকানাথ ঠাকুর, কৃষ্ণদাস পাল প্রভৃতিকে এই দায়িত্বপূর্ণ বৃত্তিগ্রহণে অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন।*

নূতন যুগের নূতন মানুষ

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে রাজা রামমোহন যে ভারতের আধুনিক যুগের অগ্রদূত, বিপ্লবের মূর্ত প্রতীক এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের সাংস্কৃতিক সমন্বয়-প্রসূত নূতন যুগের নূতন মানুষ ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে না। রামমোহন রায় ভারতের সত্য পরিচয় নিজ ব্যক্তিত্বের মধ্য দিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন।

ভারতের নব-যুগের প্রবর্তক রামমোহনের বহুগুণ-সমন্বিত ব্যক্তিত্ব

ভারতের নব-যুগের প্রবর্তক রাজা রামমোহন তাঁহার বহুমুখী প্রতিভা ও সুবিশাল ব্যক্তিত্বের প্রভাবে তদানীন্তন বাংলার মনীষীদের অনেককেই প্রভাবিত করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন একাধারে সমাজ ও ধর্ম-সংস্কারক এবং রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা ও জাতীয়তাবোধ, শিক্ষা ও সংস্কৃতির উৎসস্বরূপ। স্বভাবতই তাঁহার বহুগুণ-সমন্বিত ব্যক্তিত্ব এক বিরাট সংখ্যক মনীষীর মনকে প্রভাবিত করিয়াছিল। ইওরোপীয় রেনেসাঁসের প্রবর্তকদের মধ্যেও এইরূপ বহু গুণের ও বহু ক্ষমতার সমন্বয় পরিলক্ষিত হয় না। রামমোহনের মধ্যে বহুত্বের একক প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। বাংলা তথা ভারতীয় রেনেসাঁসের জনক রাজা রামমোহন এক নবযুগের আলোকবর্তিকা লইয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার

তাঁহার অনুগামীবৃন্দ

প্রধান অনুগামীদের মধ্যে প্রিন্স্ দ্বারকানাথ ঠাকুর (১৭৯৪-১৮৪৬), রমানাথ ঠাকুর (১৮০০-১৮৭৭), প্রসন্নকুমার ঠাকুর (১৮০১-১৮৬৮), ব্রজমোহন মজুমদার (১৭৮৪-১৮২১), নন্দকিশোর বসু (১৮০২-৪৫), তারাচাঁদ চক্রবর্তী (১৮০৪-?), রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ (১৭৮৫-

---

* "The prospect of an educated India, or an India approximating to European standards, culture, seems to have never been long absent from Rammohan's mind; and he did, however vaguely, claim in advance for his countrymen the political rights which progress in civilization inevitably involves. Here again Rammohan stands forth as the tribune and prophet of new India." Quoted in *The Advanced History of India,* pp. 813-14 from Rammohan's English Biographer. Also vide, *The Father of Modern India* : Rammohan Roy Centenary volume p. 313.

১৮৪৪), কালীনাথ মুন্সী (১৮০১-৪০), বৈকুণ্ঠনাথ মুন্সী (১৮০৬-৫৫), রাজা কালীশঙ্কর ঘোষাল এবং আরও অনেকের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

রক্ষণশীল দলের নেতৃবৃন্দ

রামমোহনের ধর্মমতের বিরুদ্ধে যে সকল রক্ষণশীল হিন্দু প্রতিবাদ করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে রাধাকান্ত দেব (১৭৮৪-১৮৬৭), ভবানীচরণ ব্যানার্জী, রামকমল সেন, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। কিন্তু ইহা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, এই সকল রক্ষণশীল নেতৃবর্গ রামমোহন রায়ের ধর্মমত সম্পর্কে প্রতিবাদ করিলেও তাঁহার সমাজ-সংস্কার, রাজনৈতিক মতবাদ প্রভৃতির সমর্থক ছিলেন।

নবযুগের বিকাশ (Evolution of the New Age)ঃ ধর্মাশ্রয়ী ভারতবাসীর কোন প্রকৃত উন্নতিসাধনে ধর্ম ও নৈতিকতাকে বাদ দিলে যে কোন কালেই চলিবে না, সে কথা রাজা রামমোহন রায় ও তাঁহার সমসাময়িক কালের ধর্মনৈতিক আন্দোলনে প্রকাশলাভ করিয়াছিল। প্রাচীনযুগে হিন্দু সংস্কৃতি ও ধর্ম বহিরাগত গ্রহণযোগ্য কোন প্রভাবকে স্বীকার করিয়া লইতে পশ্চাদ্‌পদ ছিল না। কিন্তু মুসলমান শাসনকালে ভারতীয় সংস্কৃতি ও ধর্মের এই উদারতা লোপ পাইয়াছিল। নবচেতনার সহিত সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য যুগধর্মের সহিত তাল রাখিয়া ধর্মের ক্ষেত্রেও যুক্তিযুক্ত পরিবর্ধন ও পরিবর্তন প্রভৃতির প্রয়োজনীয়তা রামমোহন রায় যেমন উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তেমনি করিয়াছিলেন দয়ানন্দ ও শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস। অবশ্য ইঁহাদের মূল উদ্দেশ্যের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকিলেও পন্থার পার্থক্য ছিল। ভারতের জাতীয় জীবনের অপরাপর স্তরে নবচেতনার প্রাথমিক প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায় ধর্মনৈতিক সংস্কারসাধনে এবং কুসংস্কার হইতে মুক্ত হইবার আগ্রহে। মিসেস্ এ্যানি বেসান্ত এই কারণে বলিয়াছিলেন যে, ভারতে কোন সংস্কারকে যদি প্রকৃত সংস্কারে পরিণত করিতে হয় তাহা হইলে উহাকে ধর্মাশ্রয়ী করা একান্ত প্রয়োজন। ভারতের নবজাগরণের ক্ষেত্রেও একথার সত্যতা পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং নবজাগরণের উন্মেষ, পূর্ণবিকাশ ও পরিণতির আলোচনায় সর্বাগ্রেই ধর্মনৈতিক চেতনার আলোচনা করা প্রয়োজন।

ভারতে আন্দোলন মাত্রেই ধর্মাশ্রয়ী ও নৈতিকতা-ভিত্তিক

এ্যানি বেসান্ত-এর উক্তি

ব্রাহ্মসমাজঃ রাজা রামমোহন রায়ের বিপ্লবী মন হিন্দুধর্মের অসার আনুষ্ঠানিক দিকটাকে বর্জন করিয়া বেদান্ত ও উপনিষদের ভিত্তিতে উহাকে

একেশ্বরবাদী ও কুসংস্কারমুক্ত করিয়া তুলিতে চাহিয়াছিল। তাঁহার 'আত্মীয় সভা'-ই পরবর্তী কালের ব্রাহ্মসমাজের পূর্বাভাষ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে।

ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা, রামমোহনের ধর্মমতের সর্বজনীনত্ব

সর্বজনীনত্ব-ই ছিল রামমোহন রায়ের ধর্মমতের মূলকথা। কিন্তু তাঁহার প্রচারিত ধর্মমত হিন্দুধর্ম হইতে পৃথক, একথা মনে করা ভুল হইবে। বস্তুত মনীষী ব্রজেন্দ্রনাথের ভাষায় তিনি ছিলেন 'Brahmin of the Brahmins.' তিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত উপবীত ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ধর্মমতে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, ইস্‌লাম ও খ্রীষ্ট ধর্মের মূলগত একেশ্বরবাদেরই প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। পরবর্তী কালে ব্রাহ্মধর্ম যে রূপ লাভ করিয়াছিল, উহা রামমোহনের প্রবর্তিত ধর্মমত হইতে পৃথক, একথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে।

যাহা হউক রামমোহনের আরব্ধ কার্য পরবর্তী কালে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতা দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র সেন সম্পন্ন করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার মাধ্যমে ব্রাহ্ম-সমাজ আন্দোলনকে ব্যাপক করিয়া তুলিতে সচেষ্ট হইলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি কতিপয় ধর্মপ্রচারকও নিয়োগ করিলেন। ক্রমে ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে

কেশবচন্দ্র সেন ও ব্রাহ্মসমাজ

অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক কয়েকজন অক্ষয়কুমার দত্তের নেতৃত্বে বেদের অপৌরুষেয়তার সমালোচনা শুরু করিলেন। তাঁহারা যুক্তিবাদের সূক্ষ্ম মাপকাঠিতে সব কিছু বিচার করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কেশবচন্দ্র সেন ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে এই আন্দোলনে যোগদান করিলেন। তাঁহার বাগ্মিতা ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলনের প্রতি এক ব্যাপক ঔৎসুক্যের সৃষ্টি করিল। অনেকে এই ধর্ম গ্রহণ করিয়া আন্দোলনে যোগদান করিলেন। কেশবচন্দ্র সেন-ই ব্রাহ্মধর্ম বলিতে যাহা বুঝায় তাহার প্রবর্তন করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের অত্যধিক প্রগতিশীল-সংস্কারনীতির সহিত শেষ পর্যন্ত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরেরও তাল রাখিয়া চলা সম্ভব হইল না। দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁহার অনুচরবর্গকে ব্রাহ্মসমাজ হইতে বহিষ্কার করিলেন। কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁহার অনুচরবৃন্দ একটি প্রতিদ্বন্দ্বী ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিলেন। কেশবচন্দ্র যীশুখ্রীষ্টের ধর্মনীতির উপর ভিত্তি করিয়া অনুশোচনা ও ভগবদ্‌প্রেম ব্রাহ্মধর্মের মূলনীতি হিসাবে গ্রহণ করিলেন। উপরন্তু তিনি বৈষ্ণবদের সংকীর্তন-রীতি গ্রহণ করিয়া যীশুবাদ ও চৈতন্যবাদের

সংমিশ্রণ সাধন করিলেন।* বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব হেতু ব্রাহ্মসমাজে ভক্তিবাদের প্রাধান্য ঘটিল। পরস্পর পরস্পরকে এবং বিশেষভাবে কেশব সেনকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিবার রীতিও চালু হইল। এই সূত্রে কেশব সেন-পরিচালিত ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে মতদ্বৈধের সৃষ্টি হইল। অগ্রগতিশীল দলের স্ত্রী-স্বাধীনতা ও স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে অত্যধিক উদারতা কেশব সেনের মনঃপূত হইল না। পর্দা-প্রথা সম্পূর্ণ-ভাবে উঠাইয়া দেওয়া, স্ত্রীজাতিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া বা স্ত্রী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনক হইবে না—এই ছিল কেশব সেনের ধারণা। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে কেশব সেন নিজ নাবালিকা কন্যাকে কুচবিহারের হিন্দুমহারাজার সহিত বিবাহ দিলে প্রগতিপন্থিগণ তাঁহার নেতৃত্ব হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলেন। ইঁহারা 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' নামে এক নূতন ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিলেন। কেশব সেন-পরিচালিত ব্রাহ্মসমাজ 'নববিধান' নামে পরিচিতি লাভ করিল।

যীশু ও শ্রীচৈতন্যের প্রভাবের সংমিশ্রণ

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ শাসনতান্ত্রিক উপায়ে সামাজিক সংস্কার-সাধনের পক্ষপাতী ছিল। পর্দা-প্রথা, বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহপ্রথা প্রভৃতি পরিত্যাগ, এবং বিধবা-বিবাহ, স্ত্রীজাতির উচ্চশিক্ষা প্রভৃতি নানাবিধ প্রগতিশীল সংস্কারের জন্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ দাবি উত্থাপন করিল। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় কর্তৃক হিন্দু বিধবা-বিবাহ আইনের সমর্থনে ব্রাহ্মসমাজ কর্তৃক তদানীন্তন হিন্দুসমাজের উপর প্রভাব-বিস্তৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, উপরি-উক্ত সংস্কারগুলি সব কয়টিই হিন্দুসমাজে ক্রমে গৃহীত হইয়াছে। জাতিভেদ-প্রথার ক্ষেত্রেও একথা বলা যায়। জাতি ত্যাগ না করিয়াও অপর জাতির লোকের সহিত বসিয়া খাওয়া-দাওয়া, সমুদ্রযাত্রা প্রভৃতি সমাজে দূষণীয় নহে এই রীতি হিন্দু-সমাজেও আজ প্রায় সর্বজনসম্মত হইয়া উঠিয়াছে। এই সকল দিক দিয়া নবযুগের সৃষ্টিতে ব্রাহ্মসমাজের দান যথেষ্ট রহিয়াছে। অবশ্য একেশ্বরবাদ-প্রচারে ব্রাহ্মসমাজ অকৃতকার্য হইয়াছে স্বীকার করিতে হইবে।

ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলনের অবদান

প্রার্থনাসমাজ ঃ ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলন বাংলাদেশের সীমা অতিক্রম

* At first "Jesus was the inspirer and teacher of Keshab Sen and now came Chaitanya. The two streams combined and made a confluence which soon produced novel and striking results." Vide, *Advanced History of India*, p. 879.

করিয়া ভারতের অপরাপর অংশেও বিস্তারলাভ করিয়াছিল। কিন্তু মহারাষ্ট্রে ইহার প্রভাব ছিল সর্বাধিক। কেশবচন্দ্র সেনের বাগ্মিতা ও আকর্ষণী ব্যক্তিত্বের প্রভাবে ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রে 'প্রার্থনাসমাজ' নামে একটি সংগঠন সৃষ্টি হয়। ব্রাহ্মসমাজ হইতে ইহার পার্থক্য ছিল এই যে, ইহা হিন্দুধর্মেরই একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল। নামদেব, তুকারাম, রামদাস প্রভৃতি মহারাষ্ট্রীয় ধর্মবীরদের মূল নীতি গ্রহণ করিয়া 'প্রার্থনাসমাজ' হিন্দুধর্মের আভ্যন্তরীণ একটি সংগঠন হিসাবে সামাজিক সংস্কারের পক্ষপাতী ছিল। অস্পৃশ্যতা-বর্জন, জাতিভেদ দূরীকরণ, অসবর্ণ বিবাহ, বিধবা-বিবাহ, সমাজের নিম্নস্তরের লোকের উন্নয়ন প্রভৃতি ছিল প্রার্থনাসমাজের কর্মসূচী। মাধবগোবিন্দ রাণাডে ছিলেন প্রার্থনাসমাজের প্রাণস্বরূপ। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহারই চেষ্টায় বিধবা-বিবাহ সমিতি (Widow Marriage Association) নামে একটি সংস্থা স্থাপিত হইয়াছিল। দাক্ষিণাত্যে 'এডুকেশন সোসাইটি' তাঁহারই চেষ্টায় স্থাপিত হইয়াছিল। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠায়ও রাণাডের দান স্মরণযোগ্য। রাণাডে ভারতীয়দের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নের উপর জোর দিতেন। মানুষের উন্নতির জন্য তাহার আংশিক উন্নয়নের চেষ্টা করা অযৌক্তিক এবং প্রকৃত উন্নতি-সাধনের পথই হইল মানুষকে প্রকৃত মানুষ হিসাবে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করা। সামাজিক, অর্থনৈতিক, নৈতিক বা রাজনৈতিক যে-কোন প্রকার উন্নতির পন্থা এবং উদ্দেশ্য হইল সমাজের লোকের উন্নতি-সাধন। মানুষে মানুষে সম্প্রীতি এবং মানুষের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির মধ্যেই সমাজের উন্নতির বীজ নিহিত, এই সত্যটি তিনি প্রচার করিয়াছিলেন। রাণাডের প্রভাবেই তদানীন্তন সংস্কার-নীতি অধিকতর মানবধর্মী হইয়া উঠিয়াছিল। গোবিন্দ রাণাডে ছিলেন বোম্বাই বিচারালয়ের একজন বিচারপতি। তাঁহার সংস্কারনীতি স্বভাবতই পাশ্চাত্ত্য ভাবধারার প্রভাবে প্রভাবিত ছিল। এদিক দিয়া রামমোহন রায়ের সহিত তাঁহার কতক সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়।

'প্রার্থনাসমাজ' হিন্দুধর্মের অবিচ্ছেদ্য অংশ

মাধবগোবিন্দ রাণাডে

আর্যসমাজ ঃ ব্রাহ্মসমাজ ও প্রার্থনাসমাজ ছিল পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাবে প্রভাবিত আন্দোলন। কিন্তু সম্পূর্ণ ভারতীয় ঐতিহ্য, ধর্ম ও সংস্কৃতিকে ভিত্তি করিয়া আরও দুইটি ধর্ম ও সমাজ-সংস্কার আন্দোলন

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ভাগে ভারতবাসীর মনের উপর এক গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। এই দুয়ের একটি ছিল 'আর্যসমাজ' এবং অপরটি 'রামকৃষ্ণ মিশন'। আর্যসমাজ আন্দোলনের জনক ছিলেন স্বামী দয়ানন্দ স্বরস্বতী (১৮২৪-১৮৮৩)। সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল, কিন্তু পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা তিনি মোটেই গ্রহণ করেন নাই। দয়ানন্দ রামমোহন রায়ের মতোই একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। ইহা ভিন্ন তিনি তদানীন্তন হিন্দুধর্মকে কুসংস্কারমুক্ত করিয়া বৈদিক ধর্মের পুনঃপ্রবর্তন করিতে চাহিয়াছিলেন। জাতি-ভেদপ্রথা, বাল্যবিবাহ প্রভৃতি সামাজিক কুসংস্কার হইতে মুক্তি ছিল তাঁহার আর্যসমাজ আন্দোলনের অন্যতম উদ্দেশ্য। ইহা ভিন্ন সমুদ্রযাত্রা, স্ত্রীশিক্ষা, বিধবা-বিবাহ প্রভৃতিরও তিনি উৎসাহ দান করিতেন। দয়ানন্দ-প্রবর্তিত আর্যসমাজ-অন্দোলনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখ-যোগ্য দিক হইল 'শুদ্ধি'। অহিন্দুগণ হিন্দুধর্ম গ্রহণেচ্ছু হইলেই তাহাদের 'শুদ্ধি' অনুষ্ঠানের দ্বারা হিন্দুধর্মে ধর্মান্তরিত করিবার উদার পন্থা স্বামী দয়ানন্দই সর্বপ্রথম প্রবর্তন করেন। তাঁহার সংস্কারমুক্ত ও দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ মন ভারতবাসীকে এক ধর্ম, এক জাতি ও একই সমাজে ঐক্যবদ্ধ এক গভীর জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করিতে চাহিয়াছিল। এই নূতন ধারা প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে দয়ানন্দ 'সত্যার্থ প্রকাশ' নামে একখানি গ্রন্থে আর্যসমাজের যাবতীয় নীতির ব্যাখ্যা প্রকাশ করিয়াছিলেন। বৈদিক ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা জাগাইয়া জাতিকে আত্মবিস্মৃতি হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে দয়ানন্দ তাঁহার আর্যসমাজ আন্দোলনে আপামর সাধারণকে আহ্বান জানাইয়াছিলেন। রামমোহন রায় তথা গোবিন্দ রাণাডের ন্যায় সমালোচকের মনোবৃত্তি দয়ানন্দের মধ্যে হয়ত ছিল না। কিন্তু তাঁহার চেষ্টায় হিন্দুধর্ম এক সর্বগ্রাসী শক্তিতে পরিণত হইতে চলিয়াছিল। তিনি-ই সর্বপ্রথম জনসাধারণকে তাঁহার এই আন্দোলনে যুক্ত করিয়াছিলেন। রামমোহন রায় বা রাণাডের আন্দোলন কেবলমাত্র শিক্ষিত সমাজের এক ক্ষুদ্রসংখ্যক ব্যক্তিকে দলভুক্ত করিয়াছিল, কিন্তু দয়ানন্দ জনসাধারণের নিকট আবেদন জানাইয়া ভবিষ্যতে রাজনৈতিক,

আর্যসমাজ-আন্দোলনের সূচনা—স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী

জাতিভেদপ্রথা, বাল্য-বিবাহ দূরীকরণ, সমুদ্রযাত্রা, স্ত্রীশিক্ষা, বিধবা-বিবাহের উৎসাহ দান

'শুদ্ধি'-আন্দোলন

সামাজিক তথা যে-কোন সংস্কারের পশ্চাতে ভারতের বিশাল জনসাধারণের সমর্থন একান্ত প্রয়োজন, এই সত্যটি প্রমাণিত করিয়াছিলেন। আর্যসমাজের সামাজিক. ধর্মনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংস্কার-কার্যাদি অদ্যাপি ভারতের উল্লেখ-যোগ্য উন্নয়নমূলক প্রভাব হিসাবে বিদ্যমান। দয়ানন্দ সরস্বতীর মৃত্যুর পর লালা হন্‌সরাজ, পণ্ডিত গুরুদত্ত, লালা লাজপৎ রায় ও স্বামী শ্রদ্ধানন্দ এই আন্দোলনকে অধিকতর শক্তিসঞ্চয়ে সাহায্য করিয়াছিলেন। ক্রমে আর্যসমাজ পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা এবং সমাজের অগ্রগতির সহিত পা-ফেলিয়া চলিবার জন্য অপরাপর উদারপন্থী সংস্কার নীতি গ্রহণ করিয়াছে। স্কুল-কলেজ স্থাপন করিয়া পাশ্চাত্ত্য ও প্রাচ্য উভয় প্রকার শিক্ষার প্রসারের মাধ্যমে সমাজ-উন্নয়ন, শুদ্ধি, সমাজসেবা প্রভৃতি কার্যাদি অদ্যাপি আর্যসমাজ করিতেছে।

আর্যসমাজ-আন্দোলনের আবেদনের সর্বজনীনতা

রামকৃষ্ণ মিশন: উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে যেমন রাজা রামমোহন রায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির এক অভূতপূর্ব সমন্বয়ের মূর্ত প্রতীক-রূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তেমনি সেই শতাব্দীরই দ্বিতীয়ভাগে অপর এক মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়া ধর্ম ও সমাজক্ষেত্রে প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্যের ভাব-ধারার এক অভূতপূর্ব সমন্বয় সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইনি হইলেন দক্ষিণেশ্বরের মহাপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস (১৮৩৫-৮৬)। রামকৃষ্ণ অতি সাধারণ পুরোহিত ছিলেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা বলিতে সাধারণতঃ যাহা বুঝায় সেইরূপ কোন শিক্ষাই তাঁহার ছিল না। কিন্তু তিনি ছিলেন ঐশ্বরিক শক্তির প্রতীকস্বরূপ। শিক্ষিতদের শিক্ষা দিবার ক্ষমতা তাঁহার অন্তরে জাগিয়াছিল। তাঁহার মুখনিঃসৃত চরম সত্য অপর কোন মনীষীর মুখ হইতে এতটা সহজভাবে এবং সহজ ভাষায় বাহির হইয়াছিল কিনা সন্দেহ। ম্যাক্স মূলার (Max Muller) বলিয়াছিলেন: "অশিক্ষিত রামকৃষ্ণের সহিত তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে, ইওরোপের শিক্ষিত শ্রেষ্ঠ মনীষিগণ এখনও অন্ধকারে হাতড়াইয়া মরিতেছেন।"

শ্রীরামকৃষ্ণ (১৮৩৫-৮৬)

রামমোহন রায়-প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজ পরবর্তী কালে রূপান্তরিত হইয়া হিন্দুধর্মের গণ্ডি ত্যাগ করিয়াছিল। হিন্দুধর্মকে সংস্কারমুক্ত করিতে গিয়া ব্রাহ্ম-সমাজ এক নূতন ধর্মস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। প্রার্থনাসমাজ ও আর্যসমাজ

অবশ্য হিন্দুধর্মের অভ্যন্তরে থাকিয়া-ই উহার সংস্কারের জন্য সচেষ্ট ছিল। কিন্তু হিন্দুধর্মের মূল উৎস বেদ-এর উপর নির্ভর করিয়া মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধন এবং প্রচলিত মূর্তিপূজার মাধ্যমেও চরম অধ্যাত্ম জ্ঞানলাভের পন্থা প্রদর্শন করিয়া রামকৃষ্ণ হিন্দুধর্মের শক্তির পুনঃপ্রকাশ করিয়াছিলেন। হিন্দুধর্মের বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানের উপর অধিকতর জোর দিয়া হিন্দুধর্মের মূলনীতি তদানীন্তন হিন্দুসমাজ বিস্মৃত হইয়াছিল। রামকৃষ্ণ সেই কারণে বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানের সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে হিন্দুধর্মকে আবদ্ধ না রাখিয়া উহার মূল উদারতা ও ব্যাপকতা সকলের নিকট উদ্ঘাটিত করিলেন। তাঁহার ধর্মমতের মূল আবেদন ছিল মানবতার আবেদন। শ্রীরামকৃষ্ণ সাধারণ মানুষ হিসাবেই জন্মিয়াছিলেন। অধিকাংশ ভারতবাসীর ন্যায়-ই পাশ্চাত্ত্য বা প্রাচ্য শিক্ষা গ্রহণের তাঁহার কোন সুযোগ ছিল না। তাই তাঁহার ভাষা ছিল অন্তরের ভাষা। কৃত্রিমতার স্থান সেখানে ছিল না। তাঁহার কথায় মানুষ বৃহত্তর মানবগোষ্ঠীর অন্তরের কথা-ই যেন শুনিতে পাইয়াছিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই সাদাসিধা মানুষটির অন্তরে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান সকল ধর্মের সমন্বয়ের, সকল ধর্মের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধার পরিচয় বিকাশ লাভ করিয়াছিল। ভিন্ন ভিন্ন ভাষা-ভাষীর নিকট জলের নাম যেমন ভিন্ন ভিন্ন, তেমনই একই ভগবানের ভিন্ন ভিন্ন নাম হইল খোদা, খ্রীষ্ট, হরি বা কৃষ্ণ—এরূপ সহজভাবে ধর্মকে প্রকাশ করিবার শক্তি আর কাহারো ছিল কিনা সন্দেহ। বাহ্যিক অনুষ্ঠান, খাদ্যাখাদ্য প্রভৃতির উপর ধর্ম নির্ভরশীল একথা রামকৃষ্ণ মনে করিতেন না। আধুনিকতা এবং হিন্দুধর্মের প্রতি অবিশ্বাস যখন বাংলার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনে এক অনিশ্চয়তার সৃষ্টি করিয়াছিল, তখন রামকৃষ্ণের বাণী হিন্দুধর্মের অন্তর্নিহিত শক্তি পুনরায় সর্বজনসম্মুখে প্রকাশিত করিল। তাঁহার সুযোগ্য শিষ্য নরেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁহার বাণীকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছাইলেন। শিকাগোর সর্বধর্ম সম্মেলন (Parliament of Religions) অনুষ্ঠানে নরেন্দ্রনাথ হিন্দুধর্মের মূল স্বরূপ সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী প্রচার করিলেন। হিন্দুধর্ম নরেন্দ্রনাথের প্রচারের ফলে এক জগদ্ধর্মে পরিণত হইল। আমেরিকাবাসীর মধ্যে হিন্দুধর্মের প্রচার ইহার প্রমাণস্বরূপ। নরেন্দ্রনাথ দত্ত

হিন্দুধর্মের মূলনীতি ও শক্তির পুনর্বিকাশ

শ্রীরামকৃষ্ণের মানবতা

তাঁহার উদারতা

স্বামী বিবেকানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দ নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ। রামকৃষ্ণের ধর্মমতে সমাজসেবাই ধর্মের অন্যতম প্রধান অঙ্গ। এই সূত্রে স্বামী বিবেকানন্দের বাণী প্রণিধানযোগ্য ঃ

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর ?
জীবে প্রেম করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।"

শুধু ধর্মের ক্ষেত্রেই নহে, রাজনীতি ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ চিন্তা ও দৈহিক শক্তির প্রয়োজনীয়তা, দেশ ও সমাজের জন্য আত্মত্যাগের প্রয়োজনীয়তা বিবেকানন্দের বাণীতে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণের দান

পূর্বেই একথা উল্লেখ করা হইয়াছে যে, নৈতিকতা ও ধর্মকে ত্যাগ করিয়া কোন আন্দোলনই ভারতের বুকে সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই। ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতি ধর্মাশ্রয়ী সংস্কৃতি। রামকৃষ্ণ হিন্দুধর্মকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতিকে পুনরায় জাগাইয়া তুলিয়াছিলেন। ধর্মের ক্ষেত্রে এইভাবে বাঙালী জাতির চিন্তাধারা যখন আত্মবিস্মৃতির পথ ত্যাগ করিয়া আত্মদর্শনের দিকে ধাবিত হইল, তখন উহা এক বিশাল শক্তি হিসাবে জাতীয় জীবনের প্রতি স্তরে সৃষ্টি করিল এক নবজাগরণ। বাংলা তথা ভারতীয় নবজাগরণে শ্রীরামকৃষ্ণ এবং তাঁহার সুযোগ্য শিষ্য বিবেকানন্দের অবদান শ্রদ্ধার সহিত স্মরণীয়। বাংলার শিল্প-কলায়, বাঙালীর সাহিত্যে—সর্বত্রই মূল ভারতীয় মন, ভারতায় জাতীয়তা-বোধ ও ভারতীয় কৃষ্টির প্রকাশ দেখিতে পাওয়া গেল।

এ্যানি বেসান্ত

থিওসোফিক্যাল সোসাইটি ঃ মার্কিন কর্ণেল ওলকট্ (Col. Olcott) এবং ম্যাডাম ব্লাভাট্স্কি (Madam Blavatski) ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকায় 'থিওসোফিক্যাল সোসাইটি' (Theosophical Society) নামে একটি সমাজের প্রতিষ্ঠা করেন। কয়েক বৎসর পর (১৮৭৯) তাঁহারা ভারতবর্ষে চলিয়া আসেন এবং মাদ্রাজের আদিয়ার নামক স্থানে নূতন কর্মস্থল গড়িয়া তোলেন। মিসেস্ এ্যানি বেসান্ত (Mrs. Annie Besant) এই সমাজকে হিন্দু সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের এক শক্তিশালী সঙ্ঘে পরিণত করিয়াছিলেন। সমাজ ও ধর্ম-সংস্কারের আদর্শে

গোপালকৃষ্ণ গোখেল

উদ্বুদ্ধ এই সঙ্ঘ হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবনে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল। এই উদ্দেশ্যেই এ্যানি বেসান্ত বারাণসী সেণ্ট্রাল হিন্দু স্কুল নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। পরবর্তী

কালে উহাকে কেন্দ্র করিয়া মদনমোহন মালব্যের চেষ্টায় বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় গড়িয়া উঠিয়াছিল। গোপালকৃষ্ণ গোখেল (১৮৬৬-১৯১৫) থিওসোফিক্যাল সোসাইটির অন্যতম স্বনামধন্য সদস্য ছিলেন।

বাংলার নবজাগরণের পরিণতি (Flowering of the Bengal Renaissance) : ইওরোপের নবজাগরণের প্রকাশ যেমন রাজনীতি, সাহিত্য, সমাজ ও সংস্কৃতি কোন দিকই বাদ দেয় নাই, বাংলার নবজাগরণও তদ্রূপ এই সকল বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রকাশ পাইয়াছিল। বাংলার নবজাগরণের ভাবধারা-প্রভাবিত অন্যতম শ্রেষ্ঠ হিউম্যানিস্ট্ বা মানবতাবাদী ছিলেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। রামমোহন যুগের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ প্রভাবগুলির সংমিশ্রণে নবযুগের যে সূচনা হইয়াছিল, তাহার দৃষ্টান্ত হিসাবে বিদ্যাসাগরের নাম উল্লেখ করা যায়। খাঁটি হিন্দু পণ্ডিত হিসাবে শিক্ষা-দীক্ষা গ্রহণ করিলেও বিদ্যাসাগর পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাকে অবহেলা করেন নাই। তাঁহার মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির এক অভূতপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল। সমাজ-সংস্কার, কুসংস্কার হইতে মুক্তি, বিধবা-বিবাহ, সমাজের লাঞ্ছিত ও নিপীড়িতদের মুক্তিসাধন প্রভৃতি রামমোহনা প্রভাব যেমন তাঁহার চরিত্রের একদিক জুড়িয়া রহিয়াছিল, অপর দিকে খাঁটি হিন্দুধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা, ব্রাহ্মণ্য ধর্মপালন প্রভৃতিতে এবং বিশেষভাবে সংস্কৃত সাহিত্যের উন্নয়নের মাধ্যমে ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন প্রভৃতিতে ঈশ্বর-চন্দ্রের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-৯১)

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতি মিশ্রণের প্রতীক

স্ত্রীশিক্ষা, বাংলা ভাষা, সংস্কৃত সাহিত্য প্রভৃতির ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের দান অবিস্মরণীয়। তাঁহার উদার ও সংস্কার-কামী মন বাল্যবিবাহ-নিরোধ, বিধবা-বিবাহের প্রচলন প্রভৃতি প্রয়োজনীয় সংস্কারের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। বিধবা-বিবাহ আইন প্রণয়নের পশ্চাতে বিদ্যাসাগরের চেষ্টাই ছিল সর্বাধিক। তাঁহার ব্যক্তিগত ও জাতীয় মর্যাদাবোধ, ইংরাজদের প্রতি তাঁহার স্বাধীনতা-ব্যঞ্জক ব্যবহার হইতেই প্রমাণিত হয়। সাধারণ লোকের প্রতি সহানুভূতি, দুঃস্থদের প্রতি তাঁহার দয়াদাক্ষিণ্য এবং সর্বোপরি তাঁহার উচ্চাদর্শের

সমাজ-সংস্কার, বাংলা সাহিত্যে জাতীয়তাবোধ

নৈতিকতাপূর্ণ ব্যক্তিগত জীবন ও চরিত্র তাঁহাকে ভারতীয় সংস্কৃতির এক অতি সুন্দর প্রতীকস্বরূপ করিয়া তুলিয়াছিল।

বাংলা সাহিত্যের পরিস্ফুটন

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলার রেনেসাঁস বা নবজাগরণের পরিস্ফুটন সাহিত্যের ক্ষেত্রে দেখা দিল বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, মাইকেল মধুসূদন দত্ত এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাংলা রচনায়। ইওরোপের রেনেসাঁসের অন্যতম প্রকাশ পরিলক্ষিত হইয়াছিল দেশীয় ভাষার উন্নতিতে। বস্তুতঃ নবজাগরণের স্বাভাবিক ও সাবলীল প্রকাশ মাতৃভাষায়-ই সম্ভব। বাংলাদেশেও নিজস্ব ভাষার মাধ্যমে আত্মপ্রকাশের চেষ্টা দেখা গেল। মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা নাটক' ও 'মেঘনাদবধ কাব্য' বাংলার সাহিত্য-জগতে এক গভীর আলোড়নের সৃষ্টি করিল। মধুসূদন অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করিয়া বাংলা সাহিত্যে এক বিপ্লব আনিলেন। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' তদানীন্তন ইঙ্গ বণিকদের অত্যাচারী ও স্বার্থান্বেষী নীতির বিরুদ্ধে এক তীব্র প্রতিবাদ জানাইল। নীলকর সাহেবদের অমানুষিক অত্যাচারে বাংলার কৃষক সম্প্রদায়ের শোচনীয় দুর্দশার চিত্র সর্বসমক্ষে উপস্থাপিত হইল। কিন্তু বাংলা ভাষাকে প্রকৃত সাহিত্যের ভাষায় রূপান্তরিত করিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার 'দুর্গেশনন্দিনী' ও ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে 'বিষবৃক্ষ' প্রকাশিত হইল। প্রায় সেই সময়েই (১৮৭২) বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন' নামে বাংলা সাংস্কৃতিক পত্রিকার প্রকাশন শুরু করিলেন। বাংলা সাহিত্য জগতে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার নব-সৃজনী শক্তিদ্বারা এক নবচেতনা জাগাইয়া তুলিলেন। 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এ (১৮৭৫) বঙ্কিমচন্দ্রের নিজ মানবিকতা ও জাতীয়তাবোধের প্রকাশ দেখিতে পাওয়া গেল। তারপর আসিল তাঁহার জাতীয়তাবোধের চরম অভিব্যক্তি। 'আনন্দমঠ' গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্র স্বাদেশিকতার যে মন্ত্র ভারতবাসীকে দিয়া গিয়াছেন, সমগ্র ভারতবর্ষ এবং সকল ভারতবাসীকে উহার সম্মোহনী শক্তি এক গভীর দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ

মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩)

দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-১৮৭৩)

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪)

জাতীয়তাবোধের চরম অভিব্যক্তি 'বন্দেমাতরম্'

করিয়াছিল। 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্র ভারতীয় জাতীয়তা ও স্বাদেশিকতার বীজমন্ত্রস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল।

অপরাপর মনীষিগণ

সেই যুগে কালীপ্রসন্ন সিংহ, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন, বিহারীলাল চক্রবর্তী, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি মনীষিগণও তাঁহাদের সাহিত্য-সেবা দ্বারা বাংলার রেনেসাঁস বা নবজাগরণের সম্পূর্ণতা আনয়নে সাহায্য করিয়াছিলেন। ডক্টর মহেন্দ্রলাল সরকার বৈজ্ঞানিক গবেষণার সূত্রপাত করিয়াছিলেন। তাঁহারই চেষ্টায় Indian Association for the Cultivation of Scientific Research প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হইয়াছিল।

বাংলাদেশ ভারতের জাগরণের অগ্রদূত

বাংলাদেশে যে নবজাগরণের সূচনা হইয়াছিল উহা ক্রমে ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ফলে, সমগ্র ভারতব্যাপী এক বিরাট জাগরণের সৃষ্টি হইয়াছিল। এই নবজাগরণের সূত্র ধরিয়া সমগ্র ভারতে এক শক্তিশালী জাতীয় আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছিল।

ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত (১৮৮৫) জাতীয়তাবাদী আন্দোলন [National Movement upto the foundation (1885) of the Indian National Congress] : প্রত্যেক বিপ্লবের পশ্চাতেই একটা মানসিক প্রস্তুতির প্রয়োজন থাকে। 'বিপ্লব' শব্দটিতে 'প্লব' অর্থাৎ প্লাবনের ধারণা সুস্পষ্ট। এই প্লাবন সৃষ্টি করিতে হইলে সর্বপ্রথমেই প্রয়োজন হয় ভাবধারার প্লাবনের। শক্তিশালী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ যখন ভারতবর্ষকে কুক্ষিগত করিয়া নিজ স্বার্থসিদ্ধিসাধনে ব্যস্ত, সেই সময়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে ভারতীয়দের ভাবজগতে এক বিরাট পরিবর্তন ঘটিতেছিল। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংঘর্ষ ও সমন্বয়ের মাধ্যমে ভারতবর্ষের অন্তস্থলে এক জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি হইতেছিল।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংমিশ্রণের ফল

ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্য-আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষিত সমাজের মধ্যে ইওরোপীয় রাজনীতি ও অর্থনীতি, ইওরোপীয় জাতীয়তা ও দেশাত্মবোধের জ্ঞান বিস্তার লাভ করিতে লাগিল। গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ শিক্ষিত ভারতীয়দের মনে গভীর রেখাপাত করিল। ক্রমে এই দুইটি ধারা ভারতীয়-

দের জাতীয় আদর্শস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইওরোপ ও আমেরিকায় গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের যে বিশাল তরঙ্গ উত্থিত হইয়াছিল, পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতবাসীর নিকট সেই ইতিহাস অবিদিত ছিল না। ফরাসী বিপ্লব, আমেরিকার স্বাধীনতা-যুদ্ধ প্রভৃতি গণতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলন কেবলমাত্র ইওরোপ ও আমেরিকায়ই সীমাবদ্ধ ছিল, মনে করা ভুল হইবে। সেগুলির তরঙ্গাঘাত শিক্ষিত ভারতবাসীকেও উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। উদারপন্থী ব্রিটিশ রাজনীতিকদের প্রচারিত আদর্শ এবং ভারতীয়দের উদার ও জাতীয়তাবাদী আশা-আকাঙ্ক্ষায় তাঁহাদের সহানুভূতি স্বভাবতই এই সকল ভাবধারার বিস্তৃতিতে সাহায্য করিয়াছিল। মিল, বেন্থাম্ প্রভৃতি মনীষীদের রচনা ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে এক নূতন চেতনার সৃষ্টি করিয়াছিল। ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্য সম্পর্কে আলোচনা এবং প্রাচীন সংস্কৃতি ও সাহিত্য সম্পর্কে গবেষণার ফলে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতবাসীর মধ্যে, ভারতবর্ষের সব কিছুই অবহেলার যোগ্য এই ধারণা দূরীভূত হইয়াছিল। 'এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল' (Asiatic Society of Bengal)-এর দান এবিষয়ে উল্লেখযোগ্য। সার উইলিয়াম জোন্স ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার 'শকুন্তলা' কাব্যের ইংরাজী অনুবাদ সংস্কৃত সাহিত্যের জ্ঞানভাণ্ডার ইওরোপীয়দের নিকট উন্মুক্ত করিয়াছিল। ম্যাক্স মূলার ও উইলিয়াম-এর নামও এবিষয়ে উল্লেখযোগ্য। সর্বোপরি ব্রিটিশ শাসনাধীনে ঐক্যবদ্ধ ভারতে একই প্রকার আইন-কানুন প্রভৃতি প্রচলিত হওয়ায় সর্বত্র একই প্রকার সুযোগ-সুবিধা ও অভাব-অভিযোগের সৃষ্টি হইল। ইহার ফলেও ব্রিটিশের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার মনোবৃত্তি গড়িয়া উঠিবার পথ প্রশস্ত হইয়াছিল, বলা বাহুল্য।

পাশ্চাত্ত্য জগতের রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রভাব

পাশ্চাত্ত্য মনীষীদের রচনার প্রভাব—গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ

ভারতবর্ষে ব্রিটিশ প্রভুত্ব স্থাপনের বিভিন্ন পর্যায়ে ভারতবর্ষের শাসন-ব্যবস্থায় উদার-নীতি অনুসরণের নির্দেশ এবং সদিচ্ছার প্রকাশও পরিলক্ষিত হয়। ওয়ারেন হেস্টিংসের ইম্পাচমেণ্ট্ কালে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে এড্মণ্ড বার্ক প্রমুখ

উদারপন্থী ব্রিটিশদের সহানুভূতি

নেতৃবর্গের উক্তি হইতে ব্রিটিশ-ভারতীয় শাসনব্যবস্থায় উদারতা অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃতি পাইয়াছিল।

১৮১৩ এবং ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের চার্টার এ্যাক্ট-এ ভারতীয় শাসনব্যবস্থাকে অধিকতর জনকল্যাণকর করিয়া তুলিবার নির্দেশ সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের পর মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণায় (১৮৫৮) ভারতবাসীকে ব্রিটিশ প্রজাবর্গের সম-পর্যায়ভুক্ত বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছিল।* কিন্তু ভারতবাসীদের নিকট ক্রমেই একথা পরিষ্কার হইল যে, ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের চার্টার এ্যাক্ট-এ এবং মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণায় ভারতীয়দের অধিকার স্বীকৃত হওয়া সত্ত্বেও, বিশেষভাবে, মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণা এবং ভারতীয় সিভিল সার্ভিস এ্যাক্ট (১৮৬১)-এ ভারতবাসীদের আই. সি. এস.-পদে নিযুক্ত করিবার নীতি বিশেষভাবে স্বীকৃত হইলেও ব্রিটিশ সরকার এই নীতি মানিয়া চলিতে ইচ্ছুক নহেন। ভারতবাসীকে মুখে বড় বড় আশার কথা শুনাইয়া কার্যত সেই সকল বিষয় এড়াইয়া যাইবার মনোবৃত্তি ব্রিটিশ সরকারের প্রতি শিক্ষিত ভারতবাসীদের মধ্যে বিরুদ্ধ মনোভাবের সৃষ্টি করিয়াছিল, বলা বাহুল্য। ভারতবর্ষের শাসনব্যবস্থায় অধিক সংখ্যক ভারতীয়দের নিয়োগ শাসনব্যবস্থার ভারতীয়-করণের প্রথম এবং অপরিহার্য পদক্ষেপ বিবেচনা করিয়া শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অধিক সংখ্যায় আই. সি. এস.-পদে নিযুক্ত হইবার চেষ্টা চলিল। অপর পক্ষে ব্রিটিশ সরকার এক অন্যায় এবং বৈষম্যমূলক নীতি অনুসরণ করিয়া চলিলেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিলাতে আই. সি. এস. পরীক্ষায় কৃতকার্য হওয়া সত্ত্বেও তাঁহাকে আই. সি. এস.-পদে নিযুক্ত না করিবার চেষ্টা চলিলে একমাত্র ব্রিটিশ বিচারালয়ের নিকট আবেদন করিয়া এই অন্যায়ের প্রতিকার করা সম্ভব হইয়াছিল। অবশ্য আই. সি. এস. পদে নিযুক্ত হইলেও অল্পকালের মধ্যেই সুরেন্দ্রনাথ সামান্য কারণে পদচ্যুত হইয়াছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বহু চেষ্টায়ও তাঁহার

ব্রিটিশ সরকারের বৈষম্যমূলক ব্যবহার

* "We hold ourselves bound to the natives of our Indian territories by the same obligations of duty which binds us to all our other subjects." Queen's Proclamations, 1858.

প্রতি এই অন্যায় আচরণের কোন প্রতিকার করিতে পারিলেন না। ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থায় অংশ গ্রহণের সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইবার ফলে-ই সুরেন্দ্রনাথ দেশমাতৃকার সেবার সুবিশাল ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে পারিয়াছিলেন। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার-ই চেষ্টায় 'ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন' (Indian Association) স্থাপিত হইল। সমগ্র ভারতকে একই জাতীয়তাবোধে উদ্‌বুদ্ধ করিয়া ঐক্যবদ্ধভাবে ভারতবাসীর স্বার্থ রক্ষা করাই ছিল এই প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য।

ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন

পরবৎসর (১৮৭৭) ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের আদেশে আই. সি. এস. পরীক্ষার্থী-দের বয়স উনিশ বৎসরের অনধিক হইতে হইবে একথা ঘোষণা করা হইলে সমগ্র ভারতবর্ষে এক গভীর অসন্তোষের সৃষ্টি হইল। কলিকাতায় এই আদেশের প্রতিবাদে সভা-সমিতি আহূত হইল। সুরেন্দ্র-নাথ সমগ্র ভারতবর্ষে এই ব্যাপার লইয়া আন্দোলন সৃষ্টির উদ্দেশ্যে লাহোর, অমৃতসর, আগ্রা, মীরাট, এলাহাবাদ, দিল্লী, আলিগড়, লক্ষ্ণৌ, কানপুর, বারাণসী প্রভৃতি স্থানে বিরাট বিরাট সভায় বক্তৃতা দান করিলেন। আপাতদৃষ্টিতে এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল আই. সি. এস. পরীক্ষায় প্রতিযোগীদের বয়সের সীমাবৃদ্ধি, অবাধ প্রতি-যোগিতামূলক পরীক্ষার ভিত্তিতে আই. সি. এস.-পদে লোকনিয়োগ, একই সময়ে ইংলণ্ডে ও ভারতবর্ষে পরীক্ষা-গ্রহণ প্রভৃতি দাবি ব্রিটিশ সরকার হইতে আদায় করা। কিন্তু ইহার মূল উদ্দেশ্য ছিল সমগ্র ভারতবর্ষে এক রাজনৈতিক তথা জাতীয় ঐক্যবোধের সৃষ্টি করা। সুরেন্দ্রনাথের সর্বভারত পরিভ্রমণ ও সর্বত্র বক্তৃতাদানে পূর্ববঙ্গ হইতে আরম্ভ করিয়া পাঞ্জাব পর্যন্ত সকল স্থানে এক প্রবল চেতনার সৃষ্টি হয়। সমগ্র ভারতের বিশাল জনসমাজ জাতি-ধর্ম-আচার-আচরণ-নির্বিশেষে একই আদর্শে উদ্‌বুদ্ধ হইয়া উঠিবার মধ্যে ভবিষ্যতে রাজনীতি-ক্ষেত্রে সর্বভারতীয় ঐক্যের ইঙ্গিত পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। কিন্তু এই আন্দোলনের এখানেই অবসান হইল না। উপরি-উক্ত দাবিসম্বলিত এক স্মারকলিপি ব্রিটিশ কমন্স সভায় পেশ করিবার উদ্দেশ্যে লালমোহন ঘোষ নামে এক বিখ্যাত বাঙালী ব্যারিস্টারকে প্রেরণ করা হইল। জন ব্রাইট্ (John Bright)-এর সভাপতিত্বে লণ্ডনে এক বিরাট

আই. সি. এস. পরীক্ষা-সংক্রান্ত আন্দোলন

জাতীয়তাবোধের বৃদ্ধি

লালমোহন ঘোষের সাফল্য

সভায় লালমোহন ঘোষের অনন্যসাধারণ বাগ্মিতা ইংলণ্ডে এক দারুণ প্রভাব বিস্তার করিল। তাঁহার বক্তৃতার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আই. সি. এস. নিয়োগ-সংক্রান্ত নিয়ম-কানুনের পরিবর্তনের প্রস্তাব কমন্স সভায় উত্থাপিত হইল।

আই. সি. এস. নিয়োগ-সংক্রান্ত আন্দোলনের সাফল্যে ভারতবাসীর মধ্যে এক ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি হইয়াছিল। লর্ড লিটনের Arms Act ও Vernacular Press Act-এর বিরুদ্ধেও অনুরূপ প্রতিবাদ জানাইতে ভারতবাসী বিলম্ব করিল না। সেক্রেটারী অব্ স্টেট্ লর্ড সল্স-বেরীর প্রতিক্রিয়াশীল শাসনব্যবস্থার পরোক্ষ ফল হিসাবে ভারতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন অধিকতর শক্তি সঞ্চয় করিয়াছিল, সেবিষয়ে সন্দেহ নাই। সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত ভারতীয়দের স্বার্থ-বিরোধী আইন-কানুন-এর প্রতিবাদ করিবার উদ্দেশ্য লইয়া মূলতঃ ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূচনা হইলেও ক্রমেই উহার আদর্শ ও উদ্দেশ্যের প্রসার ঘটিল। শাসনব্যবস্থায় মাত্র চাকরি গ্রহণ করিবার সুযোগ লাভ করিয়াই ভারতবাসী আর সন্তুষ্ট রহিল না। ক্রমে স্বায়ত্তশাসনের জন্য তাহারা আন্দোলন শুরু করিল। ভারতবাসীদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ যখন এক শক্তিশালী প্রভাব হিসাবে জাগিয়া উঠিয়াছে, সেই সময়ে ইল্‌বার্ট বিল লইয়া এক প্রবল আন্দোলনের সুযোগ উপস্থিত হইল। তদানীন্তন আইন-সচিব (Law Member) মিঃ ইল্‌বার্ট (Ilbert) ইওরোপীয় ও ভারতীয় বিচারপতিদের বিচার-ক্ষমতার সমতা স্থাপনের উদ্দেশ্যে একটি বিল প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ইহা ইতিহাসে 'ইলবার্ট-বিল' নামে খ্যাত। ইতিপূর্বে কেবলমাত্র ইংরাজ বিচারপতিগণই ইওরোপীয়দের বিচার করিতে পারিতেন। ইল্‌বার্ট বিলে এই বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার অবসান করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছিল। এই সূত্রে ইংরাজগণ নিজেদের অধিকার রক্ষার্থে এই বিলের বিরুদ্ধে এক তীব্র আন্দোলন শুরু করিলে ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে এই বিলের সমর্থনে এক আন্দোলন শুরু হইল। শেষ পর্যন্ত অবশ্য ইলবার্ট বিলের পরিবর্তন করিয়া ইওরোপীয় প্রজাবর্গের জুরি দ্বারা বিচার দাবি করিবার অধিকার স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছিল। কিন্তু এই জুরির অর্ধাংশ ইওরোপীয়দের লইয়া গঠিত হইবে এই নীতিও স্বীকৃত হইয়াছিল। এই বিল-সংক্রান্ত আন্দোলন ইওরোপীয় ও ভারতীয়

লর্ড সলস্‌বেরীর প্রতিক্রিয়াশীলতার ফলে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের শক্তিবৃদ্ধি

ইল্‌বার্ট বিল-সংক্রান্ত আন্দোলন—জাতীয়তাবাদের গভীরতা বৃদ্ধি

প্রজাবর্গের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের অবসান ঘটাইতে পারিল না বটে, কিন্তু এই আন্দোলনের ফলে ভারতীয়দের জাতীয় ঐক্য বহুগুণে বৃদ্ধি পাইল।

'ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কনফারেন্স' (১৮৮৩) ও জাতীয় তহবিল

১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ কলিকাতায় 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কন্‌ফারেন্স' নামে এক জাতীয় মহাসভা আহ্বান করিলেন। ভারতের বিভিন্ন অংশ হইতে প্রতিনিধিগণ এই কন্‌ফারেন্সে যোগদান করিলেন। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ব্যয় সংকুলানের জন্য একটি জাতীয় তহবিল (National Fund) খোলা হইল। এইভাবে ভারতের জাতীয় আন্দোলন যখন একটি স্থায়ী সংগঠনের উপর ভিত্তি করিয়া অধিকতর শক্তিসঞ্চয়ের জন্য সচেষ্ট, তখন মিঃ এলান অক্‌টাভিয়ান হিউম (Allan Octavian Hume) নামে জনৈক অবসরপ্রাপ্ত ইংরাজ আই. সি. এস. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েটগণকে উদ্দেশ্য করিয়া ভারতের মানসিক, নৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নতিবিধানকল্পে একটি স্থায়ী সংস্থা সংগঠনের উপদেশ-সম্বলিত একটি খোলা চিঠি প্রকাশ করিলেন। তদানীন্তন ব্রিটিশ গবর্ণর-জেনারেল লর্ড ডাফ্‌রিন (Lord Dufferin)-ও এইরূপ একটি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে একমত ছিলেন। কারণ, শাসনপরিচালনা ব্যাপারে ভারতীয়দের মনোভাব এবং মতামত জানিবার প্রয়োজনীয়তা একমাত্র এইরূপ প্রতিষ্ঠান হইতেই মিটিতে পারিবে এই ছিল তাঁহার ধারণা। মিঃ হিউমের এবং তদানীন্তন ভারতের শিক্ষিত এবং গণ্যমান্য সম্প্রদায়ের চেষ্টায় ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই শহরে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সর্বপ্রথম অধিবেশন বসিল। বাঙালী ব্যারিস্টার মিঃ ডব্লিউ. সি. বনার্জী (Mr. W. C. Bonerjee) এই অধিবেশনের সভাপতিত্ব করিলেন। ঠিক সেই সময়ে কলিকাতায় ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কন্‌ফারেন্সের দ্বিতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইল। ন্যাশন্যাল কংগ্রেস ও ন্যাশন্যাল কন্‌ফারেন্সের আদর্শ ও পন্থা একই ছিল। সুতরাং এই দুইটি প্রতিষ্ঠান পৃথকভাবে থাকিবার কোন সার্থকতা নাই এই কথা উপলব্ধি করিয়া ন্যাশন্যাল কন্‌ফারেন্স ন্যাশন্যাল কংগ্রেসের সহিত মিলিত হইল। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে অদ্যাবধি জাতীয় কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশন ভারতের বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত হইতেছে।

মিঃ হিউমের স্থায়ী সংস্থা গঠনের খোলা চিঠি

লর্ড ডাফ্‌রিনের সহানুভূতি

জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা—বোম্বাই শহরে প্রথম অধিবেশন (১৮৮৫)—সভাপতি ডব্লিউ সি. বনার্জী

পরিশিষ্ট (ক)

বংশ-পরিচয়

পেশওয়া বংশ

গাইকোয়াড় বংশ

হোল্কার বংশ

ভোঁসলে বংশ

মাধোজী
বাপুজী
পারসোজী
ভীমজী
কান্‌হোজী
রঘুজী (১ম) (১৭৩৮-৫৫)
মাধোজী
জনজী
রঘুজী (২য়) (১৭৮৮-১৮১৬)
ব্যাঙ্কোজী
পারসোজী
মাধোজী (আপ্পা সাহেব)
রঘুজী (৩য়) (১৮১৮-৫৩)
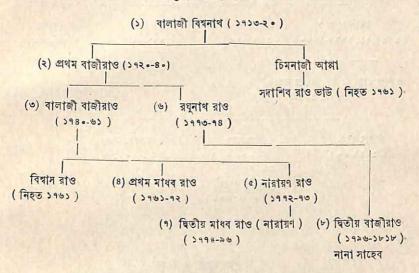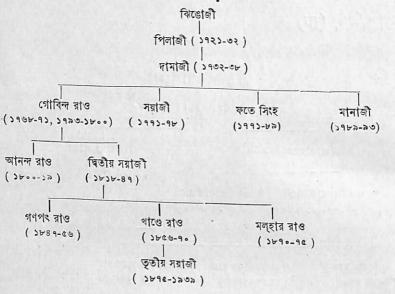
সিন্ধিয়া বংশ

নিজাম বংশ

বাংলার নবাব বংশ

(১)
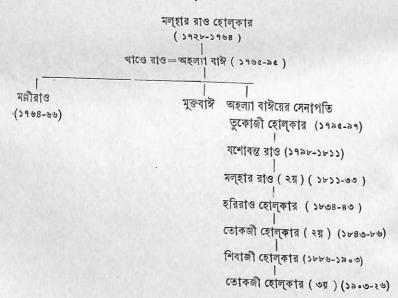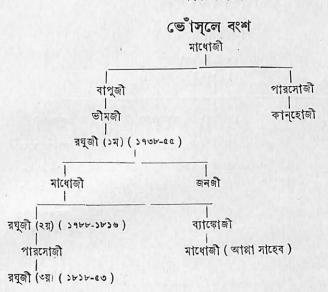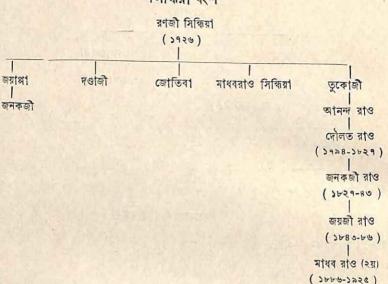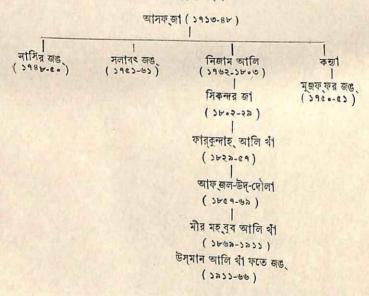
মুর্শিদকুলী খাঁ
(১৭০৩-২৭)
|
কন্যা = সুজা-উদ্-দিন
(১৭২০-৩৯)
|
সরফরাজ খাঁ
(১৭৩৯-৪০)

(২)

আলীবর্দী খাঁ
(১৭৪০-৫৬)
|
কন্যা আমিনা বেগম
|
সিরাজ-উদ্-দৌলা
(১৭৫৬-৫৭)

(৩)

মীরজাফর
(১৭৫৭-৬০, ১৭৬৩-৬৫)
|
কন্যা = মীরকাশিম (১৭৬০-৬৩) | নাজিম-উদ্-দৌলা (১৭৬৫-৬৬) | সৈফ্-উদ্-দৌলা (১৭৬৬-৭০)

অযোধ্যার নবাব বংশ

মীর মহম্মদ নাসির
সাদাৎ খাঁ
(১৭২২-৩৯)
কন্যা
কন্যা
সফ্দর জঙ্
(১৭৩৯-৪৭)
=
সুজা-উদ্-দৌলা
(১৭৫৪-৭৫)
আসফ্-উদ্-দৌলা
(১৭৭৫-৯৭)
ওয়াজীর আলি
(১৭৯৭-৯৮)
সাদাত আলি
(১৭৯৮-১৮১৪)
গাজী-উদ্-দিন
(১৮১৪-২৭)
নাসির-উদ্-দিন
(১৮২৭-৩৭)
আলি শাহ্
(১৮৩৭-৪২)
আমজদ্ আলি শাহ্
(১৮৪২-৪৭)
ওয়াজীদ আলি
(১৮৪৭-৫৬)
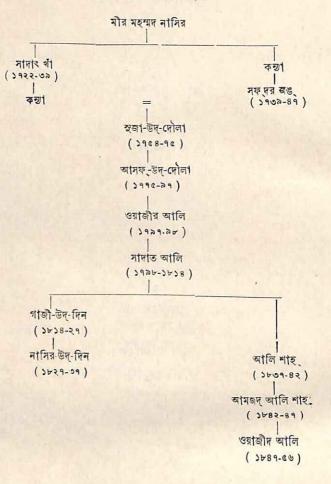
ব্রিটিশ গবর্ণর-জেনারেল ও ভাইস্‌রয়গণ

কোম্পানির অধীনে

ওয়ারেন হেস্টিংস্ (১৭৭৪-১৭৮৫)
সার্ জন ম্যাক্‌ফারসন্ (অস্থায়ী, ১৭৮৫-৮৬)
লর্ড কর্ণওয়ালিস (১৭৮৬-১৭৯৩)
সার্ জন শোর (১৭৯৩-৯৮)
সার্ এ. ক্লার্ক (অস্থায়ী, ১৭৯৮)
লর্ড ওয়েলেস্‌লি (১৭৯৮-১৮০৫)
লর্ড কর্ণওয়ালিস (১৮০৫)
সার্ জন বার্লো (অস্থায়ী, ১৮০৫-০৭)
প্রথম লর্ড মিণ্টো (১৮০৭-১৮১৩)
লর্ড হেস্টিংস্ (১৮১৩-২৩)
জন এ্যাডাম্ (অস্থায়ী, ১৮২৩)
লর্ড আমহার্স্ট (১৮২৩-২৮)
উইলিয়ম বেইলী (অস্থায়ী, ১৮২৮)
লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক (১৮২৮-১৮৩৫)
চার্লস্ মেটকাফ্ (অস্থায়ী, ১৮৩৫-৩৬)
লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড (১৮৩৬-১৮৪২)
লর্ড এলেনবরা (১৮৪২-১৮৪৪)
উইলিয়ম বার্ড (অস্থায়ী, ১৮৪৪)
লর্ড হার্ডিঞ্জ (১৮৪৪-৪৮)
লর্ড ডালহৌসি (১৮৪৮-৫৬)
লর্ড ক্যানিং (১৮৫৬-৫৮)

ব্রিটিশ সরকারের অধীনে

লর্ড ক্যানিং (১৮৫৮-৬২)
প্রথম লর্ড এলগিন (১৮৬২-৬৩)
সার্ রবার্ট নেপিয়ার (অস্থায়ী)
সার্ উইলিয়ম ডেনিসন (অস্থায়ী)
সার্ জন লরেন্স (১৮৬৪-৬৯)
লর্ড মেয়ো (১৮৬৯-৭২)
সার্ জন স্ট্রেচি (অস্থায়ী)
লর্ড নেপিয়ার (অস্থায়ী)
লর্ড নর্থব্রুক (১৮৭২-৭৬)
লর্ড লিটন (১৮৭৬-৮০)
লর্ড রিপন (১৮৮০-৮৪)
লর্ড ডাফ্‌রিন (১৮৮৪-৮৮)
লর্ড ল্যান্সডাউন (১৮৮৮-৯৪)
দ্বিতীয় লর্ড এলগিন (১৮৯৪-৯৯)
লর্ড কার্জন (১৮৯৯-১৯০৫)
লর্ড এম্পথিল (অস্থায়ী, ১৯০৫)
দ্বিতীয় লর্ড মিণ্টো (১৯০৫-১৯১০)
দ্বিতীয় লর্ড হার্ডিঞ্জ (১৯১০-১৯১৬)
লর্ড চেমস্‌ফোর্ড (১৯১৬-২১)
লর্ড রীডিং (১৯২১-২৬)
দ্বিতীয় লর্ড লিটন (অস্থায়ী)
লর্ড আরউইন (১৯২৬-৩১)
লর্ড গসচেন (অস্থায়ী)
লর্ড উইলিংডন (১৯৩১-৩৬)
সার্ জর্জ স্ট্যানলী (অস্থায়ী)
লর্ড লিনলিথগাউ (১৯৩৬-৪৩)
লর্ড ওয়াভেল (১৯৪৩-১৯৪৭ মার্চ)
লর্ড মাউণ্টব্যাটেন (মার্চ '৪৭—১৪ই আগস্ট '৪৭)

ডোমিনিয়ন গবর্ণর-জেনারেল

লর্ড মাউন্টব্যাটেন (১৯৪৭—৪৮)

চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী (১৯৪৮—জানুয়ারী, ১৯৫০)

ভারত-প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি

রাজেন্দ্রপ্রসাদ (১৯৫০-৫২), (১৯৫২-৬২)

সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণ (১৯৬২-৬৭)

ডক্টর জাকির হোসেন (১৯৬৭—১৯৬৯)

বরাহগিরি ভেঙ্কটগিরি (১৯৬৯ –)

ভারতের প্রধানমন্ত্রী

জওহরলাল নেহরু (১৯৪৭-৫২)

(১৯৫২-৫৭)

(১৯৫৭-৬২)

(১৯৬২-৬৪)

লাল বাহাদুর শাস্ত্রী (১৯৬৪-৬৫)

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী (১৯৬৫-৬৭, ১৯৬৭—)

পরিশিষ্ট (খ)
উত্তর-সংকেত

সূচনা

Discuss the sources of history of the Indo-British period.

[উত্তর-সংকেত : (১) স্চনা : মোট পাঁচ প্রকারের উপাদান ; (২) (ক) সরকারী কাগজপত্র, (খ) সাধারণ ব্যক্তিবর্গের নিকট হইতে প্রাপ্ত সমসাময়িক দলিলপত্র, (গ) ইওরোপীয় বাণিজ্য-কুঠিতে প্রাপ্ত কাগজপত্রাদি, (ঘ) ভারতীয়দের রচনা ও (ঙ) ব্রিটিশ ঐতিহাসিকদের রচনা। ৩-৫ পৃষ্ঠা]

প্রথম অধ্যায়

1. Give a short account of the early activities of European traders in India. (3 yr. Degree, '64, C. U.)

[উত্তর-সংকেত : (১) সূচনা : ভারতের সহিত পাশ্চাত্ত্য দেশের যোগাযোগ প্রাচীনকাল হইতেই বিদ্যমান ছিল। আরব সাগর ও লোহিত সাগরের পথে আরবগণের একচ্ছত্র আধিপত্য স্থাপিত হইবার পর হইতে পাশ্চাত্ত্য দেশীয় বণিকগণ ভারত তথা দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় দেশসমূহের সহিত সরাসরি বাণিজ্যিক যোগাযোগ স্থাপনের জন্য জলপথ আবিষ্কার করিতে সচেষ্ট হয়। এই সূত্রেই ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ভাস্কো-ডা-গামা জলপথে ভারতে পৌঁছেন ; (২) পোর্তুগীজ বণিকগণ ; (৩) ওলন্দাজ বণিকগণ ; (৪) ফরাসী বণিকগণ ; (৫) ইংরাজ বণিকগণ ; (৬) অপরাপর ইওরোপীয় বণিকগণ। ৫-১৯ পৃষ্ঠা]

2. Give a brief but a systematic account of the Anglo-French struggle for supremacy in the Deccan with special reference to the policy of Dupleix (3yr. Degree, '63, '67, '69, C. U. B. A. 1953)

[উত্তর-সংকেত : (১) সূচনা : অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে তথা দাক্ষিণাত্যে এক ব্যাপক অব্যবস্থা দেখা দিয়াছিল। দেশীয় রাজগণের পরস্পর দ্বন্দ্ব ও বিবাদ-বিসম্বাদ, তাঁহাদের সামরিক দুর্বলতা ইওরোপীয় বণিকগণকে ভারতীয় রাজনীতিতে অংশ গ্রহণে উৎসাহিত করিয়াছিল। ডুপ্লে ছিলেন এবিষয়ে পথপ্রদর্শক। এই সূত্রে ভারতে ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয়। দাক্ষিণাত্যই ছিল এই দ্বন্দ্বের প্রধান কেন্দ্র ; (২) ডুপ্লের নীতি, অস্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার দ্বন্দ্ব, ইঙ্গ-ফরাসী যুদ্ধ, কর্ণাটের প্রথম যুদ্ধ, এই-লা-স্যাপ্‌লের সন্ধি, ১৭৪৮ ; (৩) কর্ণাটের দ্বিতীয় যুদ্ধ—ফরাসী শক্তির প্রাথমিক সাফল্য, অবশেষে পরাজয়—ডুপ্লের পদচ্যুতি ; (৪) কর্ণাটের তৃতীয় যুদ্ধ—ফরাসী পরাজয়—প্যারিসের সন্ধি (১৭৬৩), ভারতে ফরাসী সাম্রাজ্য স্থাপনের আশা বিলুপ্ত। ২০-৩৩ পৃষ্ঠা]

3. "For nearly twenty years the Carnatic became the scene of a long drawn contest between the French and the English, which led to the ultimate overthrow of the French power in India." Discuss.

[উত্তর-সংকেত : ২নং প্রশ্নের উত্তর-সংকেতের অনুরূপ।]

4. What were the various causes that led to the final victory of the English over the French in India ?

(C. U. B. A. 1950)

[উত্তর-সংকেত : (১) সূচনা : নানাবিধ কারণ ; (২) ফরাসীদের অর্থাভাব ; (৩) ফরাসীদের বাণিজ্যিক আদর্শ ত্যাগ এবং সামরিক বিজয়ের পন্থা গ্রহণ ; (৪) ফরাসীদের নৌবহরের অভাব ; (৫) ইংরাজদের তুলনায় ফরাসীপক্ষে উৎসাহ-উদ্দীপনার অভাব ; (৬) জাতীয় স্বার্থ ও সমর্থনহীন ফরাসী বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান ; (৭) ফরাসীপক্ষে ব্যক্তিগত অপকর্ষতা—সামরিক দক্ষতার অভাব ; (৮) ডুপ্লেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের আদেশ দান ; (৯) বুসীকে দাক্ষিণাত্য হইতে অপসারণ ; (১০) ফরাসী সরকারের সাহায্য প্রেরণে অক্ষমতা। ৪০-৪২ পৃষ্ঠা]

5. "In spite of his failure, we cannot deny Dupleix's claim to greatness. His conceptions were daring and imaginative and required national and not company's support." Critically discuss. (C. U. B.A. 1940)

"The character and achievements of Dupliex hardly merit the admiration which they received." Criticise.

(C. U. B. A. 1946)

"In spite of his failure Dupleix is a striking figure in Indian History". What are the real claims of the French statesman to greatness? (C. U. B. A. 1949)

[উত্তর-সংকেত : (১) সূচনা : ব্রিটিশ ঐতিহাসিকগণের অনেকেই ডুপ্লেকে ন্যায্য মর্যাদাদানে কার্পণ্য করিয়াছেন। বস্তুতঃ, ভারত-ইতিহাসের ইওরোপীয় প্রাধান্যের অধ্যায়ে ডুপ্লের নাম তাঁহার মৌলিক প্রতিভার ও দূরদর্শিতার জন্য গৌরবোজ্জ্বল হইয়া আছে ; (২) তাঁহার নীতি ও কর্মপন্থা ; (৩) কর্ণাটের প্রথম যুদ্ধ—ডুপ্লের সাফল্য ; (৪) কর্ণাটের দ্বিতীয় যুদ্ধ—ডুপ্লের চরম সাফল্য ;—ইংরাজগণের ভীতি ও ঈর্ষা (১ম ও ২য় কর্ণাটের যুদ্ধে ডুপ্লের সাফল্য অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করিলেই চলিবে) ; (৫) কর্ণাটের দ্বিতীয় যুদ্ধের শেষভাগে বিফলতা—পদচ্যুতি ; (৬) তাঁহার কৃতিত্ব। ৩০-৩৭ পৃষ্ঠা]

6. Describe the plans of Dupleix. Why did they fail? (C. U. B. A. 1954, 1959)

[উত্তর-সংকেত : (১) সূচনা : ডুপ্লের বিফলতা তাঁহার উদ্ভাবিত নীতি ও কার্যপন্থার ত্রুটির ফলে নহে ; (২) তাঁহার নীতি ও কার্যপন্থা ; (৩) বিফলতার প্রকৃত কারণ : (ক) কর্তৃপক্ষের নিকট গোপনীয়তা রক্ষা করিয়া চলিবার ভ্রান্ত নীতি, (খ) বুসী ও ডুপ্লের যুগ্মভাবে কর্ণাট রক্ষার চেষ্টার অভাব, (গ) পরিস্থিতি বিবেচনায় শান্তি স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা অনুপলব্ধ, (ঘ) ফরাসীপক্ষে ব্যক্তিগত অপকর্ষতা, (ঙ) অর্থাভাব, (চ) উপযুক্ত নৌশক্তির অভাব, (ছ) ফরাসী কর্তৃপক্ষের সহায়তার অভাব। ৩১-৩২, ৩৫-৩৭ পৃষ্ঠা]

দ্বিতীয় অধ্যায়

1. Tell the story of the Nawabs of Murshidabad (1713-1757) and account for their downfall. (C. U. B. A. 1947)

[উত্তর-সংকেত : (১) সূচনা : মুর্শিদকুলী খাঁর আমল হইতে বাংলার নবাবী একপ্রকার স্বাধীন হইয়া পড়ে। তাঁহাদের শাসন-নীতি ও কার্যকলাপ আর দিল্লীর সম্রাটের অনুমোদনসাপেক্ষ ছিল না ; (২) মুর্শিদকুলী খাঁ ; (৩) সুজা-উদ্-দিন খাঁ, সরফরাজ খাঁ ; (৪) আলিবর্দী খাঁ ; (৫) সিরাজ-উদ্-দৌলা ; (৬) পতনের কারণ : (ক) আলিবর্দীর পরে ক্ষমতাবান নবাবের অভাব, (খ) সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, (গ) মিরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতা, (ঘ) বক্সারের যুদ্ধ। ৪৩-৬৬ পৃষ্ঠা]

2. Give a short history of the British ascendancy in Bengal and Oudh with special reference to the role played by Clive. (3yr. Degree, 1962, C. U.)

[উত্তর-সংকেত : (১) সূচনা : অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম ভাগে বাংলাদেশ ও অযোধ্যার উপর ব্রিটিশ প্রাধান্য স্থাপিত হয়। ইওরোপে ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্বের সূত্র ধরিয়া বাংলাদেশেও ইঙ্গ-ফরাসী সংঘর্ষ শুরু হয়। আর উহার সূত্র ধরিয়া নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলা ও ইংরাজদের মধ্যে প্রকাশ্য দ্বন্দ্বের স্থচনা হয় ; (২) সিরাজ-উদ্-দৌলা কর্তৃক কলিকাতা দখল ; (৩) রবার্ট ক্লাইভের কলিকাতা পুনরুদ্ধার ; (৪) পলাশীর যুদ্ধ ; (৬) বিদারার যুদ্ধ ; (৬) ১৭৬০-১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দের অন্তর্বর্তী কালে বাংলাদেশে অব্যবস্থা ও দুর্নীতি ; (৭) মিরকাশিম ; (৮) বক্সারের যুদ্ধ ; (৯) ক্লাইভের দ্বিতীয় শাসনকাল ; (১০) সুজা-উদ্-দৌলার সহিত সন্ধি ; (১১) দেওয়ানী লাভ। ৪৬-৭৩ পৃষ্ঠার প্রয়োজনীয় অংশ দ্রষ্টব্য।]

3. Review the character and career of Robert Clive. How did he turn the table on the French in South India and the Moghuls in the North ? (C. U. B. A. 1948)

[উত্তর-সংকেত : (১) স্থচনা : মাত্র উনিশ বৎসর বয়সে রবার্ট ক্লাইভ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সামান্য কেরাণীপদে নিযুক্ত হইয়া মাদ্রাজে আসেন।

তারপর তিনি মসি ছাড়িয়া অসি ধারণ করেন ; (২) আর্কট অধিকার, অর্নি ও কাবেরীপাকের যুদ্ধ জয় ; (৩) কলিকাতা পুনরুদ্ধার,—সিরাজ-উদ্-দৌলার কলিকাতা আক্রমণ রোধ, পলাশীর যুদ্ধ—শাহ্‌জাদার আক্রমণ রোধ ; (৪) দ্বিতীয়বার গবর্ণর নিযুক্ত—সীমান্ত নীতি—আভ্যন্তরীণ সামরিক ও বেসামরিক সংস্কার—দেওয়ানী লাভ—দ্বৈত শাসনের প্রবর্তন—ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন। ৬৬-৭১ পৃষ্ঠা]

4. Review the British relations with Mir Jafar and Mir Kasim. (C. U. B. A. 1956). Write a note on Mir Kasim. (C. U. B. A. 1949)

[উত্তর-সংকেত : (১) সূচনা : ইংরাজগণ ও বাংলার নবাব মিরজাফর এবং মিরকাশিমের পরস্পর সম্পর্ক ব্রিটিশ-ভারতীয় ইতিহাসে ইংরাজ বণিকদের স্বার্থলোলুপতা ও নীচতার এক জঘন্য অধ্যায় রচনা করিয়াছে ; (২) মিরজাফর—পলাশীর পূর্বে ইঙ্গ-মিরজাফর ষড়যন্ত্র—নবাব হিসাবে মিরজাফর ও ইংরাজদের সম্পর্ক, মিরজাফরের ইংরাজপ্রভাব-মুক্ত হইবার চেষ্টা ; মস্‌নদচ্যুতি—দ্বিতীয়বার নবাব-পদ লাভ ; (৩) মিরকাশিম—বাংলার শেষ প্রকৃত স্বাধীন নবাব,—তাঁহার দূরদর্শিতা ও দেশাত্মবোধ,—ইংরাজদের সহিত বিবাদ—কাটোয়া, ঘেরিয়া, উদয়নালা ও বক্সারের যুদ্ধে পরাজয়। ৫৮-৬৫ পৃষ্ঠা]

5. Trace the course of events leading to the battle of Plassey. Explain the importance of the battle. (C. U. B. A. 1959)

Analyse the causes of the conflict between Nawab Sirajuddaula and the East India Company. (C. U. 1970)

[উত্তর-সংকেত : (১) সূচনা : ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে সিরাজ-উদ্-দৌলার বাংলার মস্‌নদে আরোহণ করিবার সময় হইতেই পলাশীর যুদ্ধের পূর্ব-ছায়া পতিত হয়। উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত জটিলতা, ঘসেটি বেগম, সৌকৎজঙ্গ ও রাজবল্লভের ষড়যন্ত্র—অনভিজ্ঞ, অল্পবয়স্ক নবাব সিরাজের দুর্বলতার কারণ হইয়া দাঁড়ায়। তদুপরি ইংরাজগণও তাঁহার প্রতি প্রজা-সুলভ ব্যবহার করা দূরে থাকুক প্রকাশ্যভাবে ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করিতে শুরু করিলে এবং ইওরোপে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের সূত্রে সামরিক প্রস্তুতি শুরু করিলে সিরাজ ও ইংরাজদের মধ্যে প্রকাশ্য সংঘর্ষ শুরু হইল ; (২) কাশিমবাজার ও ফোর্ট উইলিয়াম

দখল ; (৩) ক্লাইভ ও ওয়াটসন্ কর্তৃক ফোর্ট উইলিয়াম পুনরধিকার ; (৪) সিরাজের বিরুদ্ধে ক্লাইভ এবং মিরজাফর প্রমুখ রাজকর্মচারিবর্গের ষড়যন্ত্র ; (৫) পলাশীর যুদ্ধ, ২৩শে জুন, ১৭৫৭ ; (৬) যুদ্ধের ফলাফল : (ক) পরস্পর-বিরোধী দুইটি মত, (খ) উপসংহার। ৪৬-৫২, ৫৪-৫৬ পৃষ্ঠা]

6. Show how Siraj-ud-daulah and Mir Kasim opposed the British in Bengal.

(C. U. B. A. 1965)

[উত্তর-সংকেত : ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর-সংকেতের অনুরূপ।]

তৃতীয় অধ্যায়

1. Examine the judicial and revenue reforms of Warren Hastings.

[উত্তর-সংকেত : (১) সূচনা ; (২) হেস্টিংসের রাজস্ব-নীতি ; (৩) রাজস্ব-নীতির সমালোচনা ; (৪) বিচার বিভাগীয় সংস্কার—মফঃস্বল দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত, সদর দেওয়ানী ও সদর নিজামৎ আদালত। ৮৮-৯২ পৃষ্ঠা]

2. Sketch briefly the career of Warren Hastings with special reference to his role in the First Anglo-Maratha and First Anglo-Mysore War. (3yr. Degree, '64, C. U.). Estimate Warren Hastings as a Governor-General. (C. U. B. A. 1954) Estimate the services rendered by Warren Hastings to the growth and consolidation of the British power in India.

(C. U. B. A. 1950)

Describe the career of Warren Hastings and attempt an estimate of his personality. (3yr. Degree, '59, C. U.)

[উত্তর-সংকেত : (১) সূচনা : হেস্টিংসের কৃতিত্ব সম্পর্কে পরস্পর-বিরোধী মতামত ; (২) তাঁহার সমস্যা ; (৩) তাঁহার কার্যাদি : রাজস্ব, বিচার ও অপরাপর সংস্কার ; (৪) পররাষ্ট্র-নীতি : ইঙ্গ-মারাঠা ও ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ ; (৫) কোম্পানির অর্থাভাব দূরীকরণ ; (৬) সমালোচনা—তাঁহার অবদান, সাহিত্যানুরাগ। ১১১-১১৫ পৃষ্ঠা]

3. Describe the Anglo-Maratha relations during the Governor-Generalship of Warren Hastings. (C. U. B. A. 1960)

[উত্তর-সংকেত : ২নং প্রশ্নের উত্তর-সংকেতের (৪)-এর অনুরূপ।]

4. Sketch the history of the British ascendancy in Bengal during the latter half of the 18th century. (3yr. Degree, '63, C. U.)

[উত্তর-সংকেত : প্রথম অধ্যায়ের ৩নং প্রশ্নের উত্তর-সংকেত ও ওয়ারেন হেস্টিংসের কৃতিত্ব দ্রষ্টব্য।]

চতুর্থ অধ্যায়

1. Sketch the career of Hyder Ali. (C. U. B. A. 1957)

[উত্তর-সংকেত : (১) সূচনা : ভাগ্যান্বেষী সৈনিক হিসাবে জীবন শুরু ; (২) মহীশূর রাজ্যের সিংহাসন অধিকার ; (৩) মারাঠা-মহীশূর সংঘর্ষ ; (৪) নিজাম-মারাঠা-ইংরাজ বাহিনীর মহীশূর রাজ্য আক্রমণ ; (৫) প্রথম ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ ; (৬) দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ ; (৭) তাঁহার চরিত্র ও কৃতিত্ব ; (৮) তাঁহার মৃত্যু। ১১৭-১২২ পৃষ্ঠা]

2. Describe the stages in the British conquest of Mysore. (C. U. 1970)

[উত্তর-সংকেত : (১) সূচনা : ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ও প্রতিপত্তি প্রসারে যে সকল দেশীয় রাজন্যবর্গ বিরোধিতা করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে মহীশূরের হায়দর আলি ও তাঁহার পুত্র টিপু সুলতানের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মহীশূর রাজ্য ছিল ব্রিটিশদের সর্বাধিক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ শত্রু ; (২) ১নং প্রশ্নের উত্তর-সংকেত এবং (৩) টিপুর সহিত দ্বিতীয় মহীশূরের যুদ্ধ, (৪) তৃতীয় মহীশূর যুদ্ধ—শ্রীরঙ্গপত্তমের সন্ধি, (৫) চতুর্থ ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ—টিপুর পরাজয় ও মৃত্যু (১৭৯৯)। ১১৭-১২০, ১৫১-৫৩ পৃষ্ঠা]

পঞ্চম অধ্যায়

1. Describe the administrative and judicial reforms of Cornwallis (C. U. B. A. '65). Attempt a critical review of the internal reforms of Cornwallis. (C. U. B. A. 1949, 1957)

[উত্তর-সংকেত : (১) সূচনা : কর্ণওয়ালিসের সংস্কার-নীতি কোম্পানির শাসনব্যবস্থার কোন দিকই বাদ দেয় নাই ; (২) বাণিজ্য-সংক্রান্ত সংস্কার ; (৩) বিচার-সংক্রান্ত সংস্কার—ফৌজদারী ও দেওয়ানী বিচার ; (৪) কোম্পানির কর্মচারিবর্গের ঐতিহ্য গঠন—Cornwallis Code , (৫) পুলিশ ব্যবস্থার সংস্কার ; (৬) রাজস্ব-ব্যবস্থার সংস্কার—চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ; (৭) কর্ণওয়ালিসের সংস্কার-কার্যাদির সমালোচনা। ১২৩-১২৮ পৃষ্ঠা]

2. What were the principal defects of the Permanent Settlement ? How were they remedied by subsequent enactments ? (C. U. B. A. 1951)

[উত্তর-সংকেত : (১) সূচনা : চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সম্ভাব্য অপগুণ সম্পর্কে লর্ড কর্ণওয়ালিস বা ডাইরেক্টর সভা অবহিত ছিলেন না এমন নহে। ডাইরেক্টর সভার সহিত কর্ণওয়ালিসের পত্রালাপ এবং শোর-কর্ণওয়ালিস বিতর্ক হইতে একথা প্রমাণিত হইবে। যাহা হউক, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের গুণ অপেক্ষা অপগুণের পরিমাণ যে বেশি ছিল সে সম্পর্কে সন্দেহ নাই ; (২) অপগুণ : (ক) জরিপ না করিয়া রাজস্ব-নির্ধারণের ত্রুটি, (খ) সময়মত খাজনা অনাদায়ে জমিদারি নিলাম, (গ) রায়তদের উপর জমিদারগণের অত্যাচার, (ঘ) পরবর্তী কালে জমির মূল্য বৃদ্ধি-জনিত লাভের অংশ হইতে সরকার বঞ্চিত, (ঙ) জমির উন্নয়ন ব্যাহত, (চ) নায়েব গোমস্তার অত্যাচার ; (৩) দোষ-ত্রুটি দূরীকরণের চেষ্টা : (ক) ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের রাজস্ব আইন (Rent Act), (খ) ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের প্রজাস্বত্ব আইন (Tenancy Act), (গ) ১৯২৮, ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের প্রজাস্বত্ব আইন (Tenancy Act), (ঘ) জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ। ১৩২-৩৫ পৃষ্ঠা]

3. Trace the circumstances leading to Permanent Settlement of land revenue in Bengal. What were its advantages and disadvantages ? (3yr. Degree Revised Reg. '65, C. U.).

[উত্তর-সংকেত : (১) সূচনা : বাংলাদেশের রাজস্ব-ব্যবস্থার স্থায়ী বন্দোবস্ত করিবার নির্দেশ লইয়াই লর্ড কর্ণওয়ালিস এদেশে আসিয়াছিলেন। (২) রাজস্ব-সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহ ; (৩) দশ বৎসরের জন্য রাজস্ব-বন্দোবস্ত ; (৪) চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, ১৭৯৩ ; (৫) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের গুণাগুণ। ১৩২-১৩৮ পৃষ্ঠা]

4. Write a note on the revenue reforms of Lord Cornwallis. (C. U. B. A. 1953)

[উত্তর-সংকেত : ১নং প্রশ্নের উত্তর-সংকেতের (৬)-এর অনুরূপ।]

5. Write a note on the land revenue reforms of Cornwallis. What defects do you notice in them ? (C. U. 1970)

[উত্তর-সংকেত : ১নং প্রশ্নোত্তর ও ২নং প্রশ্নোত্তরের (২)নং পর্যন্ত।]

ষষ্ঠ অধ্যায়

1. What part did Wellesley play in the establishment of British power in India ? (C. U. B. A. 1951)

How far was Wellesley successful in his task of empire-building ? (C. U. B. A. 1956)

'Wellesley was a stout annexationist'—Elucidate.

Explain Wellesley's policy of 'Subsidiary Alliance' with particular reference to its objects and achievements. (3yr Degree, '65, Revised Reg. C. U.)

What do you know of Wellesley's policy of 'Subsidiary Alliance' ? What were its objects and how far were they achieved ? (C. U. 3yr. Degree, 1967)

Write what you know of Lord Wellesley's policy of Subsidiary Alliance. (C. U. 1969)

[উত্তর-সংকেত : (১) সূচনা : কোম্পানির ইতিহাসের এক সমস্যা-সঙ্কুল মুহূর্তে ওয়েলেসলী গবর্ণর-জেনারেল পদে নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছিলেন ; (২) তাঁহার সমস্যা ; (৩) তাঁহার উদ্দেশ্য ও নীতি ; (৪) অধীনতামূলক মিত্রতা-নীতি ; (৫) তাঁহার কৃতিত্ব। ১৫৫-১৫৮ পৃষ্ঠা]

2. Sketch the character and career of Tipu. Account for his downfall.

[উত্তর-সংকেত : সূচনা : (১) হায়দর আলির পুত্র টিপু পিতার সুযোগ্য পুত্র ছিলেন ; (২) তাঁহার চরিত্র ; (৩) তাঁহার কার্যকলাপ ; (ক) দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ, (খ) তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ, (গ) চতুর্থ ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ ; (ঘ) মৃত্যু (যুদ্ধের বর্ণনার প্রয়োজন নাই) ; (৪) পতনের কারণ : (ক) রাজ্য-প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি ; (খ) ব্যক্তিগত ও স্বৈরাচারী শাসনের ত্রুটি ; (গ) জনকল্যাণকর সংস্কারের অভাব ; (ঘ) অশ্বারোহী সেনাবাহিনীর সংখ্যা ও দক্ষতা-হ্রাস ; (ঙ) বহিরাগত সাহায্যের অভাব। ১৫১-১৫৫ পৃষ্ঠা]

সপ্তম অধ্যায়

1. Sketch the history of the Anglo-Maratha relations in the last quarter of the 18th century. (C. U. B. A. 1951)

[উত্তর-সংকেত : (১) স্চনা : অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ওয়ারেন হেস্টিংসের আমল হইতে আরম্ভ করিয়া লর্ড ওয়েলেস্‌লীর শাসনকালের মধ্যেই পুনঃসঞ্জীবিত মারাঠাশক্তি পুনরায় পতনের দিকে ধাবিত হইয়াছিল ; (২) ওয়ারেন হেস্টিংস্ ও মারাঠাগণ, সল্‌বই-এর সন্ধি ; (৩) লর্ড কর্ণওয়ালিস —না-হস্তক্ষেপ নীতি ; (৪) জন শোর—না-হস্তক্ষেপ নীতি, খর্‌দার যুদ্ধ ; (৫) লর্ড ওয়েলেস্‌লী—অধীনতামূলক মিত্রতা-নীতি—মারাঠাশক্তির পতনোন্মুখতা। ১৮০-১৮৪ পৃষ্ঠা]

2. Analyse the causes of the Second and the Third Anglo-Maratha War. (3yr. Degree, '62, C. U.)

[উত্তর-সংকেত : (১) প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ, ৮৪ পৃষ্ঠা, (২) দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ, ১৪৮ পৃষ্ঠা]

3. Write notes on :

Suppression of the Pindaris. (C. U. B. A. 1951)

[উত্তর সংকেত : (১) সূচনা : উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে পিণ্ডারি নামে এক দুর্ধর্ষ লুণ্ঠনকারী দল মালব, মেবার, মাড়বার, বেরার এবং ক্রমে নিজাম ও পেশওয়ার রাজ্যে হানা দিতে আরম্ভ করে ; (২) পিণ্ডারিদের

প্রকৃতি ও কার্যপদ্ধতি ; (৩) কোম্পানির রাজ্যে পিণ্ডারি আক্রমণ ; (৪) লর্ড হেস্টিংস্ কর্তৃক পিণ্ডারি দমনের ব্যবস্থা। ১৬৫-১৬৬ পৃষ্ঠা]

4. Explain the causes of the failure of the Marathas to establish a Hindu Empire in India after the fall of the Mughal power. (C. U. B. A. 1955)

What were the causes of the Maratha downfall ? (C. U. B. A. 1959)

Write a note on Third battle of Panipath. (C. U. 1970)

[উত্তর-সংকেত : (১) স্থচনা : মোগল সাম্রাজ্যের পতনের পর সেই স্থলে নূতন সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিবার শক্তি ও সামর্থ্য একমাত্র মারাঠাদেরই ছিল। কিন্তু মারাঠাগণ সেই সুযোগ গ্রহণে সমর্থ না হওয়াতে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠিবার পূর্ণ সুযোগ ঘটিল ; (২) পতনের কারণ : (ক) পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে মারাঠা-সংহতি বিনষ্ট, মারাঠা শক্তি মাত্র সাময়িকভাবে পুনঃসঞ্জীবিত ; (খ) মারাঠা শক্তি ব্যক্তিগত ক্ষমতা ও প্রতিভা-আশ্রয়ী—মারাঠা ঐক্য কৃত্রিম ও আকস্মিক ; (গ) মারাঠা রাজ্যের অর্থনৈতিক কাঠামো স্থায়ী রাষ্ট্রগঠনের প্রতিকূল ; (ঘ) জায়গীর প্রথার পুনঃপ্রবর্তন ; (ঙ) মারাঠাদের আত্মকলহ ; (চ) পরবর্তী কালে সুযোগ্য নেতার অভাব ; (ছ) 'হিন্দুপাদ-পাদশাহী' আদর্শ ত্যাগ ; (জ) মারাঠা শাসনের পরসম্পদ-হরণ ও অত্যাচারে পরিণতি ; (ঝ) গরিলা যুদ্ধ-পদ্ধতি পরিত্যাগ ; (ঞ) আধুনিক যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত ব্রিটিশ বাহিনীর শ্রেষ্ঠত্ব ; (৩) উপসংহার। ১৭৬-১৮০ পৃষ্ঠা]

অষ্টম অধ্যায়

1. Write notes on : Bentinck's measures for social reforms. (C. U. B. A. 1952 ; 1970)

[উত্তর-সংকেত : (১) সূচনা : শান্তি ও সংস্কার-কার্যাদির জন্য লর্ড বেন্টিঙ্কের শাসনকাল ভারত-ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে ; (২) সামাজিক সংস্কার-কার্যাদি : সতীদাহ নিবারণ, ঠগীদমন, পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রবর্তন, মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন।

১৮৯-১৯৩ পৃষ্ঠা]

2. Give a short account of the Anglo-Afghan relations during the Governor-Generalship of Lord Auckland and Lord Ellenborough. (C. U. B. A. 1952)

Write notes on : Anglo-Afghan relation during Lord Auckland's Governor-Generalship. (C. U. B. A. 1953)

[উত্তর-সংকেত : (১) সূচনা : লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড ও লর্ড এলেনবরার আফগান নীতি তদানীন্তন ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার রুশভীতি-প্রসূত ছিল। এই অহেতুক রুশভীতি হইতে লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড ভারতে ব্রিটিশ স্বার্থ রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে এক নৈতিকতাবর্জিত নীচ স্বার্থপর নীতি অনুসরণ করিতে গিয়া নিজের এবং ব্রিটিশ জাতির নাম মসিলিপ্ত করিয়াছিলেন ; (২) রুশভীতি—আলেকজাণ্ডার বার্নেস্ মিশন ; (৩) আফগানিস্তানের আমীর দোস্ত মহম্মদের সহিত মৈত্রীর চেষ্টায় অসাফল্য ; (৪) প্রথম ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধের কারণ : (৫) ব্রিটিশ, রঞ্জিৎ সিংহ ও শাহ্ সুজার মধ্যে ত্রি-শক্তি চুক্তি ; (৬) অক্‌ল্যাণ্ড কর্তৃক যুদ্ধ ঘোষণা—দোস্ত মহম্মদের পরাজয় ; (৭) আফগান বিদ্রোহ—মেক্‌নাটেন চুক্তি ; (৮) অক্‌ল্যাণ্ডের আফগান নীতির ফলাফল—ব্রিটিশ সৈন্যক্ষয় ও মর্যাদাহানি ; (৯) লর্ড এলেনবরা কর্তৃক আফগান যুদ্ধের পরিসমাপ্তি—ব্রিটিশের চূড়ান্ত পরাজয় ও অপমান ; (১০) অক্‌ল্যাণ্ডের আফগান নীতির সমালোচনা (সংক্ষেপে)। ১৯৮-২০৪ পৃষ্ঠা]

3. Show how the Anglo-Afghan war originated. Discuss the Afghan policy of Lord Auckland.

(C. U. B. A. 1956, 1959)

[উত্তর-সংকেত : ২নং প্রশ্নের (১) হইতে (৬), (৮) ও (১০)। সমালোচনা বিশদভাবে দেওয়া প্রয়োজন।]

4. Discuss the Afghan policy of Auckland.

(C. U. B. A. 1960, 3yr. Degree, 1967)

[উত্তর-সংকেত : প্রথম অংশের উত্তর-সংকেত ২নং প্রশ্নের উত্তর-সংকেতের অনুরূপ।]

5. Write notes on : Annexation of Sind.

(C. U. B. A. 1953)

[উত্তর-সংকেত : (১) সূচনা : অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে সিন্ধুর আমীরগণ মৌখিকভাবে আফগানিস্তানের আনুগত্য স্বীকার করিতেন, কিন্তু বস্তুতঃ তাঁহারা নিজেরা স্বাধীনই ছিলেন ; (২) ব্রিটিশের সহিত সম্পর্ক—১৮০৯, ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের চুক্তি ; (৩) লর্ড বেণ্টিঙ্ক ও আমীরদের মধ্যে চুক্তি—১৮৩২ ; (৪) লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড কর্তৃক চুক্তি-ভঙ্গ ; (৫) সার্ চার্লস্ নেপিয়ার-এর ঔদ্ধত্য ; (৬) মিয়ানী ও দাবো-এর যুদ্ধ—সিন্ধু অধিকার। ২০৪-২০৬ পৃষ্ঠা]

6. How far was Dalhousie responsible for the Mutiny? (C. U. B. A. 1957)

[উত্তর-সংকেত : (১) সূচনা : ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের নানাবিধ কারণের মধ্যে ডালহৌসীর সাম্রাজ্যবাদী মনোবৃত্তি ও স্বত্ব-বিলোপ নীতির যথেচ্ছ প্রয়োগ যে অন্যতম প্রধান কারণ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই ; (২) ভারতীয়দের চিরাচরিত রীতিনীতির উপেক্ষা—সাতারা, নাগপুর, ঝাঁসি, অযোধ্যা প্রভৃতি অধিকার ; (৩) নানাসাহেব, তাঞ্জোর ও কর্ণাটের রাজ-গণের ভাতা বন্ধ ; (৪) অমানুষিক বর্বরতার সহিত নাগপুর ও অযোধ্যার প্রাসাদ লুণ্ঠন। ২২২-২২৪ পৃষ্ঠা]

7. Write notes on : Doctrine of Lapse. (C. U. B. A. 1955)

[উত্তর-সংকেত : (১) স্থচনা : ডালহৌসী—ঘোর সাম্রাজ্যবাদী ; (২) স্বত্ব-বিলোপ নীতির ব্যাখ্যা ; (৩) স্বত্ব-বিলোপ নীতি ডালহৌসী কর্তৃক উদ্ভাবিত নহে ; (৪) ডালহৌসী কর্তৃক এই নীতির ব্যাপক প্রয়োগ—সাতারা, সম্বলপুর, নাগপুর, ঝাঁসি, ভগৎ, উদয়পুর, জৈৎপুর, কারাউলি অধিকার এবং নানাসাহেব, তাঞ্জোর ও কর্ণাট রাজ্যের রাজপরিবারের ভাতা বন্ধ। ২১৮-২২২ পৃষ্ঠা]

8. Trace the history of the Anglo-Sikh wars and the annexation of the Punjab. (C. U. B. A. 1960)

Give an account of the two Sikh wars. (C. U. 1969)

[উত্তর-সংকেত : (১) স্থচনা : রঞ্জিৎ সিংহের মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব হইতেই শিখরাজ্যে নানাপ্রকার গোলযোগের স্থচনা হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর উহা ব্যাপক অব্যবস্থায় পরিণত হইল ; (২) পরবর্তী রাজগণের

দুর্বলতা—খাল্‌সার প্রাধান্য লাভ ; (৩) ঝিন্দনের কূটকৌশল—লর্ড হার্ডিঞ্জের যুদ্ধ ঘোষণা—প্রথম শিখযুদ্ধ ; (৪) লাহোরের সন্ধি ; (৫) ব্রিটিশ প্রভাবাধীন পাঞ্জাব ; (৬) দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধ—পাঞ্জাব অধিকার। ২১৩-২১৭ পৃষ্ঠা]

9. What were the measures adopted by Lord Dalhousie for the aggrandisement of the British power in India ?

(C. U. B. A. 1963)

[উত্তর-সংকেত : (১) সূচনা : ডালহৌসী ভারত-ইতিহাসে তাঁহার সাম্রাজ্যবাদী নীতির জন্য প্রসিদ্ধ। সাম্রাজ্য-বিস্তারের জন্য তিনি তিনটি নীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন। (ক) যুদ্ধনীতি : পাঞ্জাব অধিকার, পেগু অধিকার, সিকিমের একাংশ অধিকার (দ্বিতীয় শিখযুদ্ধ ও দ্বিতীয় ব্রহ্মযুদ্ধের বর্ণনা দিতে হইবে না) ; (খ) স্বত্ব-বিলোপ নীতি—সাতারা, সম্বলপুর, নাগপুর, ঝাঁসি, ভগৎ, উদয়পুর, জৈৎপুর, কারাউলি অধিকার ; নানাসাহেব, তাঞ্জোর ও কর্ণাট রাজ্যের রাজপরিবারের ভাতা বন্ধ ;—ভগৎ, উদয়পুর ও কারাউলি পরবর্তী কালে প্রত্যর্পণ ; (গ) অরাজকতার অভিযোগে দেশীয় রাজ্য অধিকার —অযোধ্যা, বেরার। ২১৪-২২২ পৃষ্ঠা]

নবম অধ্যায়

1. What were the causes and effects, immediate remote, of the so-called Sepoy Mutiny of 1857 ?

(C. U. 3yr. Degree, '62)

What were the causes of Mutiny of 1857 ?

What were the causes that led to the Revolt of 1857 ?

(3yr. Degree, '64. C. U.)

What do you know of the causes of the Revolt of 1857 ? What are its immediate effects ? (C. U. 3yr. Degree, 1967)

Describe the causes of the Revolt of 1857. (C. U. 1969)

[উত্তর-সংকেত : (১) সূচনা : ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের পশ্চাতে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মনৈতিক—নানাপ্রকার কারণ ছিল ; (২) রাজনৈতিক ; (৩) সামাজিক ; (৪) অর্থনৈতিক ; (৫) সামরিক ; (৬) ধর্মনৈতিক ; (৭) প্রত্যক্ষ কারণ।

২২৬-২৪৩ পৃষ্ঠা]

2. Sketch the history of the expansion of the British dominion in northern India between the years 1824 and 1856. (C. U. 3yr. Degree, 1965, Old Reg.)

[উত্তর-সংকেত : লর্ড আমহার্স্ট হইতে লর্ড ডালহৌসী পর্যন্ত। ১৮৪-২২২ পৃষ্ঠা, প্রয়োজনীয় অংশ।]

3. Describe the causes of the failure of the first organised rising (the Mutiny) against the British rule in India. What were its immediate effects? (C. U. B. A. 1952)

Sketch the history of the 'Sepoy Mutiny'. Why did it fail? (C. U. B. A. 1960)

[উত্তর-সংকেত : (১) সূচনা : নানাবিধ কারণে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ বিফলতায় পর্যবসিত হইয়াছিল ; (২) কারণ : (ক) সংহতির অভাব, (খ) আদর্শ ও উদ্দেশ্যের পার্থক্য, (গ) আঞ্চলিক সীমায় সীমাবদ্ধতা, (ঘ) সুযোগ্য নেতার অভাব, (ঙ) ব্রিটিশ কূটকৌশল, (চ) বিদ্রোহীদের সংগঠনের অভাব, (ছ) বিদ্রোহীদের সামরিক ভুল, (জ) ব্রিটিশ সেনা-বাহিনীর দক্ষতা ; (৩) ফলাফল : (ক) ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসনের অবসান, (খ) ভাইস্‌রয় নিয়োগ, (গ) স্বত্ব-বিলোপ নীতি পরিত্যক্ত, (ঘ) শাসনব্যবস্থায় ভারতীয়দের স্থান দিবার ব্যবস্থা, (ঙ) কাউন্সিলস্ এ্যাক্ট্, সাম্রাজ্যবাদী বিভেদ-নীতির সূত্রপাত, (চ) ব্রিটিশ সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি, (ছ) সংস্কার-নীতির স্থলে প্রতিক্রিয়ার সূচনা। ২২৬-২৪৩ পৃষ্ঠা]

4. What was the real character of the Revolt of 1857? Was it a mutiny of the Sepoys or a national movement?

[উত্তর-সংকেত : (১) সূচনা : পরস্পর-বিরোধী মতবাদ ; (২) ডক্টর মজুমদার ও ডক্টর সেনের অভিমত ; (৩) মূলতঃ সিপাহী বিদ্রোহ—কোন কোন স্থানে জাতীয় আন্দোলনে রূপান্তরিত ; (৪) অপরাপর মতবাদ ; (৫) উপসংহার। ২৩৬-২৩৯ পৃষ্ঠা]

5. Give an account of the economic and administrative

changes in India during the supremacy of the East India Company. (C. U. 3yr. Degree, 1963)

[উত্তর-সংকেত : (১) সূচনা : ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসনকালে অর্থনৈতিক ও শাসন-সংক্রান্ত নানাবিধ সংস্কার চালু হইয়াছিল ; (২) ক্লাইভের সংস্কার ; (৩) ওয়ারেন হেস্টিংসের বিচার-সংক্রান্ত সংস্কার ; (৪) লর্ড কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, বিচার বিভাগীয় সংস্কার ; (৫) ১৭৯৩, ১৮১৩, ১৮৩৩, ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের চার্টার এ্যাক্ট্। ৭৩, ৯০, ১২৮, ১৩৮, ১৬৩, ১৯৫ পৃষ্ঠা]

দশম অধ্যায়

1. What do you know of the origin and establishment of the Indian National Congress. (C. U. 3yr. Degree, 1964) (Out of Syllabus)

2. Write notes on Charter Acts of 1813, 1833 and 1853 (C. U. B. A. '65)

[১৬৩, ১৯৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]

3. Write a note on Raja Ram Mohan Roy (C. U. 1970)

[উত্তর-সংকেত : (১) সূচনা : বাংলার তথা ভারতীয় রেনেসাঁসের জনক ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। ইতালির রেনেসাঁসের অগ্রদূত পেত্রার্ক, বোক্কাচো প্রভৃতি হিউম্যানিস্টদের অবদানের সহিত রাজা রামমোহনের অবদানের তুলনা করা চলে ; (২) নবজাগরণের অগ্রদূত—চিন্তাধারার মুক্তিসাধক ; (৩) হিন্দু-মুসলমান-খ্রীষ্টান শিক্ষা ও সংস্কৃতির সমন্বয়ের প্রতীক ; (৪) প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ধর্ম, শিক্ষা ও সংস্কৃতির অভূতপূর্ব সংমিশ্রণ ; (৫) রাজা রামমোহনের নিকট ভারতীয়দের ঋণ। ২৪৫-৫১ পৃষ্ঠা]

4. Write a note on Education Despatch 1854. (C. U. 1970)

[উত্তর-সংকেত : (১) ব্রিটিশ সরকার ভারতের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণের পর ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের শিক্ষা-সংক্রান্ত নির্দেশ বা Education Despatch-কে ভিত্তি করিয়া ভারতের শিক্ষার প্রসার শুরু করেন। ১৮৫৭

খ্রীষ্টাব্দে ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের Education Despatch ব্রিটিশ সেক্রেটারি অব স্টেট সমর্থন করিয়া আদেশ জারি করেন। ইহাতে প্রাথমিক শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। পরবর্তী কালে স্কুল ও কলেজ স্থাপন ক্রমপর্যায়ে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এগুলির কতক কতক সরকারী ব্যয়ে, কতক সরকারী সাহায্যে এবং অধিকাংশ বেসরকারী সাহায্যে গড়িয়া ওঠে। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রবর্তিত শিক্ষানীতি ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের হাণ্টার কমিশন সমর্থন করিলে ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের Education Despatch-এর ভিত্তিতেই ভারতীয়দের শিক্ষা-পদ্ধতি পরিচালিত হইবে স্থির হয়। সুতরাং ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের Education Despatch ভারতে ইংরেজী শিক্ষাব্যবস্থার ভিত্তি হিসাবে বিবেচনা করা যাইতে পারে।

C. U. Questions

1964
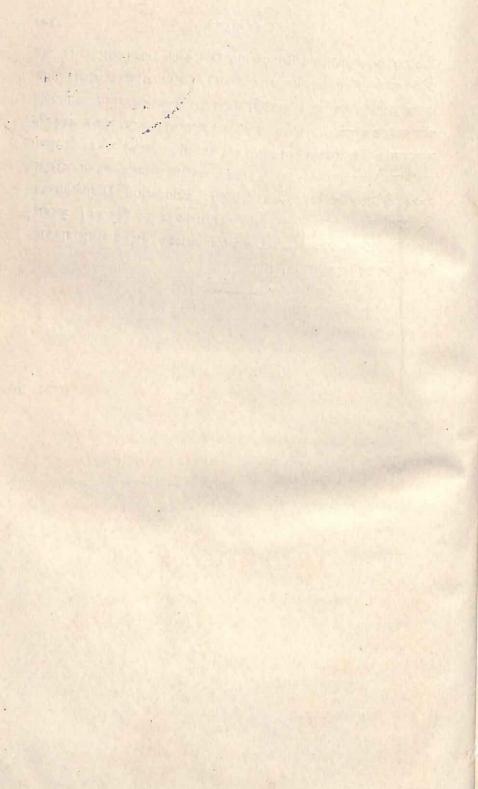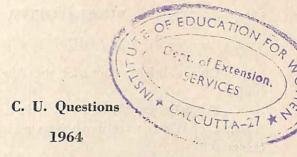
1. Give a short account of the early activities of European traders in India.

2. Sketch briefly the career of Warren Hastings with special reference to his role in the First Anglo-Maratha and the First Anglo-Mysore War.

3. What were the causes that led to the break out of the revolt of 1857 ?

4. What do you know of the origin and establishment of the Indian National Congress ?

1965

1. Explain Wellesley's policy of 'Subsidiary Alliance' with particular reference to its objects and achievements.

2. Discuss the measures of internal reform associated with the Viceroyalty of Lord Ripon.

3. Give a brief sketch of the constitutional changes in India in the present century till the transfer of power in 1947.

1966

1. Trace the growth of the political power of the East India Company in Bengal up to the time of the grant of the Diwani.

2. Give a brief sketch of the history of the Marathas during the rule of the first three Peshwas.

3. What do you know of the annexations of Dalhousie ? What were the reactions ?

4. Describe the progress of Education in India during the days of the East India Company.

1967

1. Give a brief account of the Anglo-French rivalry in India.

2. What do you know of Wellesley's policy of 'Subsidiary Alliance'? What were its objects and how far were they achieved?

3. Describe Auckland's Afghan policy and its results.

4. What do you know of the causes of the Revolt of 1857? What were its immediate effects?

1968

1. What part did Clive play in the contemporary politics of Bengal? How far was he successful in his objectives?

2. Describe briefly the causes and consequences of the third Anglo-Maratha war.

3. What do you know of the social and educational reforms under Lord Bentinck?

4. How far were the annexations of Dalhousie responsible for the Revolt of 1857?

1969

1. Give a brief account of the Anglo-French rivalry in India.

ভারতে ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্বের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

2. Write what you know of Lord Wellesley's policy of Subsidiary Alliance.

লর্ড ওয়েলেস্লীর বশ্যতামূলক মিত্রতা নীতি সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

3. Give an account of the two Sikh wars.

দুইটি শিখ যুদ্ধের বিবরণ দাও।

4. Discuss the causes of the Revolt of 1857.

১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের কারণ বর্ণনা কর।

1970

1. Analyse the causes of the conflict between Nawab Sirajuddaula and the East India Company.

নবাব সিরাজদ্দৌলার সহিত ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির সংঘর্ষের কারণ বিশ্লেষণ কর।

2. Write a note on the land revenue reforms of Cornwallis. What defects do you notice in them?

কর্ণওয়ালিসের ভূমিরাজস্ব সংস্কারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখ। এই সংস্কারের কি কি ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়?

3. Describe the stages in the British conquest of Mysore.

ইংরেজ কর্তৃক মহীশূর জয়ের বিভিন্ন পর্যায় বর্ণনা কর।

4. Write short notes on any two of the following: (a) Third battle of Panipath, (b) Ram Mohan Roy, (c) Bentinck's social reforms, (d) Education Despatch 1854.

সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ (যে কোন দুইটি)

(ক) পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ (খ) রামমোহন রায় (গ) বেন্টিঙ্ক ও সমাজ সংস্কার এবং (ঘ) ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের শিক্ষা-বিষয়ক নির্দেশ।

ডুপ্লে

রবার্ট ক্লাইভ

পলাশীর যুদ্ধের পর ক্লাইভ-মীরজাফর সাক্ষাৎকার

ওয়ারেন হেস্টিংস

সার এলিজা ইম্পে

মহাদ্‌জী সিন্ধিয়া

লর্ড কর্ণওয়ালিস

লর্ড ওয়েলেসলী

লর্ড বেন্টিঙ্ক
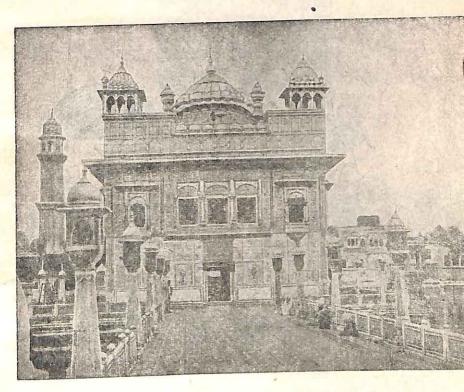
স্বর্ণমন্দির (অমৃতসর)

রঞ্জিৎ সিংহ

হায়দর আলি

টিপু সুলতান

নানা ফড়নবীশ

নানা সাহেব

বাহাদুর শাহ্ (২য়)

কুনওয়ার সিংহ্

তাঁতিয়া তোপী

ঝাঁসীর রাণী

শ্রীরামকৃষ্ণ

বিবেকানন্দ

দীনবন্ধু মিত্র

বঙ্কিমচন্দ্র

বিদ্যাসাগর

সুরেন্দ্রনাথ

বিপিনচন্দ্র পাল

লালা লাজপৎ রায়

শ্রীঅরবিন্দ